Vol. 27 | No. 1 | 1983

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কুতবন-কৃত প্রেম-কাব্য মৃগাবতী

Volume	27
Issue	1
Year	1983
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৈয়দ আলী আহসান
Published online	December 1, 1983
DOI	10.62328/sp.v27i1.1
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v27i1.1
Pages	1-126
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যে উল্লেখ আ[illegible] যোগী হয়ে রাজকুমার কাঞ্চনপুর গিয়েছিলো।[২] কুতবনের কৃ[illegible]বন।

Check for updates

হিন্দী ভাষায় মেঘরাজ প্রধান রচিত একটি মৃগাবতী কাহিনী পাওয়া যায়।[৩] মেঘরাজের কাহিনী কুতবনের কাহিনী থেকে ভিন্ন নয় কিন্তু সেখানে নায়িকার পূর্ব-জন্মের কথা আছে এবং কাঞ্চনপুরের পথে কুমার কর্তৃক একাধিক কুমারীকে বিয়ে করার কথা আছে। তৃতীয়তঃ রাজকুমারের জীবনান্ত এবং তার শবের সঙ্গে রাণীদের চিতারোহণের কথা মেঘরাজের কাহিনীতে নেই। এতে মনে হয়, মেঘরাজের কাব্যের উৎস কুতবনের কাব্য নয়। উভয় কবিই সম্ভবতঃ একই অপভ্রংশ উৎস থেকে আপন আপন কাব্যের উপকরণ গ্রহণ করেছিলেন। মেঘরাজ অবশ্য কুতবনের অনেক পরবর্তী।

মোল্লা দাউদের 'চান্দায়ন'[৪] কাব্যে 'চন্দ্রাবলি গীতে'র উল্লেখ আছে। চান্দার রূপে মুগ্ধ হয়ে এক ভিক্ষুক রূপচন্দ্রের নগরে উপস্থিত হচ্ছে এবং সেখানে প্রাসাদের নিকটে অবস্থান করে 'চন্দ্রাবলি গীত' গাচ্ছে :

'নিস্থ হীঁ রাতি সোহাবনি বাজির ঠোকা তার।
গাঈ গীত চন্দরাবলি নগর ভএউ ঝনকার॥'

মোল্লা দাউদের সময়কালে 'চন্দ্রাবলি গীত' প্রচলিত ছিলো। অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভ।

মেঘরাজ প্রধান তাঁর 'মৃগাবতী কথা' রচনা সমাপ্ত করেন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৭২৬ সংবত। তিনি ওড়ছের রাজা সুজান সিংহের স্বজন অর্জুন সিংহের আশ্রিত পরসরামের আদেশে 'মৃগাবতী কথা' রচনা করেন। কাহিনীর কথা-সংক্ষেপ নিম্নরূপ :

'কর্ণাটকের রাজার ছেলের প্রধান ব্যসন ছিলো মৃগয়া। রাজার নির্দেশ ছিলো, রাজকুমার যেন মৃগয়ার উদ্দেশ্যে পূর্ব দিকে কখনও না যায়। কিন্তু একবার কুমার এ-আদেশ অবহেলা করে পূর্ব দিকে যাত্রা করলো। সে-পথে সে এক স্বর্ণমৃগী দেখলো। কুমার মৃগীকে জীবিত ধরবার জন্য অনুচরদের আদেশ দিলো কিন্তু মৃগী একটি জলাশয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং হারিয়ে গেল। সে গিয়ে পেঁাছলো ইন্দ্রলোকে। অনেক সন্ধান করেও তাকে পাওয়া গেল না। কুমার মৃগীর পুনঃপ্রাপ্তির আশায় জলাশয়ের তীরে অবস্থান করতে লাগলো। রাজা এ-সমাচার পেয়ে কুমারকে রাজগৃহে ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কুমার ফিরলো না। রাজা পণ্ডিতদের মৃগী সম্পর্কে প্রশ্ন করে জানলেন, এ-মৃগী ইন্দ্রের এক নর্তকী ছিলো। সে ইন্দ্রের অভিশাপে মৃগীরূপ ধারণ করেছে। একবার ইন্দ্রের আজ্ঞা নিয়ে সে এ-সরোবরে স্নান করতে এসেছিলো এবং সরোবরে এক মৃগীর কেলি দেখতে দেখতে প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব করে ফেলে। বিলম্বের কারণে ইন্দ্র তাকে অভিশাপ দেয়। কেবল একাদশীর দিনে সে স্ত্রীরূপ ফিরে পায় এবং অন্যান্য অপ্সরার সাথে জলকেলি করে। একে বন্দী করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে, সে যখন তটপ্রান্তে

বস্ত্র ছেড়ে জলকেলি করতে নামবে, তখন সে-বস্ত্র লুকিয়ে ফেলে অন্য বস্ত্র সেখানে রেখে দিতে হবে। রাজা কুমারের দৃঢ় সংকল্প দেখে সরোবর তীরে এক প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। রান্না করবার জন্য এক রসুই ব্রাহ্মণী নিযুক্ত করা হয়। কুমার সেখানেই বাস করতে লাগলো।

নিশ্চিত একাদশীর দিনে মৃগাবতী এক সুন্দর বিমান দ্বারা বাহিত হয়ে সখীসহ সরোবরে স্নান করতে নামলো। পরিত্যক্ত বস্ত্র সরোবর তীরে পড়ে ছিলো। যখন তারা জলকেলিতে ব্যস্ত, কুমার সে-অবসরে মৃগাবতীর বস্ত্র সরিয়ে ফেললো। স্নান শেষে তীরে উঠে বস্ত্র না পেয়ে সে চিন্তিত হল। সে জানতে পারলো কর্ণাটকের কুমার ইন্দ্রজিৎ তার বস্ত্র অপহরণ করেছে। কুমারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। কুমার তাকে অন্য বস্ত্র দিলো এবং সে কুমারের প্রাসাদে বন্দিনী হল। রাত্রিতে উভয়ে মিলিত শয্যায় রতিসুখ লাভ করলো। কিছুদিন অতীত হল। রাজার কাছে সংবাদ গেল, তিনি যেন পুত্রবধূকে নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আসেন। এদিকে উদ্যানে এক বরাহ এসেছে সংবাদ শুনে কুমার তাকে হত্যা করতে গেল। কুমার যখন প্রাসাদের বাইরে গিয়েছে, মৃগাবতী আপন বস্ত্র সন্ধান করে পরিধান করে উড়ে চললো। যাবার সময় রসুই ব্রাহ্মণীকে জানিয়ে গেল যে সমুদ্রস্থিত কাঞ্চনপুরে তার নিবাস। ফিরে এসে কুমার এ খবর পেয়ে কাঞ্চনপুরের পথে যাত্রা করলো।

যেতে যেতে কুমার এক নগরে উপস্থিত হল যেখানে একটি দৈত্য প্রতিদিন একজন করে মনুষ্য ভক্ষণ করতো। সেদিন ছিলো রাজকন্যার পালা। কুমার দৈত্য বধ করে রাজকন্যার প্রাণরক্ষা করলো। কুমার রাজকন্যাকে বিয়ে করলো এবং প্রত্যাবর্তনের পথে তাকে নিয়ে যাবে বলে মৃগাবতীর উদ্দেশ্যে কাঞ্চনপুরের পথে পুনরায় যাত্রা করলো। চলতে চলতে আবার এক দৈত্যর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। কুমার দৈত্যকে হত্যা করতে উদ্যত হলে দৈত্য প্রাণভিক্ষা চাইলো এবং কুমারকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করবে বলে প্রতিজ্ঞা করলো। দৈত্য কুমারকে আকাশ পথে উড়িয়ে নিয়ে পাহাড় পার করলো এবং নৌকো তৈরী করে সমুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত করে কুমারকে অন্য তীরে পৌঁছে দিল। সেখানেও এক দৈত্য ছিলো ও রাজকন্যা ছিলো। কুমার লৌহশলাকার সাহায্যে দৈত্যের চক্ষু বিদ্ধ করে সে-স্থান থেকে পলায়ন করলো। কুমার অবশেষে কাঞ্চনপুর গিয়ে পৌঁছলো। সেখানে ইন্দ্রের অনুমতি পেয়ে সে মৃগাবতীকে বিয়ে করলো।

মৃগাবতীর নিষেধ অবহেলা করে একদিন কুমার কৌতূহলবশত প্রাসাদের একটি রুদ্ধ কক্ষের দ্বার খুললো। সেখানে একটি দৈত্য বন্দী ছিলো। সে কুমারকে নিয়ে আকাশে উড়লো। অপ্সরা রম্ভার সাহায্যে কোনও ক্রমে কুমারের প্রাণ রক্ষা পেল।

কিছুদিন পর ইন্দ্রের অনুমতি নিয়ে কুমার মৃগাবতীকে নিয়ে বিমান-বাহিত হয়ে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। পথ-মধ্য থেকে পূর্ব-বিবাহিতা রাজকন্যাকে তুলে নিল। দেশে ফিরে এসে কুমার স্বজন-পরিবৃত হয়ে সুখে জীবন যাপন করতে লাগলো।'

দুই

এখন আমি কুতবনের 'মৃগাবতী'র কথা-সার নিম্নে উপস্থিত করছি :

কবি স্তুতি করছেন সৃষ্টিকর্তার যিনি প্রথমে হজরত মুহম্মদের (দঃ) নূর সৃষ্টি করে তার প্রীতির কারণে শিব এবং শক্তির রূপে সৃষ্টির বিকাশ ঘটালেন। তাঁর নাম স্মরণে মোক্ষ লাভ হবে। এরপর কবি স্মরণ করছেন রসুলের চার মিত্রকে—আবুবকর, উমর, উসমান ও আলীকে। কবি আরও স্মরণ করছেন তাঁর পীরকে যাঁর কাছ থেকে তিনি ধর্মপক্ষের জ্ঞান লাভ করেছেন। প্রশংসা করছেন তিনি তাঁর আশ্রয়দাতা হুসেন শাহকে যাঁর রাজ্য-কালে ৯০৯ হিজরীতে তিনি তাঁর কাব্য রচনা আরম্ভ করলেন—সেদিন মুহর্‌রম মাসের চার তারিখ ছিলো। এ-কাব্যে তিনি প্রয়োগ করেছেন বিভিন্ন ছন্দ—গাথা, দোহা, অরিল্ল, আর্যা, সোরঠা এবং চৌপাই। কাব্য শেষ করতে তার লেগেছিলো দু'মাস দশ দিন। হুসেন শাহের আদেশে কবি এ-কাব্য রচনা করেন। এ-ভূমিকার অনন্তর কবি তাঁর কাব্যকথা আরম্ভ করেছেন।

একজন খ্যাতিমান রাজা ছিলেন যার কামনা ছিলো একটি পুত্রের। তিনি অনেক দানপুণ্য করলেন, অবশেষে ঈশ্বরের কৃপায় এক পুত্র পেলেন। পণ্ডিতগণ শিশুর ভাগ্য গণনা করে বললেন, শিশুর ভবিষ্যৎ জীবন খুবই উজ্জ্বল, শুধু তার ভাগ্যে কিছুটা স্ত্রী-বিয়োগ দুঃখ লেখা আছে। ধাত্রীরা তার লালন-পালন করতে লাগলো। পঞ্চম বর্ষে কুমারের পাঠক্রম আরম্ভ হল, দশম বর্ষে সে পণ্ডিত হল এবং চৌগান তথা লক্ষ্যভেদে পটু হল।

একদিন কুমার ভৃত্য এবং অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বের হল। সে সাত রং-এর এক মৃগী দেখে তার পিছনে ধাবিত হল এবং সঙ্গীসহচর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। মৃগীর পিছনে চলতে চলতে কুমার সাত যোজন পথ অতিক্রম করলো। এভাবে উভয়েই এসে পৌঁছলো এক সরোবরের তীরে। মৃগী সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়ে হারিয়ে গেল। রাজকুমারও সরোবরে প্রবেশ করে মৃগীকে খুঁজতে লাগলো কিন্তু পেলোনা। তীরে উঠে স্থির করলো সরোবরের তীরে বসে সে মৃগীর জন্য প্রতীক্ষা করবে। কুমারের সঙ্গীসাথীরা ততক্ষণে অনুসন্ধান করতে করতে সরোবরের প্রান্তে কুমারের সাক্ষাৎ পেল। তারা কুমারকে ফিরিয়ে নেবার অনেক চেষ্টা করলো, কিন্তু সে গেলনা।

রাজার কাছে সকল সমাচার পৌঁছলো। তিনি কুমারের কাছে এলেন; কুমার তাকে মৃগীর বৃত্তান্ত বললো। কুমার সরোবর-তীর ছেড়ে রাজভবনে যাবেনা দেখে রাজা সরোবর-তীরে এক সুন্দর মন্দির তৈরী করে দিলেন। মন্দিরের অভ্যন্তরে শিল্পীরা মৃগীর চিত্র অঙ্কিত করলো। কুমার মন্দিরে বাস করতে লাগলো এবং নিরন্তর মৃগীর কথা স্মরণ করতে লাগলো। এভাবে এক বর্ষের বর্ষা, শীত এবং গ্রীষ্ম অতিক্রান্ত হল।

বর্ষ পূর্ণ হলে পর একদিন সাতটি অপ্সরা এসে সরোবরে ক্রীড়া করতে লাগলো। স্নানের পর বস্ত্র পরিধান করে তারা উড়ে গেল। এদের মধ্যে যে ছিলো সর্বাপেক্ষা

সুন্দরী তাকে দেখে কুমারের কেন যেন মনে হল, যে-মৃগীর অপেক্ষায় সে আছে সে-মৃগীই অপ্সরার বেশে এসেছে।

কুমারের দুঃখবোধ হল। কুমারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে ধাত্রী ছিলো সে কুমারের নতুন বেদনার কারণ জিজ্ঞেস করলো। কুমার অপ্সরাদের স্নান করার কথা বললো। ধাত্রী বললো, অপ্সরাদের উড়বার রহস্য তাদের বস্ত্রের মধ্যে নিহিত ছিলো। আগামী-বার যখন তারা নির্জলা একাদশীর পর্বে স্নান করতে আসবে তখন কুমার যেন তার বিশেষ অপ্সরাটির বস্ত্র লুকিয়ে রাখে। তাহলে সে আর উড়তে পারবেনা এবং কুমারের বাধ্য হবে।

উক্ত অপ্সরাটির নাম ছিলো মৃগাবতী। সেও কিন্তু প্রথমবার স্নানের সময় কুমারকে দেখেছিলো এবং তার অনুরক্ত হয়েছিলো। নির্জলা একাদশীর জন্য সেও প্রতীক্ষা কর-ছিলো। সে তার সখীদের নিয়ে সরোবরে স্নান করতে এলো। যখন সে স্নান করছিলো কুমার তার বস্ত্র লুকিয়ে ফেললো। সে তার চীর প্রত্যর্পণের জন্য কুমারকে অনুরোধ করলো। কুমার সে-বস্ত্র তাকে না দিয়ে অন্য একটি বস্ত্র দিলো। নতুন বস্ত্র ধারণ করে মৃগাবতী উড়তে পারলোনা এবং কুমারের মন্দিরের মধ্যে প্রবিষ্ট হল।

কুমার মৃগাবতীকে আলিঙ্গন করতে চাইলো কিন্তু সে বললো যে সখীরা না আসা পর্যন্ত সে শারীরিক সম্বন্ধ করতে পারবেনা। এ ব্যাপারে সখীদের সঙ্গে তার পরামর্শ করতে হবে। কুমার এ-ব্যবস্থা স্বীকার করে নিলো এবং মৃগাবতী-প্রাপ্তির খবর রাজাকে পাঠালো। রাজা এসে তাদের শুভকামনা করলেন। রাজার প্রত্যাগমনের পর উভয়ে হর্ষিত হয়ে বসবাস করতে লাগলো।

কিছুকাল পর কুমার রাজধানীতে গমন করলো পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের জন্য। যাত্রার পূর্বে ধাত্রীকে আদেশ করলো মৃগাবতীর বস্ত্র ঠিকমতো রাখবার জন্য। কুমারের অনুপস্থিতিতে মৃগাবতী ধাত্রীকে বাইরে পাঠালো কোনও কাজের জন্য এবং সে-অবসরে আপন বস্ত্র খুঁজে বের করলো। বস্ত্র পরিধান করে সে উড়ে মন্দিরের উপর যেয়ে বসলো। ধাত্রী ফিরে এসে তাকে এ-অবস্থায় দেখলো। ধাত্রীকে লক্ষ্য করে সে বললো, 'কাঞ্চননগর আমার পিতৃভূমি এবং পিতার নাম রূপ মুরারী। কুমার ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারে এবং আমার সন্ধান করতে পারে।' ফিরে এসে এ-সংবাদ শুনে কুমার যোগী-বেশ ধারণ করে মৃগাবতীর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো। কুমারের পিতা-মাতা এ-সমাচার শুনে কেঁদে কেঁদে চোখের জ্যোতি হারিয়ে ফেললেন।

কুমার চলতে চলতে এক নগরে এসে উপস্থিত হল। সেখানকার রাজা কুমারকে এক পথ-প্রদর্শক দিলেন যে কাঞ্চননগরের পথ জানতো। তার সঙ্গে কুমার এলো এক সমুদ্রের তটপ্রান্তে। সেখানে কুমার সমুদ্রগামী এক বোহিত্রে চড়লো, পথ-প্রদর্শক চলে গেল নিজ শহরে। এক মাস বোহিত্রে ভাসমান থেকে এক পর্বতের টীলায় এসে পৌঁছলো।

টীলায় কুমার কিছু সংখ্যক মানুষ দেখলো। নৌকোডুবীর ফলে তারা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিলো। কিন্তু এক সাপের ভয়ে তারা সর্বক্ষণ ত্রস্ত—প্রতিদিন সাপ একজনকে ধরে নিয়ে যায় এবং আহার করে। কুমার সাপটিকে আসতে দেখে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করলো তখন অন্য একটি সাপ সেখানে এসে উপস্থিত হল। সাপ দুটো পরস্পর লড়াই করতে করতে পানিতে গড়িয়ে পড়লো।

এভাবে সাপের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে কুমার এগিয়ে চললো সামনের দিকে। একটি আমের বাগানের মধ্যে সে দেখলো একটি প্রাসাদ। প্রাসাদটি ছিলো একটি রাক্ষসের অধিকারে। রাক্ষস সেখানে জনৈকা সুন্দরীকে বন্দী করে এনে রেখেছিলো। কুমার রাক্ষসকে হত্যা করে রমণীকে উদ্ধার করলো। রমণী ছিলো সুবুধ্যা দেশের রাজকন্যা। সুবুধ্যার রাজা যখন শুনলেন যে এক বিদেশী কুমার তাঁর কন্যাকে উদ্ধার করেছে, তখন তিনি তাদের রাজধানীতে নিয়ে এলেন এবং কুমারকে যথেষ্ট আন্তরিকতার সাথে আপ্যায়ন করলেন। রাজা কুমারের সাথে কন্যার বিবাহ দেবেন বলে স্থির করলেন। কুমার প্রথমে এ-প্রস্তাবে রাজী হননি কিন্তু বন্দীগৃহে আবদ্ধ হবার আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত সে রাজকন্যা রূপমিনীকে বিয়ে করে। মিলন-রাত্রিতে কুমার মধুর বাক্যালাপে সময় কাটিয়ে দেয়—রূপমিনীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করেনা।

কুমার রাজাকে বলে এক ধর্মশালা প্রতিষ্ঠা করলো এবং সেখানে প্রতিদিন যোগী ও সন্ন্যাসীদের আপ্যায়ন করতে লাগলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো এদের কারো সাহায্যে কাঞ্চননগরের পথের সন্ধান নেবে। আবার অন্যদিকে প্রতিরাত্রে সে রূপমিনীকে ভুলিয়ে রাখলো মধুর বচনে। একদিন সে গোপনে একজন যোগীর বস্ত্র অপহরণ করে যোগী-বেশ ধারণ করে পালিয়ে গেল সুবুধ্যা থেকে। রাজা অনেক অনুসন্ধান করেও তাকে পেলোনা।

যেতে যেতে কুমার এক বনের কাছে উপস্থিত হল। সেখানে এক গড্ডরিক আতিথ্য দেবার নাম করে তাকে এক গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করে গুহা-মুখ বন্ধ করলো। কুমার দেখলো সে-গুহার মধ্যে স্থূলকায় অনেক মানুষ বন্দী রয়েছে। সে শুনলো যে কোনও এক গাছের শিকড় খাইয়ে এদের মোটা করা হয়েছে। প্রতিদিন গড্ডরিক একজন করে লোক হত্যা করে আহার করে। কুমার এদের সঙ্গে পরামর্শ করে লৌহশলাকা বিদ্ধ করে গড্ডরিকের চক্ষু অন্ধ করে কৌশলে গুহা থেকে বেরিয়ে এলো।

এদিকে মৃগাবতী গৃহে পৌঁছে সখীদের কাছে কুমার কর্তৃক অপহৃত হবার কাহিনী বললো। কি করে আবার সেখানে থেকে পালিয়ে এলো সে-বার্তাও সখীদের জানালো। ইতিমধ্যে কুমারের জন্য তার চিত্তে প্রণয় জেগেছে এবং সে বিয়োগ-ব্যথাতুর হয়েছে। এ-সময় তার পিতার দেহাবসান হল এবং মৃগাবতী রাণী হল। রাণী মৃগাবতী যোগী ও যাত্রীদের সৎকারের জন্য এক ধর্মশালা বানালো। ভাবলো হয়তো বা ধর্মশালায় কোনও না কোন আগন্তুকের কাছ থেকে কুমারের কুশল-সমাচার পাবে।

এদিকে পথশ্রমে ক্লান্ত কুমার এক বৃক্ষতলে যখন অবস্থান করছিলো তখন বৃক্ষ-শাখায় দুটি পাখীর সংলাপ শুনতে পেল। পাখীরা রাণী মৃগাবতীর ধর্মশালার কথা বলছিলো। কুমার প্রসন্ন হয়ে কাঞ্চননগরে গিয়ে পৌঁছলো। নগরে প্রবিষ্ট হয়ে কুমার রাজদ্বার পর্যন্ত এলো। মৃগাবতীর কাছে যখন এক নতুন যোগীর আগমনের সংবাদ পৌঁছলো মৃগাবতী তাকে ডেকে পাঠালো। মৃগাবতীকে দেখে কুমার মূর্ছিত হল। তখন মৃগাবতী বুঝতে পারলো যে নতুন আগন্তুক হচ্ছে তার প্রেমী রাজকুমার। মৃগাবতী দাসীদের আদেশ করলো রাজকুমারকে আপ্যায়ন করতে এবং স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পরিয়ে দিতে। মৃগাবতী শৃঙ্গার করে উজ্জ্বল শুভ্র গৃহে রাজকুমারের সঙ্গে মিলিত হল। উভয়ে উভয়ের কাছে বিরহ-কালীন দুঃখের বিবরণ দিলো। তদনন্তর শয্যায় প্রেম-সৌভাগ্যে উভয়ে মিলিত হল।

সকালে রাজ-সভা বসলো এবং সেখানে কুমারকে সিংহাসনাসীন করা হল এবং এ-উপলক্ষ্যে গীত-নৃত্যাদির আয়োজন হল। সামন্ত-ভৃত্য সবাইকে উপহার দেওয়া হল। অন্যদিকে মৃগাবতী তার সখীদের বিবিধ উপঢৌকন দিল।

মৃগাবতীর এক সখী তার বাসগৃহে উৎসবের আয়োজন করেছিলো। সেখানে সে মৃগাবতীকে নিয়ে যেতে চাইলো। কুমারের অনুমতি নিয়ে মৃগাবতী সখীগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলো। যাবার সময় কুমারকে অনুরোধ করলো, প্রাসাদের একটি কক্ষ বন্ধ রয়েছে সে-কক্ষের দরজা কুমার যেন না খোলে। কিন্তু কুমার কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে দরজা খুললো। বন্ধ ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো এক ভয়ানক দানব। সে বললো যে সে মৃগাবতীর প্রেমী এবং কুমারকে সে হত্যা করবে। সে কুমারকে উড়িয়ে নিয়ে সমুদ্রের এক খাড়ীতে ফেললো। মৃগাবতী কুমারের সন্ধান করতে লাগলো এবং দানবকে বন্দী করলো কিন্তু দানব কুমারের সন্ধান দিলনা। মৃগাবতী পবনকে অনুরোধ করলো কুমারের সন্ধান দিতে। পবন কুমারকে মৃগাবতীর দুঃখ-দশার সংবাদ দিলো এবং কুমারের সংবাদ নিয়ে মৃগাবতীর কাছে এলো। তদনন্তর পবন মৃগাবতীকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কুমারের কাছে এবং উভয়কে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনলো।

অন্যদিকে কুমারের বিরহে রূপমিনী অত্যধিক ক্ষীণ হয়েছিলো এবং তার দুঃখের অবধি ছিলনা।

রূপমিনী সমাচার পেলো যে চন্দ্রাগিরির এক বণিক এসেছে, সে কাঞ্চনপুরে যাচ্ছে। তাকে সে ডাকিয়ে আনলো এবং তার মাধ্যমে কুমারের কাছে আপন দুঃখের কথা জানাতে চাইলো। এ-প্রসঙ্গে সে বারোমাসের দুঃখ নিবেদন করলো। রাজকুমারীর নিবেদন নিয়ে বণিক কাঞ্চননগরে পৌঁছলো। সেখানে সবাইকে জানালো, যে-সমস্ত সামগ্রী সে এনেছে সবই রাজার ক্রয়ার্থে। এ সংবাদ শুনে কুমার তাকে ডেকে পাঠালো। রাজ-সম্মুখে এসে সে রাজাকে আশীর্বচন শুনালো এবং রূপমিনীর সংবাদ দিলো। কুমার জানলো যে এ-ব্যক্তি তার পিতৃগৃহের বণিক। কুমার তখন চন্দ্রাগিরি যাবার জন্য প্রস্তুত হল। কুমারের

মনে পিতার স্মৃতি জাগলো এবং রূপমিনীর প্রেম জাগলো। সে মৃগাবতীকে জানালো যে তার পিতৃগৃহ থেকে লোক এসেছে। পিতা অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁকে দেখতে যেতে হয়। মৃগাবতী বললো, 'আপনি আমাদের প্রথম পুত্র রায়ভানকে সিংহাসনে বসিয়ে যান। সে এখন অবোধ—তার হয়ে রাজকর্মচারীরা রাজ্যশাসন করবে।' রাজকুমার কাঞ্চনপুরে ছিলো চার বছর। এ-চার বছরে তার এবং মৃগাবতীর দু'পুত্রের জন্ম হয়—প্রথম পুত্রের নাম রায়ভান এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম করণরায়।

সুদিন দেখে রাজকুমার যাত্রা করলো। মৃগাবতী এবং কনিষ্ঠ পুত্র করণরায়কে নিলো সঙ্গে। পথে গড্ডরিকের গুহা ধ্বংস করে এগিয়ে চললো। এক সময় সুবুধ্যা গড়ে উপস্থিত হল। সেখানকার রাজা অভ্যর্থনা জানিয়ে রাজধানীতে নিয়ে এলো কুমারকে। রূপমিনীর সঙ্গে কুমারের মিলন ঘটলো। সুবুধ্যা ছেড়ে কুমার পিতৃগৃহ চন্দ্রাগিরিতে উপস্থিত হল। সেখানে কুমারের আগমনে রাজপরিবারের সকলে এবং প্রজাবর্গ হর্ষিত হল।

একদিন কুমার যখন মৃগয়ায় গিয়েছে, তখন একটি তুচ্ছ কারণে মৃগাবতী ও রূপমিনীর মধ্যে সপত্নী-কলহ ঘটলো। ফিরে এসে কুমার অনেক সাধনা করে উভয়ের মধ্যে সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনলো।

কুমার প্রায়ই মৃগয়ায় যেতো। এটাই ছিলো তার ব্যসন। একদিন খবর এলো যে বনে শার্দূল এসেছে। কুমার শার্দূলকে হত্যা করবার মানসে বনে এলো। শার্দূল ঘুমিয়ে ছিলো। কুমার তাকে জাগিয়ে তার দিকে তীর নিক্ষেপ করলো। আহত শার্দূল কুমারকে আক্রমণ করলো এবং কুমারের প্রাণান্ত ঘটালো। বৃদ্ধ রাজা এ-সংবাদ শুনে অচৈতন্য হয়ে প্রাণ হারালেন। করণরায় শোকে বিহ্বল হল। কুমারের সঙ্গে মৃগাবতী ও রূপমিনী চিতারোহণ করলো।

কবি উপসংহারে বলছেন, এ-কাহিনী প্রথমে 'হিন্দুঈ' ভাষায় ছিলো, পরে তা' তুর্কী ভাষায় রূপান্তরিত হয়। উক্ত ভাষায় কবি আপন শব্দাবলীতে কাহিনীকে স্পষ্ট করবার প্রয়াস পান। সংবত ১৫৬০ সালে কবি এই চৌপাঈ-বদ্ধ কাব্য রচনা করেন। ভাদ্রপদের বহির্গত পক্ষের চতুর্দশী এবং সিংহ রাশির দিনে কাব্য-রচনা শেষ হয়। রচনার অন্তিম ছন্দে কবি ঈশ্বর-স্মরণের জন্য সকলকে উপদেশ দিয়েছেন।

তিন

মেঘরাজ তাঁর উপাখ্যানে মৃগাবতী-চন্দ্রাবলীর পূর্ব অবস্থার কথা বলেছেন। মেঘরাজের মৃগাবতী প্রথমে ইন্দ্রের সভায় নর্তকী ছিলো। ইন্দ্রের আজ্ঞা নিয়ে সে এক সরোবরে স্নান করতে গিয়েছিলো, সেখানে এক মৃগীর কেলি দেখে সে বিলম্বে প্রত্যাবর্তন করে। বিলম্বের কারণে ইন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে মৃগীরূপ ধারণ করবার শাপ দেয়। মুক্তির ইঙ্গিত

শুধু এটুকু ছিলো যে একাদশীকালে এক দিনের জন্য সে স্ত্রী-রূপ পাবে এবং উক্ত সরোবরে জলকেলি করতে পারবে।

মেঘরাজের কাব্যে কুমার বস্ত্র হরণ করে মৃগাবতীকে বশীভূত করছে এবং গৃহ-অভ্যন্তরে নিয়ে যাচ্ছে। সেখানে রাত্রিতে উভয়ে দেহ-মিলনে সুরত-সুখ উপভোগ করছে। কুতবনের রচনায় মৃগাবতী পাঁচ মাস পর্যন্ত কুমারের সঙ্গে বাস করছে কৌমার্য নষ্ট না করে।

সূফী প্রেম-কাহিনীতে লক্ষ্য করি নায়কের দুটো বিবাহ—একটি আদর্শ বিবাহ—যা ঐকান্তিক সম্বন্ধ নির্বাহের প্রতীক এবং এ-বিবাহের সাফল্য সহজলভ্য নয়। এবং অন্য বিবাহ যেখানে নায়ক-সাধক পূর্ব থেকেই সম্বন্ধিত। এ-বিবাহ জাগতিক জীবনের প্রতীক। মোল্লা দাউদের 'চান্দায়নে' লোরকের এক স্ত্রী মৈনা এবং অন্য স্ত্রী চান্দা; মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবতে' রত্নসেনের এক স্ত্রী নাগমতি এবং অন্য স্ত্রী পদ্মাবতী। মৈনা এবং নাগমতি জাগতিক জীবনের এবং চান্দা ও পদ্মাবতী নায়কের সাধন-সত্তার প্রতীক। ঠিক একই ভাবে কুতবনের 'মৃগাবতী'তে রূপমিনী জাগতিক সম্পর্কের এবং মৃগাবতী সাধন-সম্পর্কের প্রতীক। কিন্তু মেঘরাজের কাব্যে সূফী সাধন-তত্ত্বের কোনও প্রকার নির্বাহ নেই। তিনি জাগতিক আনন্দের উপভোগ্য কথা রচনা করেছেন।

প্রত্যেক সাধকের জীবনে জাগতিক এবং পরমার্থিক বিবেচনার মধ্যে কখনও কখনও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হতে পারে। তেমনি দ্বন্দ্ব সূফী প্রেম-কাব্যের সপত্নী-ঈর্ষার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। কুতবনের 'মৃগাবতী'তেও সপত্নী-কলহের অধ্যায় আছে। তাই এ-সমস্ত সূফী কাব্যে নায়কের ক্ষেত্রে কখনও দু-এর অধিক বিবাহ দেখানো হয়নি।

মেঘরাজের কাব্যে সর্ব অনুষ্ঠান, কর্ম এবং সংগ্রামের শেষে নায়ক আপন রাজ্যে ফিরে আসে এবং সুখ-সমৃদ্ধিতে জীবন-যাপন করতে থাকে। কিন্তু কুতবনের কাব্যে যে-মৃগয়ার মাধ্যমে নায়কের জীবন-কর্মের সূত্রপাত, সে-মৃগয়ার মাধ্যমেই তার জীবনান্ত ঘটেছে। সূফী কবি এভাবে জাগতিক জীবনকে অসত্য প্রমাণিত করেছেন।

কুতবনের কাব্যে নায়িকার 'নখশিখে'র বর্ণনা বিস্তারিত। এ-রকম বিস্তারিত অঙ্গ-সৌষ্ঠব বর্ণনা 'পদুমাবতে' আমরা পেয়েছি। লক্ষ্য করা যায় যে প্রতিটি সূফী প্রেম-কাব্যে সৌন্দর্যানুভূতির একটি বিশেষ স্থান আছে, যাকে মাতাপ্রসাদ গুপ্ত বলছেন 'সর্বমান্য আধার'। কুতবন তাঁর কাব্যে 'নখশিখে'র নির্বাহ ঘটিয়েছেন অশেষ চাতুর্য এবং কলা-কৌশলের সঙ্গে।

সূফী প্রেম-কাব্যে প্রেমের ব্যাকুলতা শুধুমাত্র নায়কের নয়, নায়িকারও। অকুতোভয় কুমারের সাধনা যেমনি দুর্জয় তেমনি কুমারীর অপেক্ষাও। কুতবনের কাব্যে একদিকে রাজকুমার যোগী হয়ে কুমারীর অন্বেষণে বেরিয়েছে, অন্যদিকে কুমারী ধর্মশালা নির্মাণ করে কুমারের জন্য অপেক্ষা করছে। কাঞ্চনপুরে মৃগাবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর

কুমার মূর্ছিত হয়ে পড়ছে। এ-মূর্ছাকে সূফী সৌন্দর্য-দর্শনের হাল বা সমাধিপ্রাপ্তি হিসেবে ব্যাখ্যা করা যায়।

'মৃগাবতী' কাব্যে কুতবন উপাখ্যানগত বিভিন্ন ঘটনার উন্মোচনের মাধ্যমে সূফী প্রেমী-দর্শনকে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রধানতঃ মিলন বর্ণনায় লক্ষ্য করি—কবি সূফী কাব্যধারা অনুসরণ করে দু'প্রকার মিলনের চিত্র এঁকেছেন; একটি হচ্ছে অনায়াস মিলন, অন্যটি আয়াসগত মিলন। বস্ত্রহরণের পর মৃগাবতী কুমারের সঙ্গে মন্দিরে অবস্থান করা স্বীকার করে নিচ্ছে কিন্তু এ-অবস্থায় সে সন্তুষ্ট থাকছেনা। সে আয়াসগত মিলনের আমন্ত্রণ জানিয়ে উড়ে চলে যাচ্ছে :

"বস্তু জো পাইঅ সোঁধে মোলা।
তাকর মরম ন জানই ভোলা॥
য়েহি কারণ হোঁ জাউ উড়াঈ।
কহেহু কুঁঅর সেউঁ আবইধাঈ॥"[৬]

(যে বস্তু সস্তা দামে পাওয়া যায়, তার মর্ম মানুষ বুঝতে পারে না। এ-কারণেই আমি উড়ে চলে যাচ্ছি। কুমারকে বলবে সে যেন আমার কাছে দৌড়ে চলে আসে।)

আবার আয়াসগত মিলনের পর নায়িকা নায়ককে বলছে :

"রাণী দৈখ কুঁঅর গা আঈ।
উতরি সেজ সেউঁ ঠাঢি সোহাঈ॥
পৈগ চারি চলি কিহিসি জুহারূ।
আউ সামি অব করূ আহারূ॥
তহিয়া ভুগুতি ন দীতিউঁ তোহী।
সেজ বৈসি অব বেরসহু মোহী॥
হম লগি মরণ গঞ্জন তুম্হ সহা।
হোঁ কস তোর ন মানউঁ কহা॥
জো কোই কাহু লাগি দুখ দেখৈ।
মিলই সোই অগিনিত সুখ পেখৈ॥
রাজপাট জইঁ লগি হৈ সামী ঔ হোঁ দাসি তুমহারি।
চলহু সেজ পর বৈসহু তঁূ রে পুরুষ হোঁ নারি॥"[৭]

(রাণী দেখলো কুমার এসেছে, সে শয্যা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে শোভমান হল। চার পা এগিয়ে কুমারকে স্বাগত জানিয়ে বললো, "হে স্বামী তুমি এসে ভুক্তি (আহার) গ্রহণ কর। সে-সময় আমি তোমাকে ভুক্তি বা ভোজন-ভোগ দিইনি, এখন শয্যার উপর বসে আমার বিলাস কর। আমার জন্য তুমি মরণ এবং গঞ্জন সহ্য করেছ, অতএব তোমার কথা আমি কেন শুনবোনা ? যদি কেউ কারও জন্য দুঃখ সহ্য করে, তাকে পেলে

সে অগণিত সুখের দর্শন পায়। হে স্বামী যতদূর পর্যন্ত রাজ্যপাট আছে তুমি সব কিছুরই স্বামী এবং আমি তোমার দাসী। চলো, শয্যায় উপবেশন কর। তুমি পুরুষ এবং আমি তোমার নারী।")

অনায়াস মিলনের ক্ষেত্রে সূফী কবিগণ নায়ক-নায়িকার প্রেমের আকর্ষণ দেখিয়ে থাকেন কিন্তু শারীরিক সম্বন্ধ ঘটতে দেননা। নায়কের পক্ষ থেকে শারীরিক সম্বন্ধের প্রস্তাব আসে কিন্তু নায়িকা সে-প্রস্তাবকে স্বীকার করেনা। 'মৃগাবতী' কাব্যে কন্যা বলছে, "বলপ্রয়োগ করে রসসম্ভোগ করা যায়না। রসবন্ত হয়ে রসের সাধন করতে হয়। তাহলেই দু'জগতে রসভোগ করা সম্ভব। বলের সাহায্যে রস সম্ভব হয়না, যে রসিক সে যথার্থ রসের সাহায্যে বিশুদ্ধ হয়। আমি রসের সাহায্যে রসপ্রাপ্তি এবং ভোগের কথা তোমাকে বললাম এ-ভরসায় যে তুমিও রসের কথা বলবে। যে ব্যক্তি যথার্থ রসের সাহায্যে রসপ্রাপ্তি এবং ভোগের প্রতি অনুরক্ত হয়, তার রস-সাধন উভয় জগতে জাগরুক থাকে।"

আয়াসগত মিলনের ক্ষেত্রে প্রেম-সম্বন্ধের উপভোগ্য শারীরিক বর্ণনা সূফী কবিগণ বিস্তারিত করেছেন, যেমন জায়সীর কাব্যে নায়ক-নায়িকার রতিযুদ্ধ, মনঝনের কাব্যে দেহ-সংযোগের পূর্ণাহুতি এবং কুতবনের কাব্যে উৎফুল্ল শৃঙ্গার। কুতবনের কাব্যে নায়িকা বলছে, "আমার জন্য হে নাথ, তুমি অনেক দুঃখ সহ্য করেছ। এখন তুমি ফললাভ করবে যে-সমস্ত ফলকে আমি ছায়ায় ঢেকে রেখেছিলাম। আমি তোমার জন্য দাড়িম্ব (দন্ত), নারাঙ্গি (কপোল), দ্রাক্ষা (অধর) এবং জম্বীর (স্তন) ব্যক্ত করে রেখেছি—তুমি এগুলো ভোগ কর।" রতিসম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় এগুলো হচ্ছে কাম-চকিত রমণীর শারীরিক সম্ভাষণ, কিন্তু যেহেতু উপভোগের মধ্যেই প্রেমের প্রবৃদ্ধি তাই আধ্যাত্মিক প্রেমকেও একই সম্ভাষণে বিলসিত করা যায়। মালিক মুহম্মদ জায়সী এর সমাধান দিয়েছেন :

"চতুর নারি চিত অধিক চিহূটৈ।
জহাঁ প্রেম বাঁধৈ কিমি ছুটৈ॥
কিরিয়া কাম কেলি মনুহারী।
কিরিয়া জেহিঁ নহিঁ সো ন সুনারী॥
কিরিয়া হোই কন্ত কর তোখূ।
কিরিয়া কিহেঁ পাব ধনি মোখূ॥
জেহিঁ কিরিয়া সো সোহাগ সোহাগী।
চন্দন জৈস স্যামি কণ্ঠ লাগী॥"[৮]

(চতুর নারীর চিত্তে ঘনিষ্ঠভাবে সংলগ্ন হলো। যেখানে প্রেম বুদ্ধি পায়, বিচ্ছিন্নতা সেখানে আসবে কি করে? যে কাম-কলায় মধুর বচন জাগে, সে-কামকলা মনোহর, যেখানে তৃপ্তিজনিত অস্ফুট উচ্চারণ নেই, তা কখনও সুন্দর নয়। সম্ভোগ-কৌতুকেই

কান্তের পরিতোষ, সম্ভোগের মধ্যে সুন্দরীর মোক্ষ। যে রমণী কেলি-কৌতুক করে সেই সৌভাগ্যবতী, সে শ্যামের (প্রিয়তমের) কণ্ঠদেশের চন্দন-প্রলেপের মতো।)

এ সমাধান দৈহিক বোধের উপকরণের মাধ্যমে অধ্যাত্ম প্রেমনিষ্ঠার। কুতবন তাই বলছেন, "ভ্রমর অর্থাৎ প্রেমিক সমস্ত বাসনা এবং পরিমল গ্রহণ করলো এবং অমৃতের মহারস পান করলো। তৃষ্ণা এবং কামের প্রশান্তি এলো চিত্তে এবং হৃদয় থেকে দুঃখ ও বেদনা দূর হল। কায়াতে যে পঞ্চভূত ছিলো সে মাথা নত করলো এবং অবাক হয়ে রইলো।" অধ্যাত্ম প্রেম-রসের নির্বাধ অনুভূতির জন্য শরীরকে যে উপেক্ষা করা যায়না কুতবনের কথার তা স্পষ্ট হচ্ছে। সূফী প্রেম-সাধনায় শরীরের সহায়তায় ঈশ্বরকে পাবার একটি রূপক নির্মাণ করা হয়েছে।

সূফী প্রেমকাব্যের আরেকটি বিশিষ্টতা হচ্ছে নায়কের অপরিসীম দুঃখবোধ—— দুঃখের ব্রত নিয়েই নায়ককে অগ্রসর হতে হচ্ছে। যেমন 'পদুমাবতে' তথা 'মধুমালতী'তে, তেমনি 'মৃগাবতী'তে দুঃখের সামগ্রীতে প্রেম-চর্চা মহার্ঘ হচ্ছে। অপরিসীমের আস্বাদনের জন্য দুঃখের অনিবার্যতা সেখানে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। এ-সমস্ত কাব্যের প্রেম-দর্শন এক প্রকার দুঃখবাদের দর্শন। দুঃখবোধ 'পদুমাবতে' অথবা 'মধুমালতীতে' যতটা প্রবল, 'মৃগাবতী'তে অবশ্য ততটা নয় কিন্তু তবুও সেখানে দুঃখের অলঙ্কার রয়েছে। 'মৃগাবতী' তার এক সখীকে বলছে, "যদি তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষা থাকে তবে আপনাকে কর্তন করে দ্বিখণ্ডিত কর। প্রেমের স্বাদ সেই পেতে পারে যে আপনাকে নিঃশেষ করে প্রেমকে জানবার চেষ্টা করে। উচ্চারণ করলেই প্রেমের হর্ষ এবং রস সৃষ্টি হয়না। যদি কেউ দিতে পারে তবেই সে পায় প্রেমের গাঢ় উত্তুঙ্গ। যে পাগল সে বিনা দুঃখে তা অধিকার করতে চায়। প্রেমের খেলা যে খেলতে চায় জীবনের মোহ তাকে ত্যাগ করতে হবে।"

এ দুঃখবাদ শেষ পর্যন্ত মরণবাদে রূপান্তরিত হয়। জায়সী তথা মনঝন এ-কারণেই প্রেম-মার্গকে মরণ-মার্গ বলেছেন এবং মৃত্যুকে চিহ্নিত করেছেন অমরাপ্রাপ্তির সাধনা বলে। এঁদের পূর্বেই কুতবন কিন্তু বলেছেন, প্রেমিকের জীবন সেই দীপকের মতো হবে যা অগ্নিদাহনে জীবন্ত হয়:

"দাঘা হোই সো জানই পীরা।
দিয়া জানই জেহি দগধ সরীরা॥
জরি জরি মরই সো মরি মরি জিঅই।
সো পৈ পেম সুরা রস পিঅই॥
বিরুলা য়হ রস পাবই কোঈ।
জো য়হ পাব অমর সো হোঈ॥
সমুদঁ তরন্তি পচন্তি গিরি ঝম্প হুতাসন লিন্তি।
পেপ সুরা গিনি অঁচঈ সো কিম ন কিম করন্তি॥"[৯]

(যে দগ্ধ হয় সে-ই দগ্ধ হবার পীড়া অনুভব করতে পারে। দীপক তা জানে কেননা তার শরীরে দাহ আছে। যে জ্বলে জ্বলে মরে যায় অথবা মরে যেয়ে জীবিত হয় সেই প্রেম-সুরা পান করে। এ-এক বিরল রস, যে এ-রস পায় সে অমর হয়। সে সমুদ্র অতিক্রম করে, পাহাড়ে চড়ে, আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে প্রেম-সুরার আচমন করছে সে কি না করতে পারে ?)

সূফী প্রেম-কাব্যের নায়ক, সাধন-তত্ত্বের বিচারে পারমার্থিক সাধক এবং নায়িকা পরমেশ্বর। সমগ্র কাব্যকথা এরই রূপকের ব্যঞ্জনায় বিকশিত হয়। এভাবেই আমরা জায়সীর কাব্যকে পাচ্ছি, মনঝনের কাব্যকে এবং কুতবনের কাব্যকে পাচ্ছি। এ-সাধনাকে কুতবন বলছেন, 'ভাব পন্থ'।

চার

কুতবন তাঁর কাব্যে লোক-প্রচলিত অনেক কথাকে যুক্ত করেছেন এবং তা যুক্ত হয়েছে উপমা রূপে, উৎপেক্ষা ও রূপক রূপে কিন্তু কোথাও তা বিস্তারিত নয়— সর্বত্রই সাঙ্কেতিকতা এবং ইঙ্গিতে পরিস্ফুট।

সর্বাপেক্ষা অধিক উল্লেখ এসেছে রামায়ণের। যখন কুতবন তাঁর কাব্য রচনা করেন তখন রামকথা ভারতীয় লোক-জীবনে খুবই ব্যাপ্ত ছিলো। কুতবনের ভাষায় এ-রাম-কথা হচ্ছে 'ভারত রাম রমায়ণ চীতা'। 'মৃগাবতী'তে রামায়ণের নিম্নলিখিত ব্যক্তি এবং ঘটনার উল্লেখ আছে :

১. রাম :　　আন ভঈ জস রাম কলী কা।
রাঘো বংস রাম উতারা ॥

২. রাম-লক্ষ্মণ :　　রাম লখন জস সীতা ঠাউঁ।

৩. সীতা :　　কহাঁ সো তিরিয়া সীতা সতী।

৪. হনুমান :　　বে হনিবন্ত ছুড়ায়ে কর পর।
জস হনিবন্ত সামি কে কাজা।
পিয় বিয়োগ ভো সকতী বাত
জো লাগেউ মুহি র অপুর।
কো আনে হনিবন্ত জিঁউ
সজন সজীবন মূর ॥
হনিবন্ত জৈস করো উপকারা।
হনিবন্ত মূর সকতী কহঁ আনী।

৫. দশরথ-সুত বিয়োগ : সুত বিয়োগ দসরথ জস কীন্হা।

৬. সীতা-হরণ :　　রাবন হরী রাম ঘর সীতা।
রাবন সিয় হরী জো আয়ী।
সিয় রাবন জো লংকা হরী।

৭. রাম-বিয়োগ : রাম বিয়োগ ভয়উ জিহি কারন।
৮. সীতা-বিয়োগ : জম র সিয় কহঁ দিন দস দুআপর,
রাম ক ভয়উ বিয়োগ।
৯. বালী-বধ : য়হৈ রাম জৈঁ মারেউ বারী।
১০. লঙ্কা-দহন : হনিবন্ত সিয় লগি জারস লঙ্কা।
য়হিয়া হনিবন্ত লঙ্ক গঢ় দহা।
১১. সেতু-বন্ধন : রামা সেত বাঁধেউ সিয় লাগী।
১২. লংকায় অঙ্গদ : অঙ্গদ জাঁঘ লংকা মহঁ রোপী।
১৩. রাবণ-বধ : কো রাম জেঁ রাবণ মারা,
সিয় লাগ হন জিয়।
রাবন মার সিয় লৈ আবা।
দহে রাম জৈ রাবণ মারা।

কুতবন মহাভারতের কিছু ব্যক্তি এবং ঘটনারও উল্লেখ করেছেন। যেমন :

১. যুধিষ্টির : ধরম দুধিস্টিল উহ কহঁ ছাজা।
চেরী কহা দুদিস্টিল হরা।
কবিরা দানোঁ কর অপকারা।
২. অর্জুন : অরজুন রাহু বেধ জস কীতা।
কৌরী মার দুরপদী জীতা॥
করন অরজুন ভৈ জস খেতা।
জস অরজুন অহিবর্ণ কৈ মারে।
জো পণ্ডো কোঁরী দর জীতা।
য়হৈ ধনুক অরজুন কর লীতা॥
কিত অরজুন বানা ডর সন্ধী।

এ-ছাড়া উল্লেখ আছে ভীম, সহদেব দ্রৌপদী, কর্ণ এবং জনমেজয়ের।

বিভিন্ন পৌরাণিক কথার উল্লেখও মৃগাবতীতে আছে---যেমন, 'সাগরমন্থন', 'নৃসিংহ', 'বামন', বলি', 'হরিশ্চন্দ্র' এবং 'পরশুরাম'। মৃগাবতীতে তিনটি সংস্কৃত প্রেম-কাব্যের উল্লেখ আছে---'নল-দময়ন্তী', 'ভর্তৃহরি-পিঙ্গলা' এবং 'মাধবানল-কামকন্দলা'।

'মৃগাবতী' কাব্যে স্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় মোল্লা দাউদের 'চান্দায়নে'র। চান্দায়নের কথা-অংশের বিভিন্ন উপাদান 'মৃগাবতী'র বিভিন্ন ঘটনাকে প্রভাবিত করেছে। কিন্তু প্রধান প্রভাব লক্ষ্য করা যায় ভাব এবং ভাষার উপর। অনেক ক্ষেত্রে 'চান্দায়নে'র শব্দাবলী অবিকল রূপে মৃগাবতীতে পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। 'চান্দায়নে' যেখানে 'সঙ্গি ন সাথী মীত ন ধাঈ', 'মৃগাবতী'তে সেখানে 'সঙ্গি ন সাথী মীত ন আহা'। এভাবে 'চান্দায়নে' 'মাই মোর তুম সাসন হোহূ' এবং 'মৃগাবতী'তে 'মাঈ

মোর তুম ধাই ন হোহূ'। তেমনি 'চান্দায়নে' 'তিলক ফূল জস ফূল, সুহাবা' এবং 'মৃগাবতী'তে 'তিলক ফূল জস উপম দীজৈ'। 'চান্দায়নে' যেখানে 'দেব সরাইহি' তৈসো গোরী', 'মৃগাবতী'তে সেখানে 'দেব সরাইহিঁ তৈসো গোরী'। 'চান্দায়নে' যেখানে 'ফুল ঝরহিঁ জো হঁসি হঁসি বোলা', 'মৃগাবতী'তে সেখানে 'ফূল ঝরহিঁ জো হঁসি বোলা'।

এভাবে অগ্রসর হয়ে অনেক উদাহরণ উপস্থিত করা যায়। আমি শুধু প্রভাব প্রমাণিত করবার জন্য অল্প কয়েকটি উদাহরণ উপস্থিত করলাম।[১০]

পাঁচ

'মৃগাবতী'তে অলৌকিকতা আছে, ঘটনার অসাধারণতা আছে এবং বর্ণনায় অতিশয়োক্তির প্রাচুর্য আছে; কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও তার মধ্যে সমসাময়িক সমাজের চিত্র আবিষ্কার করা যায়। কথাকার আপন সময়ের জীবনকে তাঁর কাব্যে অনেকাংশে ধারণ করেছেন। এর ফলে 'মৃগাবতী'তে ষোড়শ শতকের প্রারম্ভের সামন্তবাদী জীবনের প্রতিচিত্রণ পাওয়া যায়।

ভারতীয় জীবনে পুত্রাকাঙ্ক্ষা একটি প্রবল ঘটনা। মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য সন্তানের আবশ্যকতা তারা অনুভব করেন। রায় বা রঙ্ক সকলেই সন্তানের জন্য লালায়িত। কেউ নিঃসন্তান থাকতে চায় না এবং পুত্রপ্রাপ্তির জন্য অনেক প্রকার উপায় সন্ধান করে। দরিদ্রকে অর্থ দান এর মধ্যে একটি।

পুত্রের জন্মের পর জ্যোতিষীর আবশ্যকতা সমাজে অনুভূত হয়। জ্যোতিষী রাশি-নক্ষত্র গণনা করে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কথন করে। এবং নক্ষত্ররাশির আধারে শিশুর নামকরণও হয়। সন্তান প্রতিপালনের জন্য ধাত্রী নিয়োগ ভারতের উচ্চবর্গীয় সমাজে প্রচলিত ছিলো। কুতবনের কাব্যে ধাত্রীর চর্চা সামাজিক রীতি হিসেবেই এসেছে।

'মৃগাবতী'তে আরও লক্ষ্য করি---সামন্তবাদী জীবনে রাজকুমারদের জন্য ধনুবিদ্যার অতিরিক্ত কাব্য, কাব্যশাস্ত্র, 'সঙ্গীত', জ্যোতিষ, ধর্ম-গ্রন্থ এবং কাম-বিজ্ঞানের অধ্যয়ন আবশ্যক ছিলো। মৃগয়া, জুয়া ইত্যাদি তৎকালীন উচ্চবর্গীয় জীবনে প্রমোদের সাধন ছিলো।

সম্ভবতঃ তৎকালীন সমাজে যুবক-যুবতীদের স্বচ্ছন্দ মিলন গ্রাহ্য ছিলো। আমরা দেখি রূপমিনী নিঃসঙ্কোচে রাজকুমারকে আপন শয্যায় বসবার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

সেকালে বিবাহের পূর্বে সার্বজনীন ভোজ দেবার প্রথা ছিলো। ভোজের পশ্চাৎ ব্রাহ্মণ মণ্ডপে প্রবেশ করতেন এবং কুল-রীতি আরম্ভ হত। বর মুকুট পরে বসতো এবং কন্যা তার কণ্ঠে জয়মাল্য পরাতো। এর পর ব্রাহ্মণেরা জন্মপত্রী দেখে ভবিষ্যৎ বিচার করতো, অবশেষে বিবাহ সমাপ্ত হত।

পারিবারিক জীবনে একাধিক পত্নীগ্রহণ একটি স্বাভাবিক প্রথা ছিলো। আবার পতির মৃত্যুতে পত্নীদের সহমরণ প্রথা প্রচলিত ছিলো। গুপ্ত সাম্রাজ্যকাল থেকেই এ-প্রথা ভারতে প্রচলিত হয়। কিন্তু কুতবন শুধু দু'পত্নীকেই সহমরণে দেননি, কুমারের দাস-দাসীরাও কুমারের মৃতদেহের সঙ্গে চিতায় ভস্মীভূত হয়েছে। এভাবে সেবক-সেবিকা এবং প্রজারা প্রভুর সঙ্গে দগ্ধীভূত হচ্ছে এমন ঘটনা ভারতের ইতিহাসে কোথাও ছিলো কিনা জানিনা।

সামাজিক এবং নাগরিক জীবনে যে-সমস্ত জনতার চিত্র 'মৃগাবতী'তে আছে তাদের মধ্যে যোগী যতীর চর্চা অত্যধিক। এদের বেশভূষারও বিস্তৃত বর্ণনা আছে। সম্ভবতঃ সে-সময় গোরখপন্থীদের প্রতাপ ছিলো। তা' ছাড়া যুদ্ধের প্রস্তুতি, মৃগয়া, হাতির জৌলুষ, রাজ-সভায় নৃত্য-সঙ্গীত, দূতী দ্বারা সন্দেশ প্রেরণ—সামন্ত জীবনের এ-সমস্ত ব্যসনের বিস্তারিত বিবরণ 'মৃগাবতী'তে পাই।

নিয়তিবাদ এবং ঈশ্বরে অটুট বিশ্বাস ভারতবর্ষের সমাজ-জীবনে একটি সর্বকালীন প্রবৃত্তি। কুতবন তাঁর কাব্যে ঈশ্বরেচ্ছার ভিত্তিতে মানুষের কর্মসাধনার তৎপরতাকে চিত্রিত করেছেন। এ-বিশ্বাসকে তিনি স্পষ্ট করেছেন : যে কাল বলবান, কালের হাত থেকে কারোই মুক্তি নেই।

ছয়

'মৃগাবতী' রচনার উদ্দেশ্য কি, এ-প্রশ্নের উত্তর খুব স্পষ্ট ভাবে দেওয়া সম্ভব নয়। এ-ধরনের রচনা যেমন একদিকে বিশেষ কাব্য-চেতনার অভিব্যক্তি, আবার অন্যদিকে সূফী তত্ত্ববোধের রূপক। কুতবন তাঁর কাব্যের এক স্থানে বলছেন :

"মৈঁ রস বাত কহী রস তোসোঁ,
জো রস কীজই বাত।
সো রস রহে দুহুঁ জগতাকর।
জো রস সোঁ রঁগরাত ॥"

অর্থাৎ আমি রসের সাহায্যে রসপ্রাপ্তি এবং ভোগের কথা তোমাকে বলেছি এ-আশায় যে তুমি হয়তো রসের কথা বলবে। তার সে-রস উভয় জগতে বিদ্যমান থাকে যে রসের সাহয্যে রসপ্রাপ্তি এবং ভোগে অনুরক্ত থাকে। এ-উক্তিতে মনে হয় কুতবন রস অথবা প্রেমের কথা বলতেই আগ্রহী ছিলেন।

আবার কাব্যের আরম্ভে বলেছেন :

'এক বাত অব কহউঁ রসাল।
রতন মোঁতি আনউঁ ভর থাল ॥

পড়ত সুহাবন দেজৈ কানূ।
য়হি কৈ সুনত ন ভাবই আনূ ॥'

অন্তে বলেছেন—

'বহুত অরথ হহিঁ ইহঁ মহঁ,
জো সুধি সে কাহূ বূঝ।
কহেউ জহাঁ লগ পারেউ।
জো কছু বহৈ হিয়ৈঁ মৈঁ সূঝ ॥'

কবির বক্তব্য হচ্ছে, তিনি অনেক রসপূর্ণ বাক্য বলেছেন যেগুলোর নানাবিধ অর্থ হতে পারে। অর্থ নির্ণয়ের বিষয়টি তিনি পাঠকের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। তবে এটা স্পষ্ট, তিনি তাঁর কথার মাধ্যমে কিছু রহস্যকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। এ-রহস্য কি? সাধারণ বিচারে 'মৃগাবতী' একটি প্রেম-কাহিনীর অধিক কিছু নয় কিন্তু কুতবন ছিলেন সূফী-সাধক এবং সূফী-সাধকগণ প্রেমের মাধ্যমে পরমাত্মার নৈকট্য প্রাপ্ত হন। এ-প্রেম নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, সে-জন্যই প্রতীকের সাহায্যে এর বর্ণনা সম্পন্ন হয়। লৌকিক প্রেম-প্রদর্শনের প্রতীকের সাহায্যে এ-বর্ণনা রূপ পায়। সূফীগণ ঈশ্বরকে নারীরূপে স্বীকার করেন। সম্ভবতঃ কুতবন তাঁর প্রেম ব্যাখ্যায় সূফীগণের প্রেমমূলক সাধনার স্বরূপ উপস্থিত করেছেন। মৃগাবতী হচ্ছে পরমাত্মা বা ঈশ্বর বা আল্লাহ্, রাজকুমার হচ্ছে জীবাত্মা এবং দূত হচ্ছে গুরুর প্রতীক। কিন্তু রাজকুমারের দ্বি-পত্নীত্বে এ-বিবেচনাটি খণ্ডিত হয়।

রাজকুমার যখন কাঞ্চনপুর উপস্থিত হলেন তখন সামনে দেখলেন সাতটি প্রতোলী বা পথ। এ-সাতটি প্রতোলী পার হয়ে মৃগাবতীর কাছে উপস্থিত হওয়া যাবে। কুতবনের ভাষায়—

'সাতোঁ পঁবরি নাঁধি জো আবা।
বেগর বেগর সাতউ ভাবা।''

এ-সাতটি পথ সূফী-মার্গের সাতটি মঞ্জিল বুঝায়—'লবুদিয়্যত', 'ইশ্‌ক', 'জহূদ', 'মারিফত', 'বজ্‌দ্', 'হকীকত' এবং 'বস্‌ল্'।

সাত

মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সিদ্ধান্তে এসেছেন, কুতবনের 'মৃগাবতী'র ভাষা অবধী[১১]। রামচন্দ্র শুক্ল লিখেছেন—এ-সমস্ত প্রেম-কাহিনী পূর্বী হিন্দী অর্থাৎ অবধী ভাষার এক নিয়ত ক্রমের সঙ্গে চৌপাঈ-দোহায় লিখিত হয়েছে।[১২] এ-সমস্ত কাহিনী বলতে শুক্ল বুঝেছেন, চান্দায়ন, মৃগাবতী, পদ্মাবতী এবং মধুমালতীকে। 'চান্দায়নের' ভাষা সম্পর্কে আবদুল কাদির বদায়ূনীর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য:

'দিল্লী সুলতনতের প্রধান মন্ত্রী জৌনাশাহের সম্মানে চান্দায়ন রচিত হয়েছিলো এবং দিল্লীতে মখদুম শেখ তকীউদ্দীন রব্বানী জনসমক্ষে এ-কাব্য পাঠ করতেন। এতে স্পষ্ট হয়, চান্দায়নের ভাষা এমন এক ভাষা যা জৌনাশাহ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ মানুষও বুঝতে পারতো। এ-ভাষার নাম হিন্দবী। চিশ্‌তী সূফী হজরত শেখ ফরীদুদ্দীন গঞ্জশকর এবং হজরত নিজামউদ্দীন ঔলিয়া আপন আপন মুরীদদের সঙ্গে এ-ভাষায় কথা বলতেন। মৌলা দাউদ এ-ভাষায়ই তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন।'[১৩]

বদায়ূনীর মন্তব্য থেকে এ-তাৎপর্য উদ্ধার করতে পারি যে, 'চান্দায়নে' প্রযুক্ত ভাষা এমন এক ভাষার স্বরূপে ঘটেছে যে-ভাষা কোনও সীমিত প্রদেশে উচ্চারিত ছিলোনা বরঞ্চ যার প্রভূত বিস্তার ছিলো এবং দিল্লীর আশেপাশের জনসাধারণের বোধগম্যতার মধ্যে ছিলো।

বাদশাহ জাহাঙ্গীরের সময়কালীন ইতিহাসকার মুহম্মদ কবীর তাঁর 'অফসানা-এ-বাদশাহান' গ্রন্থে মধুমালতীর রচয়িতা মনঝনের আশ্রয়দাতা ইসলাম শাহ্ সম্বন্ধে লিখেছেন : "তাঁর (অর্থাৎ ইসলাম শাহ্) সঙ্গে উলেমা বা ধর্মাচার্য, ফুজলঃ বা বিদ্বান এবং শুআরা বা কবি থাকতেন। যেখানে তিনি অবস্থান করতেন তার নিকটেই এঁদের শামিয়ানা থাকতো এবং তাঁদের জন্য পান এবং সুগন্ধির ব্যবস্থা থাকতো। এঁদের মধ্যে 'মধু মালতী'র রচয়িতা মীর সৈয়দ মনঝন, শাহ মুহম্মদ ফরমুলী এবং তাঁর ভ্রাতা মুসন এবং সূরদাস প্রভৃতি বিদ্বানও ছিলেন। এঁরা আরবী, ফারসী এবং হিন্দী ভাষার কবিতা আবৃত্তি করতেন।[১৪]

উপরের উক্তিতে স্থানীয় ভাষার উল্লেখ হিসেবে হিন্দবীর নাম পাওয়া যাচ্ছে। এ-ভাষা রাজধানী দিল্লী এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার জন-গ্রাহ্য ভাষা ছিলো। রাজদরবারেও এ-ভাষার চর্চা ছিলো।

'মৃগাবতী' কাব্যের ভূমিকায় শিবগোপাল মিশ্র লিখেছেন, "অবধীর বিকাশকালে জৌনপুর থেকে দিল্লী পর্যন্ত যে ভাষা প্রচলিত ছিল তা মূলতঃ একই রূপের ছিল। এখন পর্যন্ত কুতুবনের জন্মস্থানের যথার্থ পরিচয় আমরা পাইনি কিন্তু জায়সীর জন্মস্থান যে জায়স তা সিদ্ধ বলে গৃহীত হয়েছে। যদি জায়সীর এবং কুতুবনের তুলনামূলক আলোচনা করি তবে অনুভব হয় যে এরা উভয়েই সমরূপে একই ভাষাকে প্রয়োগ করেছেন। এদের উভয়ের ভাষায় ঠেট শব্দের প্রচুর প্রশ্রয় ঘটেছে। এতে প্রমাণিত হয় যে পূর্বে গাজীপুর, পশ্চিমে দিল্লী, উত্তরে সমগ্র অবোধ এবং দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত অল্পবিস্তর পরিবর্তনসহ অবধি ভাষা প্রচলিত ছিল।"

'মৃগাবতী'র ভাষা সম্পর্কে কুতবনের উক্তি উল্লেখ্যযোগ্য :

"শাস্ত্রী আখর বহু আয়ে।
ঔ দেসী চুনি চুনি সব লায়ে॥

খট ভাষা জো ঈহহিঁ বাঁচা।
পণ্ডিত বিনু পুছত হো সাঁচা ॥"

অর্থাৎ এ কাব্যে শাস্ত্রসম্মথিত অক্ষর বা শব্দ অনেক এসেছে আবার দেশী শব্দও নির্বাচন করে প্রয়োগ করা হয়েছে। এ কাব্যের মধ্যে ষড় ভাষা প্রয়োগ করা হয়েছে তাই পণ্ডিতের সাহায্য ব্যতিরেকে এ ভাষা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নয়।

হিন্দবী ভাষার উদাহরণ স্বরূপ আমি 'কুতব শতক'[১৫] থেকে একটি উদাহরণ দিচ্ছি :

"দিল্লী সহর সুরতান পেরোজ থানা।
সাহিজাদা কুতবদী জুআণা ॥
বরস নত তীমি তেগহ পবাণা।
বীবীয়াঁ লাজলো ভই বন্ধানা ॥"

'মৃগাবতী' থেকে সমধর্মী একটি উদাহরণ :

"সাহ হুসৈন আহি বড় রাজা।
ছাত সিংঘাসন ইনহি পৈ ছাজা ॥
পণ্ডিত ঔ বুধিবন্ত সয়ানা।
পোথা বাঁচ অরথ সব জানা ॥"

উভয় উদ্ধৃতির মধ্যে স্বভাবজাত ঐক্য আছে কিন্তু প্রথম উদাহরণে ঠেট্ প্রকৃতি খুব প্রকট। এতে এ-সিদ্ধান্তে আসা চলে যে 'মৃগাবতী' মূলতঃ অবধী কিন্তু এর মধ্যে নানা-বিধ মিশ্রণ ঘটেছে। আমি এখানে ব্যাকরণ নিয়ে আলোচনা করলাম না। কুতবনের ভাষায় দেশী অনেক বুলি এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রভাব পড়েছে, অপভ্রংশের শব্দ অনেক এসেছে বিদ্যপতির 'কীর্তিলতা'য় প্রযুক্ত বিভক্তির অনেক উদাহরণ মৃগা-বতীতে পাওয়া যাবে, ভোজপুরী শব্দ পাওয়া যাবে, খড়ীবোলীর অনেক প্রয়োগ পাওয়া যাবে। এ কাব্যে অবধী ছাড়াও অন্য ভাষার ক্রিয়া আছে।

'মৃগাবতী' কাব্যের পাঠ সম্পাদন করতে গিয়ে ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত এবং ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত উভয়েই অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন। অসুবিধার কারণ হলো এক একটি পাণ্ডুলিপিতে এক এক ধরনের শব্দ এসেছে, যেমন 'একডলা' পুঁথিতে পাচ্ছি 'অগম', 'ভোরা', 'মন্দির', 'সাথ', 'কাহ', 'অজগুন', 'রাউ', 'সাজা', 'বীকানের পুঁথি'তে এ-সব শব্দের পরিবর্তে যথাক্রমে পাচ্ছি—'বহুত', সুধা', 'মহল', 'সংগ', 'করন', 'অচম্ভী', 'রাজা' এবং 'রচারা'। আবার সর্বনামের ক্ষেত্রে দেখা যায় 'একডলা পুঁথি'তে আছে—'তোহার', 'তোহ', সেখানে 'বীকানের পুঁথি'তে এসেছে 'তুম্হার' এবং 'তো'। আবার বিভিন্ন পুঁথি'তে ক্রিয়ারূপের ভেদও পাওয়া যায়। যেমন 'একডলা পুঁথি'তে যেখানে আছে 'লীতিন্হ', 'দীতিসি', 'কহেউ' 'বসউ' সেখানে 'বিকানের পুঁথি'তে আছে, 'লিহিস', 'দিহিস', 'কহউ', এবং 'বসউ'।

এতে প্রতীয়মান হয় যে লিপিকরগণ অনুলিখনের সময় ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এগুলোর মধ্যে কোন্‌টি যে কবির নিজস্ব রূপ তা স্পষ্ট করে বলা কঠিন। এর ফলে বর্তমানকালের সম্পাদককে যে কোনো একটি পাঠকে গ্রহণ করতে হচ্ছে, মূল ভাষার স্বরূপ পুরোপুরি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হচ্ছেনা। 'পদ্মাবতী' সম্পাদনার সময় আমি স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে জায়সীর যথার্থ পাঠ ফারসী প্রতিলিপিতেই রক্ষিত আছে। 'মৃগাবতী' সম্পর্কেও অনুরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়। 'পদ্মাবতী'র মতো 'মৃগাবতী'র হস্তলিখিত পুঁথিও ফারসী হরফে এবং দেবনাগরী হরফে পাওয়া যাচ্ছে। দেবনাগরী হরফের পুঁথিগুলোতে পাঠের পরিবর্তন লক্ষণীয়, ফারসী হরফের পুঁথিতে যথার্থ পাঠ বিধৃত আছে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। ফারসী লিপিতে 'মৃগাবতী'র যথার্থ ভাষা সুরক্ষিত আছে বলে ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য দুটি কারণ নির্দেশ করেছেন। একটি কারণ হলো, মূল পুঁথি ফারসী হরফে লিপিকৃত হ'য়েছিলো। এবং নাগরী-কৈথীতে লিপিকৃত পুঁথিগুলো ফারসীর তুলনায় অনেক বেশী আধুনিক। দ্বিতীয়তঃ ফারসী লিপিতে লিপিকরদের ভাষা পরিবর্তনের কোনো সুযোগ ছিলোনা, তাই তারা মূল পাঠকেই যথাযথ অনুসরণ করেছেন।[১৬]

উপরের সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদিত পাঠকেই আমি গ্রহণ করেছি এবং 'মৃগাবতী'র ভাষাকে অবধী ভাষারই একটি রূপব্যঞ্জনা হিসেবে মেনে নিয়েছি।

আট

'মন্‌ঝন্‌' নামের মতো 'কুতবন' নামটিও একটি অসম্পূর্ণ নাম মনে হয়। কাব্যমধ্যে কবি আপনাকে 'কুতবন' বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং নিজের বিশেষ পরিচয় দেননি। সূফী সাধক পরম্পরায় তিনি সুহরাবর্দী সম্প্রদায়ভুক্ত এ-কথার উল্লেখ কাব্যের আরম্ভেই আছে এবং তার পীরের নাম বুধন বা বুঢ়ন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহ-এ-বকতে-এর রূপে হুসেন শাহের উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর বৈভব বর্ণন করেছেন, যেমন :

"শাহ হুসৈন আহি বড় রাজা।
ছাত সিংঘাসন ইন্‌হ পৈ সাজা॥"

অথবা

"সবন সুনহু চিত লাই কৈ কহৌ বাত হৌঁ এক।
আউ বঢ়উ হুসৈন সাহ কৈ আহি জগত কৈ টেক॥"

৯০৯ হিজরীতে কবি যখন তাঁর কাব্য রচনা সমাপ্ত করেন তখন বাংলা-বিহার অঞ্চলে দুজন হোসেন শাহ বিদ্যমান ছিলেন—একজন জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী

এবং অন্যজন বাংলার হোসেন শাহ। এখন ভাবা যেতে পারে যে শাহ-এ-বক্ত বলে যে হোসেন শাহকে কবি স্মরণ করেছেন তিনি বাংলার হোসেন শাহ। জৌনপুরের হোসেন শাহ রাজ্য হারিয়েছিলেন কাব্য রচনার অনেক আগে। উভয় হোসেন শাহ আত্মীয়তা বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন—বাংলার হোসেন শাহ ছিলেন হোসেন শাহ শর্কীর সম্বন্ধী। রাজ্যহারা হয়ে শর্কী ভাগলপুরের কহলগায় বাংলার হোসেন শাহের অতিথি ছিলেন। কবি রাজ-প্রশস্তিতে বলছেন :

'হোসেন শাহ একজন বড় রাজা, ছত্র এবং সিংহাসন তাকেই শোভা পায়। ইনি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী। ইনি পুস্তক অর্থাৎ কোরান শরীফ পাঠ করেন এবং তার সমস্ত অর্থ তার বোধগম্য হয়। যুধিষ্ঠিরের মতো ইনি ধর্মপ্রাণ, আমার উপর এর ছায়া বা কৃপা রয়েছে এবং প্রার্থনা—ইনি যেন জগতে জীবিত থাকেন। ইনি এত অধিক দানশীল যে তাঁর দানের অঙ্ক গণনা করা যায়না। বলি এবং কর্ণও দানে এর সমতুল্য নয়। গন্ধর্বরাজও এর সেবা করেন। ইনি চতুর, জ্ঞানী, এবং সকল ভাষা জানেন। এর সমমানের আর কাউকে আমি দেখিনি। সভাকক্ষে যা কিছু নিবেদন হয় সবই ইনি শ্রবণ করেন এবং যখন আমরা প্রধান কাউকে দেখি তখন একেই দেখি।'

জায়সী এবং মন্‌ঝন্ তাঁদের স্ব স্ব কাব্যে যে স্বভাবের রাজ-প্রশস্তি করেছেন, কুতবনের রাজ-প্রশস্তিও একই রকম। অর্থাৎ রাজ-প্রশস্তি একটি প্রথা, যে কোনও রাজার প্রতি তা' সাধারণভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। কুতবনের প্রশস্তিতে তাই কোনও বিশেষ রাজা চিহ্নিত হচ্ছেননা অথবা বলা যায় বিবৃত গুণাবলীর সাহায্যে কোনও বিশেষ রাজাকে নিশ্চিত করা যাচ্ছেনা। সুতরাং কুতবনের হোসেন শাহ বাংলার হোসেন শাহও হতে পারেন আবার জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কীও হতে পারেন। ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত এবং ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত কুতবনের প্রশস্তি-কৃত রাজাকে জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী বলে ধারণা করেছেন।

কবির পীর শেখ বুধন বা বুচন সম্ভবতঃ শেখ বুরহান, এ-রকম ধারণা কেউ কেউ করেন। জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যে শেখ বুরহানের উল্লেখ আছে :

"গুরু মোহদী সেবক মৈঁ সেবা।
চলৈ উতাইল জিহ্ব কর খেবা॥
অগুয়া ভয়েউ শেখ বুরহানূ।
পন্থ লাই মোহি দীন্হ গিয়ানূ॥"

ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত এ-মতকে মান্য করেন না। তিনি এক মখদুম শেখ বুচনের নামোল্লেখ করেছেন যিনি এক সুবিখ্যাত সূফী সন্ত ঈসা তাজ জৌনপুরীর শিষ্য ছিলেন। ইনিই কুতবনের পীর ছিলেন বলে পরমেশ্বরীলাল ধারণা করেছেন।[১৭]

'মৃগাবতী' কাব্যের দু'স্থানে রচনা-তিথি উল্লিখিত হয়েছে—কাব্যের প্রারম্ভে এবং সমাপ্তিতে। প্রারম্ভিক উল্লেখ হিজরী সালের এবং অন্তের উল্লেখ বিক্রমসংবতের। উল্লেখগুলো নিম্নরূপ :

ক. "ইন্হ কে রাজ এহি রে হম কহে।
নৌ সৈ নৌ জৌ সংবত অহৈ ॥
মাহ্ মোহর্রম চাঁদহি চারী।
ভেদ সম্পূরন ক হৈ ন পারী ॥···

দুই রে মাঁস দিন দস মহঁ জোরত য়হ ঔরানেউ আই।
এক এক বোল মোঁতি পিরোবা বকতা চিত মন লাই ॥"

খ. "জহিয়া হুত পন্দ্রহ সৈ সাঠী।
তহিয়া ইহ রে চৌপঈ গাঁঠী ॥···
বহিলা পাখ ভাদোঁ অহী (চিহঁ দহী)।
সিংঘ রাসি সিংঘনি রাবহী ॥"

এ-উল্লেখগুলো থেকে ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত বিস্তারিত গণনা করে রচনা-তিথি নির্ধারণ করেছেন। হিজরী ৯০৯, ৪ঠা মুহররম হচ্ছে জ্যৈষ্ঠ শুক্লপক্ষ ৬, সংবত ১৫৬০ এবং খ্রীস্টীয় হিসাব হচ্ছে ২৯ জুন ১৫০৩।[১৮]

তথ্য-সঙ্কেত

১. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত 'মৃগাবতী' (প্রামাণিক প্রকাশন, আগরা ১৯৬৮) : উপসংহার খণ্ড, স্তবক ৪২৬।
২. সৈয়দ আলী আহসান : পদ্মাবতী, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৬৮।
৩. মেঘরাজ প্রধানের কাহিনী-সংক্ষেপ দিয়েছেন ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত তাঁর সম্পাদিত 'মৃগাবতী' কাব্যে।
৪. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত 'চান্দায়ন', প্রামাণিক প্রকাশন, আগ্রা ১৯৬৭।
৫. যে মেষপালন করে এবং মেষের লোম থেকে কম্বল তৈরী করে।
৬. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র সম্পাদিত পাঠের ৯৮ স্তবক।
৭. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র সম্পাদিত পাঠের ২৩০ স্তবক।
৮. সৈয়দ আলী আহসান : পদ্মাবতী, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা ১৯৬৮, পৃ. ৬৩৭।
৯. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র সম্পাদিত পাঠের ২১৬ স্তবক।

১০. বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন : ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত সম্পাদিত কুতবন-কৃত 'মিরগাবতী', বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ভৈরবনাথ, বারানসী ১, ১৯৬৭।

১১. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা।

১২. রামচন্দ্র শুক্লর 'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস'।

১৩. ডক্টর পরমেশ্বরীলাল কর্তৃক উদ্ধৃত।

১৪. কালীপ্রসাদ জায়সবাল রিসর্চ ইনস্টিটিউট, পাটনায় রক্ষিত ব্রিটিশ সংগ্রাহকের হস্তলিখিত পুঁথির প্রতিলিপি। (ডক্টর পরমেশ্বরীলাল কর্তৃক উদ্ধৃত)।

১৫. 'কুতব শতক': মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত, 'ভারতীয় জ্ঞানপীঠ প্রকাশন'।

১৬. ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত কোনও প্রাসঙ্গিক উল্লেখ ছাড়া কতগুলো মন্তব্য করেছেন অন্যপক্ষে রামচন্দ্র শুক্ল শেখ বুরহানকে কুতবনের পীর বলে উল্লেখ করেছেন—· 'য়ে চিশতী বংশ কে শেখ বুরহান কে শিষ্য থে।' ('হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস :' নাগরী প্রচারিণী সভা, কাশী, সংবত ২০২২, পৃ. ৯৪-৯৫)।

১৭. ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত সম্পাদিত কুতবন-কৃত 'মিরগাবতী'।

১৮. ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকাংশের পৃ. ২-৪

মৃগাবতী

স্তুতি-খণ্ড

আমি স্মরণ করছি সে অলক্ষ্য সৃষ্টিকর্তাকে যিনি সমস্ত সংসার রক্ষণ করে তার মধ্যেই স্থিত হয়েছেন। যিনি নিরঞ্জন এবং যাকে দেখা যায় না, যিনি জ্যোতিস্বরূপ এবং যাকে দেখবার বাসনায় মানুষ আপনাকে ভুলে যায়। মহা সিদ্ধ তিনি পরমেশ্বর তাঁর না স্ত্রীর বেশ না পুরুষের। মাতা, পিতা, বন্ধু তার কেউ নেই। তিনি এক এবং একেলা, তাঁর দ্বিতীয় নেই। যে এর ব্যতিক্রম কথা বলে সে নরকে যাবে এবং আর্তনাদ করবে। কর্তা তিনিই একক, দ্বিতীয় কোনও কর্তা নেই। গুণী পণ্ডিতগণ বিবেচনা করে দেখেছেন, দুয়েই দ্বন্দ্ব এবং অসুখ।[১]

তিনি ইচ্ছে করলে কোন রাজাকে নিঃস্ব ও বিবস করতে পারেন, ইচ্ছে করলে কাউকে সর্বস্ব সমৃদ্ধি দিতে পারেন। কাউকে তিনি সজ্ঞান পণ্ডিত করেন যিনি ধর্মগ্রন্থের গ্রন্থরাজি পাঠ করেন। চঞ্চলকে তিনি নিশ্চল করতে পারেন।[২]

বিশ্ব রচনা করে তিনি আপন চরিতাখ্যান প্রসারিত করেছেন। মহান তিনি চিত্রকর তাঁকে অনুসন্ধান করতে হলে তাঁর চিত্রকর্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাঁকে অনুসন্ধান করলে শীঘ্রই তাঁকে পাবে। যে তার আত্ম-দৃষ্টি হারিয়ে ফেলতে পারে সেই পরম জ্যোতির সঙ্গে মিশে যেতে পারে। পরম তত্ত্বে লীন হয়ে সে তার চিত্তে প্রীতির সম্ভার সঞ্চিত করে সহজ স্বরূপে নিমগ্ন হবে। দিনান্তেই কর্ম সম্পাদন কর, কেননা রাত্রি হলে অনন্তর পশ্চাতাপ হবে। কাম, ক্রোধ, তৃষ্ণা, মদ এবং মায়া এই পাঁচ রিপু কতদিন পর্যন্ত ব্যাপ্ত থাকবে? যতক্ষণ পাবক, পবন, মৃত্তিকা এবং পানি থাকবে ততক্ষণ স্বার্থসমূহের মধ্যেই মানুষ থাকবে।[৩]

সৃষ্টিকর্তা প্রথমে হজরত মুহম্মদের নূরকে নির্মাণ করলেন এবং তৎপর উক্ত নূরের চিন্তা থেকেই অন্য সকল কিছু নির্মিত হল। তার জন্যই তিনি আপনাকে প্রকট করলেন এবং শিব ও শক্তিকে দ্বিধাবিভক্ত করলেন। যার জিহ্বায় তার নাম উচ্চারিত হয়না সে অগ্নিতে জ্বলবে, মোক্ষ পাবেনা। যে তার হৃদয়ে তাঁর নামকে স্থান দিয়ে বাক্য বা কলেমা শুনাবে সে মুক্ত হয়ে ইন্দ্রাসন প্রাপ্ত হবে। ভ্রম ত্যাগ করে সজ্ঞান হও, তাঁর (মুহম্মদের) নাম ভুলে কি করে রয়েছ? যার জন্য সমস্ত সংসারের রচনা হয়েছে অনেক ভাবনা এবং ভাবের সঙ্গে, ধর্ম পথের পুরাণ বা কুরআন রচিত হয়েছে তাঁকে অবলম্বন কর। তিনিই একমাত্র রাজন।[৪]

মুহম্মদের চার মিত্রের বর্ণন করছি। আবুবকর ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ এবং জ্ঞানী। এর পরই আসে ওমরের নাম যিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক। উসমান দৈব বচনকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন মুহম্মদের নির্দেশে। সিংহ সদৃশ আলী বুদ্ধির সাহায্যে দুর্গম গড়কে জয় করে-ছিলেন অর্থাৎ তিনি ছিলেন বিজয়ী বীর। অষ্টধাতুতে তৈরী দরজা উত্তোলন করে ফেলে দিয়েছিলেন মাটিতে। এ-চার মিত্র সকলেই ছিলেন পণ্ডিত এবং পরস্পর সমতুল্য। এঁরা যাদের ধর্মপথ দেখিয়েছেন, আজীবন সে-পথ তারা ভুলেনি।[৫]

শেখ বুঢ়ন জগতের একজন খাঁটি পীর ছিলেন। তাঁর নাম উচচারণ করলেই শরীর শুদ্ধ হয়। সে নাম উচচারণ করে কুতবন তাঁর পদস্পর্শ করেছিলো। তিনি সুহরাবর্দী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং উভয় লোকেই (ভূলোক এবং স্বর্গলোক) নির্মল ছিলেন। এর সাহায্যে অথবা এর সান্নিধ্যে এসে কুতবনের সকল পাপ খণ্ডন হয়েছিলো, পুরাতন এবং নতুন সকল পাপেরই খণ্ডন ঘটেছিলো। নবরূপ তিনি ছিলেন অবতার কেননা, তিনি ছিলেন সকল পীরের শ্রেষ্ঠ। এর দ্বারা যাঁরই পথ দর্শন ঘটে তিনিই এক নিমেষে গন্তব্যে পেঁাছে যান। যে-পথ তিনি দেখিয়েছেন সে-পথে চলবার ক্ষমতা যদি কেউ অর্জন করে এবং সে যদি সত্যভাবে আরূঢ় থাকে তা'হলে সে এক নিমেষে গন্তব্যে পেঁাছে যাবে।[৬]

হুসৈন শাহ্ হচেছন একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি, ছত্র এবং সিংহাসন তাঁরই শোভা পায়। ইনি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী, পুস্তক অর্থাৎ কুরআন পাঠ করেন এবং তার সমস্ত অর্থ জানেন। যুধিষ্ঠিরের ধার্মিকতা একেই শোভা দেয়, আমি এঁর ছায়া পেয়েছি। এহেন নৃপতির জয় হোক এবং তিনি দীর্ঘজীবী হোন। ইনি এত দান করেন যে তার গণনা হয়না, দানে বলি এবং কর্ণ এর সমতুল্য নয়। যতদূর পর্যন্ত গর্দ্ধবরা রাজত্ব করেন সকলেই এঁর সেবা করেন। ইনি চতুর, জ্ঞানী, সমস্ত ভাষাজ্ঞানী, এর সমতুল্য আর কাউকে আমি কোথাও দেখিনি। সভায় যা কিছু নিবেদন করা হয়, ইনি সব কিছুতেই কর্ণপাত করেন। পুনর্বার দেখলেও শোভমান একেই দেখা যায়।[৭]

তাঁর রণসজ্জা অগণিত, সেনাবাহিনীর পদদাপে ধূলায় সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত হয়। সম্মুখবর্তি সকলকে স্পষ্ট দেখা যায় কিন্তু পশ্চাতের সবাইকে ধূলায় অস্পষ্ট দেখায়। অনেক রাজা এবং রাণী মেঘাড়ম্বর ছত্র দিয়ে এর সেবা করেন। তাঁর ঘোড়ার পদস্পর্শে এমন প্রচণ্ড ধূলিঝড় উঠে যে সপ্তাম্বর অষ্টাম্বরে পরিণত হয় এবং পৃথ্বীতল এক প্রস্ত মৃত্তিকা বিমুক্ত হয়ে সাতের স্থানে ছয়ে পরিণত হয়। যখন তাঁর হস্তীসকল গমন করে জগতে সংশয় জাগে এবং পাতালে বাসুকী এবং আকাশে ইন্দ্র উভয়েই বুদ্ধিহারা হন। যদি কেউ তাঁকে জীব দান করতে চায় তাহলে সে তাঁর দ্বারপ্রান্তে সেবা করবে। পৃথিবীতে যার উপরই তাঁর রোষ আপতিত হবে সেই ভস্মীভূত হবে।[৮]

ইনি ইন্দ্র এবং বাসুকীর কাছ থেকে দণ্ডকর গ্রহণ করেন এবং লঙ্কাপতিও একে দণ্ডকর প্রদান করেন। মানুষের কথাই নয়, দেবতারাও এর আদেশ পালন করেন। সহৃদয়তার সঙ্গে ইনি যখন কথা বলেন, দু:খ দারিদ্র্য এবং পাপ দূরীভূত হয়। এর

সমতুল্য কোনও ব্যক্তিই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেনি, তাঁর যোগ্য কেউ নেই যার সঙ্গে তার উপমা দেওয়া চলে। ইনি কোনও পাপের চিন্তা চিত্তে স্থান দেননি, এমন চিন্তাও কখনও করেননি যে ধর্মকাজ করলেই কৃত পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যাবে। ইনি পৃথিবীতে অধর্ম কখনও করেননি, নানাবিধ ধর্মকর্মে ইনি সর্বদা নিযুক্ত রয়েছেন। সমস্ত রাত এবং দিন ইনি সৃষ্টিকর্তার চিন্তা করেন এবং বিধাতা প্রসন্ন হলে তিনি শান্তি লাভ করেন।[৯]

হুসৈন শাহ পুরাণ অর্থাৎ কুরআন পাঠ করেন এবং কঠিন অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করেন। এক এক বাক্যকে দশ-দশ ভাবে ব্যাখ্যা করেন যা দেখে পণ্ডিতগণ চকিত হন এবং বাক্যহারা হন। এর গুণপনা সম্পর্কে আরও মহৎ বাক্য উচ্চারণ করা যায় কিন্তু আমি তার কতটাই বা বলতে পারি? সহস্র জিহ্বা যদি আমার থাকতো তাহলে হয়তো এর কিছুটা প্রশংসা করতে পারতাম। যতদিন পর্যন্ত সুমেরু স্থির থাকবে এবং হর-জটা অর্থাৎ গঙ্গা এবং যমুনায় জল প্রবাহিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত একটি কথাই বলা যায়, হুসৈন শাহের আয়ু বৃদ্ধি হোক এবং পৃথিবীতে তার প্রতিষ্ঠা থাকুক।[১০]

এই হুসৈন শাহের রাজ্যকালে আমি এই কাব্যকথা বলছি যখন ৯০৯ সন এবং মুহররম মাসের চাঁদের চতুর্থ তারিখ। সম্পূর্ণ বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। আমি এই রচনাকে সাজিয়েছি গাথা, দোহা, অরিল্ল, আর্যা, সোরধা এবং চৌপাই ছন্দভঙ্গীতে। এ-কাব্যে শাস্ত্র-সম্মথিত শব্দ অনেক এসেছে এবং দেশী শব্দ অনেক নির্বাচন করে ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠের জন্য এ-কাব্য সুহাবনা অর্থাৎ সুপাঠ্য বা শ্রোত্ররসায়ন। অন্যের কানে নয়, আপন কানে শুনে এ কাব্য উপভোগ করতে হবে। দু মাস এবং দশ দিনে এ-কাব্য সমাপ্ত হয়েছে। এ-কাব্যের প্রতিটি শব্দ মুক্তার ভাতির মতো বিশেষ, মন এবং চিত্তকে নিযুক্ত করে এ-কাব্য কথিত হয়েছে।[১১]

এ-কাব্যকথা তখনই আমি বলবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যখন জেনেছি আমার চেয়েও অধিক বুদ্ধিমানগণ এ-কাহিনী অতীতে বলেছেন। নরেন্দ্র হুসৈন শাহ এ-সম্বন্ধে যা বলেছেন তা' আমি সম্ভারপূর্বক বলছি। তিনি বলেছেন, "সব কথাই যে ভলো তাতো নয় কিন্তু কিছু কথাতো নিশ্চয়ই ভালো, কিছু অংশ হয়তো জলীয় অর্থাৎ তরল। নিষকলঙ্ক এবং নির্মলতো একমাত্র বিধাতা, আর কেউ নেই। এজন্য হতাশ হবার কিছু নেই। যদি আমার কথায় ত্রুটি থাকে সংশোধন করে নিন। কর্তা যাকে মহৎ করে সৃষ্টি করেছেন, তিনি অন্যের দোষ প্রকাশ করেননা। পূর্ব পুরুষদের কথন যিনি মানেন না, তাঁর কখনও মোক্ষ হবেনা।"[১২]

কুঁঅর অবতার তথা প্রশিক্ষণ খণ্ড

আমি এখন এক রসাল বার্তা বলছি এবং পাঠকের জন্য একটি থালা ভরে রত্ন এবং মোতী এনেছি। আমি এ-রকম শুনেছি যে অতীতে এক রাজা ছিলেন যিনি ছিলেন

অত্যধিক দানী, লাবণ্যপূর্ণ এবং বিচারবান। তাঁর সৈন্যসম্ভার ছিলো অনেক, অশ্বারোহী ছিলো অগণিত এবং দৈব তাঁকে ধর্মমার্গের মধ্যে স্থিত রেখেছিলো। তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে কোনও রাজা সফলতা লাভ করেনি এবং যে যুদ্ধ করতো সে তৎক্ষণাৎ পরাজিত হতো। একজন মানুষের পক্ষে যা কিছু লাভ করা সম্ভব সব কিছুই তিনি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তার শুধু একটি পুত্র ছিলোনা। অর্থ, দ্রব্য, হাতি-ঘোড়া অনেক ছিলো, গণনাহীন ভাণ্ডার ছিলো। তিনি দু-হাত জড়ো করে সৃষ্টি কর্তার কাছে যাচ্ঞা করতেন, হে সৃষ্টিকর্তা আমাকে শীঘ্র পুত্র দাও।[১৩]

তিনি ভাণ্ডার খুলে দান করা আরম্ভ করলেন। যারা দান পেল তাদের দারিদ্র্য দূর হল। তিনি ক্ষুধার্তকে খাদ্য, পিপাসার্তকে পানী এবং নগ্নকে আবরণ দিলেন। যারা মনস্কামনা নিয়ে উপস্থিত হত তাদের মনস্কামনা তিনি পূর্ণ করতেন, কাউকেই তিনি নিরাশ করতেন না। ফলতঃ তিনি বিধাতার কাছে যা কিছু প্রার্থনা করেছেন তাই তিনি প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি তখন বললেন, "বিধাতা আমাকে প্রত্যাশা অনুরূপ অর্থ, দ্রব্য, ধন, বল-পুরুষার্থ এবং কল্যাণী স্ত্রী সবই প্রদান করেছেন।" তিনি যা চেয়েছেন তাই পেয়েছেন, এবং কোনও কিছুই আংশিক পেয়েছেন এমন নয়। তাঁর একটি পুত্রের অভাব ছিলো, বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে তাও তিনি পেলেন।[১৪]

ফলতঃ উক্ত রাজার গৃহে সৃষ্টিকর্তা এক পুত্র অবতরিত করলেন যে ছিলো অত্যধিক সুরূপ যাকে সৃষ্টি করে সৃষ্টিকর্তা ধন্য হলেন অথবা সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ তিনি এহেন পুত্রকে সৃষ্টি করলেন। সে যেন পূর্ণিমার শশধর, তার আবির্ভাবে পৃথিবী আলোকিত হল। রাজা দৃষ্টি ভরে পুত্রকে দেখলেন এবং তার এত আনন্দ হল যে ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায়না। তার ললাট কর্ম-জ্যোতির মণিতে দীপ্ত এবং সে রাজকুমার বত্রিকা শুভ লক্ষণে সম্পন্ন। রাজা শিশুর রাশি গণনা করবার এবং নক্ষত্রের আকৃতি প্রকৃতি দেখবার জন্য পণ্ডিত এবং বুদ্ধিমানগণকে আহ্বান করলেন। রাজা বললেন, "গণনা এবং বিচার করে পঞ্চাঙ্গ দেখে বলুন শিশুর জন্য কোন কোন গ্রহ শুদ্ধ রয়েছে এবং তার লক্ষণ দেখে তার জন্য এক নির্মল নাম রাখুন।"[১৫]

সমস্ত ব্রাহ্মণ বসে গণনা করতে লাগলেন, তাঁরা রাশি গণনা করে বিচার করলেন শিশু ভাগ্যবান হবে কি হবেনা। তাঁরা বললেন, "রাশির অনুসারে এ একদিন রাজা হবে এবং তখন এর সমতুল্য কেউ থাকবেনা।" গণনায় শিশুর তুলা রাশি নির্ধারিত করে তার নামকরণ করে পণ্ডিতগণ তাকে 'রাজকুঅর' বলে আখ্যায়িত করলেন। তারা বললেন, "এর অনেক গ্রহ উত্তম কিন্তু কিছু গ্রহ বিশেষরূপে ক্ষীণ রয়েছে।" আরও গণনা করে তারা পুনর্বার বললেন, এর জীবনে স্ত্রী বিয়োগ-জনিত দুঃখ ভোগ আছে। জ্যোতিষী আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন, তারা অনেক উপঢৌকন পেলেন। তারা বললেন, "হে রাজন, ধন, পরিবার এবং কুটুম্বের সঙ্গে আপনি যুগ-যুগান্তর পর্যন্ত জীবিত থাকুন।"[১৬]

রাজা ধাত্রিগণকে আদেশ দিলেন, "এ-শিশু আমার প্রতীক, একে তোমরা আগ্রহের সঙ্গে পরিচর্যা কর।" ধাত্রীগণ শিশুকে এমত মধুর দুগ্ধ পান করালো যে বৎসরান্তেই

শিশু বোল শুনাতে লাগলো বা কথা বলতে শিখলো। তার পাঁচ বছর বয়স হতেই রাজ পণ্ডিতগণকে ডেকে বললেন, "তোমরা একে গুণবান করো এবং এমন ভাবে অভ্যাস করাবে যাতে সে ধর্মগ্রন্থের বাণী গ্রহণ করতে পারে।" পণ্ডিতগণ তাকে পড়াতে লাগলেন এবং যতপ্রকার গুণ ছিলো তা তার চিত্তের মধ্যে জাগ্রত হল। দশ বৎসর বয়সে সে গুণবান হলো যে পুরাণ আদি গ্রন্থ পাঠ করতে শিখলো। সে হেঙ্গুর বা চৌগান লেখতে শিখলো, লক্ষ্যভেদে সুদক্ষ হলো এবং ক্রমান্বয়ে চতুর নাগর এবং সুজনে পরিণত হল।[১৭]

আখেট তথা মৃগী-দর্শন খণ্ড

সে অত্যধিক বুদ্ধিমান হলো এবং তার খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লো। সকল মানুষ তাকে দেখবার জন্য আসতে লাগলেন। সে আখেটে বা শিকারে দক্ষ হল এবং বন্য জন্তুকে হত্যা করতে শিখলো। এগুলোই হল তার রাত্রিদিনের ব্যসন। একদিন যখন সে শিকারের জন্য বেরিয়েছে সঙ্গে নিয়েছে এক ভৃত্য এবং প্রজাকে। প্রত্যেকের জন্য ছিলো একটি করে প্ররোহণ বা ঘোড়া যাদের পৃষ্ঠদেশে ছিলো স্বর্ণবর্ণের পাখর। এরা সবাই প্ররোহণে আরোহণ করে রাজপুত্রের সঙ্গে যাত্রা করলো যে রাজপুত্র ছিলো রূপবান এবং শুভময়। এরা কুমারের সঙ্গে হর্ষিত হয়ে চললো এবং আখেটে অংশ নিলো। বনখণ্ডে প্রচুর বন্য শ্যাপদ ছিলো তাই শিকারের খেলা ভালোই জমলো।[১৮]

তারা সবাই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হাতে ধনুক বান নিয়ে শিকার লক্ষ্য করতে লাগলো। তদনন্তর রাজকুমার সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। সে এক শ্বাপদ দেখে লক্ষ্যভেদের উদ্দেশ্যে স্থির হয়ে দাঁড়ালো। শ্বাপদটি ছিলো সাত বর্ণের একটি মৃগী, এত অপরূপ প্রাণী সে আর জীবনে দেখেনি। সে বলতে লাগলো "কোনও ভাবেই এটি মৃগী হতে পারেনা কেননা এ বিচিত্র আভরণ পরিধান করে আছে"। আচম্বিতে একে দেখে রাজকুমার স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলো, এখন ঘোড়া তাড়াতে লাগলো। মনে মনে বললো, "বাণ চালিয়ে একে কেন হত্যা করবো? ঘোড়া থেকে নেমে একে বলপূর্বক ধরতে চেষ্টা করবো।[১৯]"

সে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে মৃগীকে ধরবার চেষ্টা করলো। মৃগীর অপরূপ কান্তি দেখে তার চিত্তে প্রেম জাগলো। সে মনে মনে বলবো, নিকটে গিয়ে একে ধরবোনিকর হোই ধরৌ, আর যদি হাতের স্পর্শ না পাই তা হলে মৃত্যুকেও স্বীকার করবো। এখন একটু এগিয়েই একে ধরতে হবে। এতো বেশ নিকটে এসে গিয়েছে। কিন্তু মৃগী উছল দ্রুততায় পালিয়ে গেল। রাজকুমার হাত মলতে লাগলো এবং পছতাতে (পছিতাই) লাগলো। মৃগী তা উপর যাদু করে পালিয়ে গিয়েছে। সে ঘোড়ার উপর উঠে মৃগীর সন্ধানে ছুটলো, কেসর বর্ণের মৃগীকে আবার দেখা গেল কিন্তু আবার সে হারিয়ে গেল। এভাবে মৃগীর পিছে পিছে সে সাত যোজন পথ অতিক্রম করলো। কুমার সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো, যদিও সঙ্গীরা ভাবছিলো যে সে শিকার খোঁজায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে।[২০]

রাজকুমার মৃগীর সন্ধানে একাকী চলছিলো, অপর কোনও ব্যক্তি সেখানে ছিলোনা। মৃগীর প্রেমে লুব্ধ হয়ে সে তার বুদ্ধি বিস্মৃত হয়েছিলো, তার শরীররে চেতনা নষ্ট হচ্ছিলো। এক প্রসন্ন বৃহৎ হরিৎ বৃক্ষ তার চোখে পড়লো, তার নীচে মান-সরোবরের জল প্রবাহিত হচ্ছিলো। কুমারকে অত্যধিক নিকট দেখে মৃগী ভয় পেয়ে মান-সরোবরে ঝাঁপিয়ে পড়লো। মৃগী সেই জলতলে লুকিয়ে গেল, আর বেরিয়ে এলোনা। কুমার বৃক্ষ-শাখায় ঘোড়া বেঁধে শরীরের আবরণ উন্মোচন করে শীঘ্রতার সঙ্গে সরোবরে প্রবিষ্ট হয়ে দৃষ্টির সাহায্যে মৃগীর অন্বেষণ করতে লাগলো।[২১]

রাজকুমার সন্ধান করতে লাগলো, কিন্তু সন্ধান পেলোনা। অতঃপর তার মনে অন্য যা কিছু ছিলো সবই সে বিস্মৃত হল। সে সংকল্প করলো, "যতক্ষণ মৃগীকে না পাব ততক্ষণ আমি মরবোনা এবং আমার জীবন মৃগীর জীবনের সঙ্গেই সংযুক্ত রাখবো।" তার চেতনা রইলোনা এবং বুদ্ধি লুপ্ত হল। কেননা তার চিত্তে প্রেম-কথা জাগ্রত হয়েছে। তার চিত্তে মৃগীর যে চিত্র লিখিত হয়েছে তা যেন প্রস্তরে খোদিত লিপি। ক্ষণে ক্ষণে প্রেম তার চিত্তে অধিকাধিক প্রগাঢ় হতে লাগলো এবং সে দ্বিতীয়ায় চন্দ্রমার মতো ক্ষীণকায় হল। অনেক সন্ধান করেও যখন সে মৃগীকে পেলনা, তখন সে সরোবর থেকে বেরিয়ে এসে তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে পড়লো। তার চোখ থেকে অশ্রুবিন্দু ঝড়ে পড়তে লাগলো এবং তার শরীরে কোনও বোধশক্তি রইলোনা।[২২]

যে প্রেমে আপনজনকে দেখা গিয়েছিলো, সে প্রেমে বিহ্বল রাজকুমার তারই পথের দিকে দৃষ্টি ফেলে দাঁড়িয়েছিলো লাঠির সাহায্যে কোমরে ভর দিয়ে। যেভাবে ভাদ্রের বর্ষণ আধিক্যের সঙ্গে হয়, সেভাবেই তার নেত্রের জলে সমস্ত জগৎ আপূরিত হয়েছিলো। সলিলাশয় আকাশ থেকে নামছিলো কখনও লঘু কখনও দীর্ঘ। যে প্রকারে বর্ষার বর্ষণ ঘটে সে প্রকারে তার নেত্র থেকে ক্ষণ প্রতিক্ষণ অধিকাধিক অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিলো। সে বলেছিলো, "হে বিধাতা, আমাকে পাখা দাও যেন আমি উড়ে যেতে পারি, এবং আমার কানে যখনই তার অবস্থানের শব্দ শুনবো সে অবস্থানে আমি তৎক্ষণাৎ উড়ে যাব।" কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে সন্তপ্ত হৃদয়ে সে কোনও প্রকার বিচার করতে পারছিলোনা। মানুষ, কুটুম্ব, গৃহ-সংসার সবই সে বিস্মৃত হয়েছিলো।[২৩]

যেখানে তার সঙ্গী-সাথীরা মৃগয়া দেখছিলো, সেখানে তারা রাজকুমারকে দেখলোনা। তারা একে অন্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করলো, একজন বললো, "তাকে সাত যোজন পথে দেখা গিয়েছে। রাজকুমার এক মৃগীর পিছে পিছে গিয়েছে। চল আমরাও যাই, তার যদি ভুল হয়ে থাকে অর্থাৎ পথভ্রান্তি ঘটে থাকে।" তারা সকলেই সমূহ সকল ব্যক্তি রাজকুমারের সন্ধানে চললো, কোথায় যে রাজকুমার কেউ জানেনা। চলতে চলতে তারা অত্যধিক সবুজ এক বৃক্ষ দেখলো যার নীচে মান-সরোবরের জল পরিপূর্ণ ছিলো। স্বর্ণ-পাষাণে তার ঘাট বাঁধানো ছিলো এবং তা ছিলো বহুবিধ রত্ন খচিত। এ-মান-সরোবর দেখলে পাপ খণ্ডিত হয়, সুতরাং কে এখানে একবার এসে আবর্তন করে সংসারে ফিরে যাবে?[২৪]

সে সরোবরের জল ঝলমল করছিলো এবং তা ছিলো অত্যধিক নির্মল। যে একবার তা পান করবে তার আর দুঃখ থাকবে না। তাতে ছিলো বীরণ বা খসের সুগন্ধ এবং তা ছিলো সুমিষ্ট এবং অমৃততুল্য যা সংসারে কোথাও দেখা যায়না। জল ছিলো শীতল ও শ্বেত বর্ণের, তার কর্দম ছিলো কর্পূর। এ অনুপম সরাবরের কথা শ্রবণ কর। কমল প্রস্ফুটিত ছিলো সেখানে যার উপর প্রেম-গৃহীত ভ্রমর লুব্ধ হয়ে বসেছিলো। সুহাবনী কুমুদিনী পরিপূর্ণ রূপে জেগেছিলো যার সঙ্গে চন্দ্রমা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপন করেছিলো। চকোর চকোরী এবং হংস কেলি করছিলো এবং এ-দৃশ্য ছিলো নয়ন রঞ্জন। তীরে যে অপূর্ব বৃক্ষ শোভা পাচ্ছিলো, কোন্ ভাগ্যবান তা বপন করেছিলো?[২৫]

সেখানে এক কদলিবৃক্ষ পাতা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছিলো, অমৃত সিঞ্চনের কারণে সে সম্ভারযুক্ত ছিলো। তার পাতা ছিলো সবুজ এবং সে ছিলো নবীন এবং কোমল—আদর্শিকার মতো স্বচ্ছ। রাজ কুমারের মাথার উপর সে ছিলো ডম্বর বা ছত্রের মতো, অনুরক্তের দল রাজকুমারকে কদলিবৃক্ষের নীচে আসীন দেখতে পেল। ঘোড়া থেকে নেমে সকলে তার নিকটে এসে আভূমি নমস্কার করলো। নিকটে এসে বসে জিজ্ঞেস করলো,"হে কুমার তোমার রক্ত বর্ণ কি করে শ্যামল হল? তোমার দশা কমলের মতো যা নিত্য দিবসে বিকসিত হয় এবং নিশাকালে মৃগাঙ্ক উদিত হলে মলিন হয়।" কিন্তু রাজকুমার কাঁদতেই লাগলো এবং চেতনায় রইলোনা, যেভাবে সর্বস্বহারা হলে দরিদ্র যেমন হয়।

প্রেমে গৃহীত হয়ে 'পেম গহি লীতা'—সে উত্তর দিতে পারছিলোনা, স্নেহের প্রতি সে এতটা লুব্ধ হয়েছিলো যে কানে সে কিছুই শুনছিলোনা। তখন তার অনুরক্ত দল বললো, "আমাদের আদেশ কর। যা তুমি ভাবছো তা' আমরা পূরণ করি।" সে বললো, "সপ্ত বর্ণের এক মৃগী আমার দৃষ্টির সামনে পড়েছিলো। তার সঙ্গে সৌন্দর্যের আমি কি বর্ণনা করবো? তার গলায় ছিলো হার এবং ললাটে ছিলো গজমুক্তা অর্থাৎ হারের মতো উজ্জ্বল রেখা এবং গজমুক্তাসদৃশ ললাট। তার নূপুরের ঘুঙ্ঘুরা এত সুন্দর ছিলো যে ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। চঞ্চলতা চপলতার সঙ্গে এমন ভাবে সে চলছিলো যেন ক্ষণমাত্র সে উড়ে যাবে। তাকে দেখতে না দেখতেই এবং বর্ণনা করবার সুযোগ না পেতেই সে বিলীন হয়ে গেল।"[২৭]

"মৃগী সম্পূর্ণ শৃঙ্গার করে এবং বহুবিধ স্নেহ জাগরিত করে রূপাভিব্যক্তির সাহায্যে চলে গেল। তার শরীরে বারো আভরণের সম্ভার ছিলো এবং সে অত্যধিক সুরূপা এবং যৌবনবতী ছিলো। দেখতে না দেখতেই সে অন্তর্ধান করলো, জানিনা তার কি হয়েছে।" সঙ্গীরা বললো, "এটি এমন একটি ঘটনা যে ভাষায় ধরা যায়না। সম্ভবতঃ সে ছিলো ইন্দ্রের অপ্সরা। চল, আমরা মৃগয়া করতে করতে ঘরে ফিরে যাই। তোমার অবর্তমানে তোমার পিতা জীবিত থাকতে পারবেননা।" "তোমাদের কথা মেনে নিতে পারছিনা কেননা এ-শরীরে জীবন নেই। জীবনতো মৃগী নিয়ে গিয়েছে, তোমরা শুধু জীবনহীন কায়া দেখছো এবং আমার নেত্র তারই পথের দিকে তাকিয়ে আছে।"[২৮]

রাজকুমারের কথায় তাদের মনে চিন্তা জাগলো। নিজেদের মধ্যে তারা আলোচনা করতে লাগলো, "কুমারকে ছেড়ে আমরা কোথায় যাব?" তারা কুমারকে পুনর্বার বুঝাতে লাগলো কিন্তু প্রেমে গৃহীত তার চিন্তা বিচলিত হলনা। সে বললো, "যদি তোমরা আমাকে চাও, তা হলে কাপড় খুলে সরোবরে নেমে মৃগীর সন্ধান কর।" তারা সরোবরে নেমে সন্ধান করে ফিরে এসে জানালো যে সেখানে কিছুই নেই। সকলে মিলে কুমারের কাছে বসে অনেক করে বুঝালো কিন্তু প্রেমলুব্ধ কুমার কিছুতেই প্রবোধ মানছিলোনা এবং বারবার দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো।[২৯]

রাজকুমার বললো, "তোমাদের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কেননা তোমরাই বল, জীবন-বিহীন অবস্থায় অথবা জীবনকে ফেলে রেখে আমি কি করে চলবো?" সে ক্রন্দন করছিলো, এবং তার নেত্র সলিলে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছিলো। তাকে দেখে সবার করুণা জাগছিলো। সে বললো, "যতক্ষণ তার সমাচার না পাব, এখানে অবস্থান করেই মৃত্যু বরণ করবো কিন্তু চিত্তকে বিচলিত করবোনা।" বন্ধুরা নিজেদের মধ্যে বললো, এখন কি করা যায়? রাজার কাছে দূত প্রেরণ করি। পত্রিকা লিখে তাকে দিই এবং এখানকার সকল কথাই তাকে লিখে জানাই। দূত বেগে পথ অতিক্রম করে রাজার দরবারে এসে উপস্থিত হল এবং সকল বার্তা জ্ঞাপন করলো। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'সে কোথায় কোন স্থানে রয়েছে?' দূত বললো, "এখান থেকে সাত যোজন দূরে।"[৩০]

মন্দির নির্মাণ খন্ড

এ-কথা শুনে রাজার দুঃখ হল এবং সুখ অন্তর্হিত হল। রাজা দ্রুত ঘোড়া আনতে বললেন। নগরের যতদূর পর্যন্ত মনুষ্য ছিলো সকলেই চলতে লাগলো, একজনও নগরে রইলো না। রাজা এবং রাণী ঘোড়ায় চড়ে এক প্রহরের মধ্যেই পৌঁছে গেলেন। এ-দেখে রাজা চমকিত হলেন যে কুমারের মুখমণ্ডল মলিন হয়েছে যেন চন্দ্রে গ্রহণ লেগেছে। তার মূর্তি দেখে ছায়ার ভ্রম হল অর্থাৎ মূর্তি ছিলো ছায়ার মতো এবং তার কায়া বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিলো। রাজা বললেন, "তুমি বল, কি দেখেছ এবং কেমন দেখেছ যা তোমার চিত্ত অধিকার করে রয়েছে এবং সরে যাচ্ছেনা।" কুমার অত্যধিক ক্রন্দন করছিলো, কথা বলতে পারছিলোনা এবং স্মরণ করে করে তার দুঃখ হচ্ছিলো।[৩১]

রাজা বললেন, "আমাকে বল তুমি কি দেখেছ এবং তোমার চিত্ত কার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে?" রাজকুমার বললো, "আমি যা দেখেছি তা বলতে পারছিনা এবং এটাই আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আমি এক বিশিষ্ট মৃগী দেখেছি যে-ধরনের মৃগীর কথা পূর্বে কখনও শুনিনি। অতঃপর আমি কি বলব? সে আমার জীবন নিয়ে গিয়েছে এবং আমার কায়া বিভ্রমে এখানে পড়ে রয়েছে। অন্নও রোচেনা, পানিও পান করতে পারিনা। সে-পথের প্রতি আমার দৃষ্টি পতিত রয়েছে যে-পথ দিয়ে ভাগ্যশালিনী গিয়েছিলো। আমি সেভাবেই দেখছি যেভাবেই দেখছি যেভাবে স্বাতীর জল সাগরের ঝিনুকের মোতী দেখতে থাকে।"[৩২]

রাজা বললেন, "আমার কথা শুন, এ-সব ব্যাপারে তোমার বুদ্ধি অনেক কম। মৃগী পানীতে লুপ্ত হয়েছে, এটা কি এখানে এসে তুমি স্বপ্নে দেখেছ না প্রত্যক্ষ ? উঠে আমার সঙ্গে গৃহে চল, না হলে আমি তোমার সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবো।" কুমার উত্তরে বললো, "যা কিছু তুমি বললে, আমি মানতে প্রস্তুত আছি, তুমি যা কিছু বলবে আমি প্রমাণ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু আমি না থাকলে তোমার রাজ্যের কিছু ক্ষতি হবেনা। তুমি সংসারের রাজা এবং আমার শিরোদেশে তোমার ছায়া রয়েছে। তুমি অত্যধিক বুদ্ধিমান এবং সমস্ত গুণাবলীই তোমার জানা। তোমার মতো পিতা দ্বিতীয় নেই। আমি এমন উপকার তোমার কাছে চাই যাতে আমার ঘটে বা শরীরে প্রাণ থাকে।"[৩৩]

রাজকুমার বললো, "তুমি শ্রবণ কর। আমি তোমার কাছে স্বীকৃতি চাই যে তুমি এ মান-সরোবরে একটি মন্দির উঠাবে। এমনভাবে এ-মন্দির তুলতে হবে যাতে এর অভ্যন্তরে মান-সরোবরের জল প্রবেশ করতে পারে।" রাজা ভৃত্যদেরে ডেকে বললেন, এক অপূর্ব ভবন নির্মাণ কর, এটাই কুমারের রাজাদেশ। কুমার যা আদেশ করে পালন করতে বিলম্ব কোরনা। ভৃত্যরা বললো, "যতদূর আমরা পারি তোমার আদেশ প্রমাণিত করবো।" তদনন্তর রাজা আজ্ঞাপত্র লিখলেন এবং দেশব্যাপী তা প্রচারিত হল। "বালক এবং বৃদ্ধ সকলেই এ-আদেশ মানবে, কেউ পশ্চাদপদ হবেনা।" এ-আদেশ দিয়ে এবং ভৃত্যদেরে কাজ সম্পন্ন করার চিন্তায় রেখে রাজা নগরের পথে চললেন।[৩৪]

তিনি দেশের মানুষের কাছে পত্রিকা পাঠালেন, "দ্রুতবেগে আগমন কর, রাত অস্ত হবার জন্য অপেক্ষা কোরনা।" যতদূর পর্যন্ত বালক এবং বৃদ্ধ ছিলো শীঘ্র চলে এলো, গৃহে কেউ রইলোনা। স্থপতি, কাঠমিস্ত্রী এবং লোহারু এলো, পথেরে বা ইট স্থাপনকারী এলো, চুনহারু বা চুনা প্রস্তুতকারী এলো। স্বর্ণকার এলো সোনার পানি ঢালবার জন্য। চতুর চিত্রকর এলো যে ছিলো অত্যন্ত কৌশলী। করবতিয়া বা করাত চালাবার লোক এলো, কুন্দীগর এলো। এরা সবাই এলো যেন অট্টালিকা নির্মাণে বিলম্ব না হয়। সৌত্রিকগণ ভিত্তি খনন করলো যার উপর সুন্দর মন্দির উঠতে লাগলো। সকলেই পংক্তিতে পংক্তিতে বসে আপন আপন কার্য সম্পাদন করতে লাগলো।[৩৫]

এক খণ্ডের উপর এক খণ্ড, এভাবে সাত খণ্ড উঠলো এবং অত্যন্ত সুহাবন বা সুদৃশ্য ঝরোখা বা জানালা বানানো হলো। তারা চার রঙ্গের চারটি প্রবেশ দ্বার তৈরী করলো এবং এর ফলে চতুর্দিকেই অট্টালিকা শোভমান হল। তার উপর চৌখণ্ডী তৈরী হল যা ছিলো কনকবর্ণের এবং যার ঢালাই ছিলো হিঙ্গুলের। সেখানে রামের রামায়ণ কাহিনী চিত্রিত হল যেভাবে রামের গৃহিণী সীতা রাবণের হাতে অপহৃত হয়েছিলেন। আরও চিত্রিত হল ষোড়শ সহস্র গোপিকাদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলা এবং লঙ্কায় অঙ্গদের জঙ্ঘারোপণ। স্নেহ-কথা অর্থাৎ প্রেম-কাহিনী সবই পূর্ণতার সঙ্গে অপূর্ব ভাঁতিতে চিত্রিত হল। তা ছাড়া সিংহ, কস্তুরী মৃগ তথা শ্বাপদ শ্রেণীও পংক্তিতে চিত্রিত হল।[৩৬]

চিত্রাবলীর মধ্যে ভীম কর্তৃক কীচক-বধের কাহিনী ছিলো এবং তিনি যে দুঃশাসনের বাহু উৎপাটন করেছিলেন তারও আলেখ্য ছিলো। ভর্তৃহরির আলেখ্য চিত্রিত হয়েছিলো পিঙ্গলার বিয়োগে যখন তিনি যোগীদের সঙ্গ নিয়ে পথ চলছিলেন। আরও চিত্র ছিলো অর্জুনের, তিনি যখন লক্ষ্যভেদ করেছিলেন এবং কৌরবদের পরাজিত করে দ্রৌপদীকে জিতেছিলেন। চিত্র ছিলো জ্ঞানী সহদেবের যিনি, ঋক্, যজু, সাম্ এবং অথর্ববেদকে আয়ত্ত করেছিলেন। যত প্রকার নৃত্য এবং ক্রীড়া-কৌতুক আছে, তারও চিত্রিত নিদর্শন ছিলো। আর চিত্র ছিলো সেই মৃগীর যে তার অর্ধাৎ কুমারের উপকার করেছিলো অথবা প্রেমের শিক্ষা দিয়ে উপকার করেছিলো। এ-চিত্র দেখে দেখে কুমার ক্রন্দন করছিলো কেননা উক্ত মৃগীই ছিলো কুমারের জীবনাধার।[৩৭]

যেহেতু সে তাকে অর্থাৎ মৃগীকে দেখেছিলো সে-কারণে সে তাকে স্মরণ করছিলো। তার জন্য সে রোদন করছিলো। কুমারের কাছে কেউ রইলোনা, একমাত্র এক ধাত্রী রইলো। সেই মোহ-স্নেহে কুমারকে ঘিরে রেখে মাঝে মাঝে তাকে বুঝাবার চেষ্টা করতো। কখনও কুমার ধাত্রীর কথা শুনতো আবার পরক্ষণেই তার চিত্ত চলে যেত যেখানে মৃগীকে পেতে পারে। তার কায়া ছিলো শূন্য কেননা জীবন তার শরীরে ছিলোনা। জীবন ছিলো সেখানে যেখানে সে পীন বা সুডৌল মৃগীকে দেখেছিলো। কাম-বাণে বিদ্ধ হয়ে সে নিজেকে সংবৃত রাখতে পারছিলোনা, অনুক্ষণ সে মৃগীর কথা জপ করতো, ক্ষণকালও সে মৃগীকে ভুলতোনা। রাত্রি এবং দিন উভয় কালেই সে তার চিত্তে দ্বিতীয় কাউকে স্থান দিতনা। তার চিত্ত ছিলো মদমত্ত গজেন্দ্রর মতো যার পৃষ্ঠদেশ থেকে কোন মতেই নামা যায়না।[৩৮]

তার নয়ন থেকে অশ্রু বর্ষিত হচ্ছিলো ভাদ্র মাসের মেঘের মতো, তাতে বন এবং জলাশয় আপূরিত হচ্ছিলো অথবা শূন্য জলাশয় পরিপূরিত হচ্ছিলো। রাত্রি তার কাছে মনে হত অন্ধকারময়ী, সে শয্যাকে উজ্জ্বল করতোনা এবং সারারাত জেগে থাকতো। রাত্রিতে দামিনী তার নেত্রের নীচে অথবা দৃষ্টিতে এসে উপস্থিত হত, তাকে সে ধরবার চেষ্টা করতো, কিন্তু বলতো কি করে তাকে ধরা যায়? ভবন শূন্য ছিলো কেউ তার সঙ্গী-সাথী ছিলোনা কিন্তু ঐ শূন্যতার মধ্যেও দাদুর তার সঙ্গে ছিলো যে ডাকছিলো। জলের জন্য চাতক পী-পী শব্দ করে উঠছিলো যাতে কুমার বিয়োগ-বাণে বিদ্ধ হচ্ছিলো এবং আত্ম-সংবরণ করতে পারছিলোনা। সে বলে উঠলো, "আমার উভয় নেত্রে বর্ষা উপস্থিত হয়েছে যার বর্ষণ বিপুল এবং গম্ভীর। নেত্র-সলিলে আমি ডুবে যাচ্ছি। এখন একমাত্র দৈবই আমাকে তটপ্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে।"[৩৯]

মাঘ মাসের তুষার তার শরীরকে স্পর্শ করছিলোনা, কেননা বিরহের অগ্নিদহনে সে ভস্মে পরিণত হয়েছিলো। সমগ্র রাত্রি রাজকুমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর্তরোল তুলছিলো, না তার নেত্র-পল্লব বন্ধ হচ্ছিলো, না জিহ্বা ক্লান্ত হচ্ছিলো। তার শরীর থেকে কামাগ্নি উৎপন্ন হচ্ছিলো, সুতরাং তুষারের এমন কি যোগ্যতা যে তার মুখোমুখী হয়। তুষার

বিশ এক ক্রোশ দূর পালিয়ে যাচ্ছিলো কেননা তার পাশে দাঁড়ালে সে শেষ হয়ে যেত। বিরহের অগ্নি এমনই প্রজ্বলিত হয়েছিলো যে শীত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো এবং পৃথিবী বসন্তের সবুজে যেন ভরে গিয়েছিলো। রাবণের লঙ্কার অগ্নিদহনতো নিভেছিলো, কিন্তু এ-অগ্নি কিছুতেই নিভছিলোনা। তার কারণ হল, একমাত্র মিলনেই এ-অগ্নি নিভতে পারে।[৪০]

জ্যৈষ্ঠ মাসের তপ্ততা যেন অঙ্গার বর্ষণ করছিলো, কিন্তু রাজকুমার দেহে চন্দনপ্রলেপ দিচ্ছিলোনা। প্রাণ ফিরে পাবার জন্য শীতল পানীয়ও সে সেবন করছিলোনা। তার নয়ন থেকে প্রচুর অশ্রুপাত হচ্ছিলো। কিন্তু যার শরীরে স্নেহ বা প্রেম জাগে তার না শীত অনুভব হয় না গ্রীষ্ম। শিশির এবং উষ্ণতার অনুভব তখনই সম্ভব যখন শরীরে জীবন থাকে। তার জীবন নিয়েতো মৃগী চলে গিয়েছে কিন্তু এ-কথা সে কাকে বলবে যে তার কায়ায় প্রাণ নেই। এ প্রকারে বারো মাস এবং ছয় ঋতু পরস্পর এসে সমাপ্ত হয়ে গেল।[৪১]

মৃগাবতী-দর্শন খণ্ড

সরোবরের তীরে সে এক বছর পর্যন্ত রইলো, এর মধ্যে কেউ এসে মৃগীর সমাচার বললোনা। প্রেমোন্মাদ ব্যক্তির কাছে শিশির এবং হেমন্ত, শরৎ এবং বসন্ত, গ্রীষ্ম এবং উষ্ণ কোন কিছুরই অনুভব ছিলোনা। ছয় ঋতু দেখতে দেখতে পার হয়ে গেল, অনেক কিছু ঘটলো পৃথিবীতে। একদিন যখন সে মৃগীর পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো, একটি চক্রাকার আঁধি উঠলো বা ঝড় উঠলো। কুমার দেখতে লাগলো। তার চোখে ত্রাসের সঞ্চার হলো। সে দর্শন পেল ইন্দ্রের অপ্সরাদের। এদের দেখে সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেল। কিন্তু পুনরায় সুস্থির হয়ে উঠে পড়লো। তারা সবাই হর্ষিত হচ্ছিলো এবং সরোবরে খেলা করছিলো।[৪২]

অপ্সরাগণ ছিলো সাতজন রমণী এবং সাতজনই ছিলো অত্যধিক লাবণ্যপূর্ণ যেন চতুর্দশীর সম্পূর্ণ চন্দ্রমা উদিত হয়েছে। এরা সাতজনই ছিলো একই পিতার সন্তান এবং এদের গাত্রাবরণ একই রকম ছিলো, তাদের বয়স কত বলা যাচ্ছিলোনা। এদের মধ্যে আবার একজন ছিলো অতি অপূর্ব, তার কি বর্ণনা আমি করবো ? তার কথা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। যেন আকাশে চাঁদ প্রকাশিত হয়েছে এবং অন্য সবাই ছিলো যেন চাঁদের চতুর্দিকে প্রকাশিত নক্ষত্র। আকুল রাজকুমারকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন তার শরীরের উজ্জ্বল বর্ণ কালিমালিপ্ত হয়েছে। সম্প্রত্যঙ্গের স্বভাবে মনে হচ্ছিলো যেন যথার্থ স্থানেই শর বিদ্ধ হয়েছে অর্থাৎ বিশিষ্ট সুন্দরীকে দেখে রাজকুমার কামশরে বিদ্ধ হয়েছে। কুমারের গ্রহ-দশা কোনও প্রকারেই দূর হচ্ছিলোনা।[৪৩]

সখীরা এক সঙ্গে খেলা করছিলো এবং মন্দির দেখে আশ্চর্যচকিত হচ্ছিলো। এদের মধ্যে একজন বুদ্ধিমতী ছিলো সে শঙ্কিত হয়ে এ-কথা বললো, "বৎসরের একটি দিনে আমরা এখানে আসি কিন্তু মনুষ্যের ছায়াতো কখনও পাইনা। গত বর্ষের এই দিনে

এখানেতো কিছু ছিলোনা, এরই মধ্যে এখানে কি প্রপঞ্চ ঘটলো ? সজাগ হও এবং ছেলে-মানুষী বা পাগলামী ছাড়ো। যদি কোনও অঘটন ঘটে তা হলে কি করা যাবে। অবস্থানটি বুঝবার চেষ্টা করো এবং আমার সঙ্গে সঙ্গে চলো। যদি কিছু ঘটে তা'হলে কি করবে ? কোনও কিছুতেই হাত যেন না লাগে।"[৪৪]

তারকাদের মধ্যে যে ছিলো চাঁদ সে সকলকে একটি কথা বললো, "মনুষ্য আমাদের কি করে পাবে অথবা কি করতে পারে ? আমরা ইচ্ছে করলে মন যেখানে চায় সেখানে উড়ে চলে যেতে পারি। মানুষ তা কখনও পারেনা যদিও স্বভাবে পৃথিবীতে মানুষই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উত্তম জাতি। কিন্তু এ-চরিত্র একমাত্র আমাদেরই আয়ত্তে যে এক মুহূর্তে আমরা বিলীন হয়ে যেতে পারি, অন্য মুহূর্তে উড়ে এসে দেখা দিতে পারি। যে বেশ ইচ্ছা সেই বেশ আমরা ধারণ করতে পারি। মানুষ চাইলেই কি আমাদের দেখা পায় ? আমরা এমন বর-প্রাপ্ত হয়েছি যে ইচ্ছে করলেই লুপ্ত হতে পারি। স্বর্গপ্রান্তে আমাদের বিমান রাখা আছে। আমরা ইচ্ছে করলেই উড়ে যেতে পারি।"[৪৫]

এ-কথা বলে সকলেই সরোবরের বাইরে এলো, এবং আপন চীর বা কাপড় সংগ্রহ করে পরিধান করতে লাগলো। রাজকুমার তাদের দেখতে লাগলো, তারা চীর পরিধান করে সীমন্ত ঢাকছিলো। সব ক'জন রমণীই ছিলো কমল-বদন, রূপ থেকে সুরূপা এবং অশেষ ভাগ্যবতী। এদের মধ্যে অমৃতের চেয়ে শীতল মুখ যার ছিলো তাকে দেখে রাজ কুমারের চেতনা রইলোনা। যার স্নেহ বা প্রেম তাকে অত্যধিক আচ্ছন্ন করেছিলো তাকে সে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। রাজকুমার দৌড়ে সেখানে যেতে লাগলো যেখানে এরা ছিলো, এবং ভাবলো, "আমি তার পা ধরে সেখানে মাথা কুটবো।" কিন্তু রাজকুমারকে দেখে তারা সবাই উড়ে গেল।[৪৬]

ততক্ষণ পর্যন্ত সে অপ্সরাকে দেখছিলো যতক্ষণ তার চৈতন্য ছিলো, অবশেষে চৈতন্য রহিত হয়ে লুটিয়ে পড়লো। তার ভ্রূ ছিলো ধনুকের গুণ-সদৃশ এবং দৃষ্টি ছিলো বিষাক্ত। সে চতুরা সহজ ভাবেই কটাক্ষে তাকে আহত করেছিলো। রাজকুমারের অধরে প্রত্যক্ষভাবেই এর চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছিলো যা তার হৃদয়ের মধ্যে ছিল শল্যাঘাতস্বরূপ অর্থাৎ তার অধর মলিন এবং বিশুষ্ক ছিলো। তার দৃষ্টিবান ব্যর্থ হবার ছিলোনা যেন কোনও ব্যাধ রোষে ধনুকে টান দিয়েছে। তার চক্ষুর বাণ যথার্থই ব্যর্থ হয়নি, কেননা রাজকুমার আহত হয়েছিলো এবং সে তা উৎপাটন করতে পারছিলোনা। যেভাবে শিকারী তার শিকারকে আহত করে চলে যায় সেভাবেই অপ্সরী রাজকুমারকে অর্ধমৃত ফেলে রেখে চলে গেল।[৪৭]

মৃগাবতী-শৃঙ্গার বর্ণন খণ্ড

তার সঙ্গী ছিলোনা, সাত্রী এবং মিত্র কেউ ছিলোনা যে এ-সব সমাচার তার পিতাকে পৌঁছে দেবে। সে-স্থানে উপযুক্ত কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিও ছিলোনা যে পানি এনে সিঞ্চন

করবে অর্থাৎ রাজপুত্রকে সান্ত্বনা দেবে। কে তাকে ভূমিশয্যা থেকে উঠিয়ে রসাল বার্তা এবং প্রেম কথা শুনাবে ? তার ধাত্রী এসে দেখলো, তার মুখ বিহ্বল এবং শরীরে শ্বাস নেই। অমৃতে সিক্ত করে সে তার চৈতন্য ফিরিয়ে আনলো এবং জিজ্ঞেস করলো, "কি দেখে তুমি অস্থির হয়েছ। সে কি স্বপ্ন, না সম্প্রত্যক্ষ, না কোনও ছলনা ? রোগী বৈদ্যকে অসুখের কথা বললেইতো ঔষধি আনা যায়।"[৪৮]

রাজকুমার বললো, "তুমি আমার ধাত্রী নও, তুমি আমার মাতা। তুমি ছাড়া আর কার মনে আমার প্রতি করুণা হবে ? আমি যা দেখেছি তা ভাষায় বলা যায়না, তাই চিত্তের চিন্তায় মন ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হচ্ছে। সাতজন অপ্সরা এসেছিলো তার মধ্যে একজন ছিলো একাদশ সহস্র কলার লক্ষণাক্রান্ত। তার রূপের কথা আমি তোমাকে বলছি। তুমি প্রশ্রয় দিলে আমি চেতনায় এসে সব কথা তোমাকে বলতে পারি। সে-সময় ভানু উদয়াচলে জাগলো কিন্তু আমি সময় পেয়েও তার শিরোদেশ থেকে পা পর্যন্ত বিস্তারিত পরিচয় পেলাম না। তবুও তার রূপ বিদ্যুৎ-বিভার মতো উদ্ভাসিত হয়ে আমাকে অচেতন করেছিলো এবং আমি যতটুকু দেখেছি তার সিঁথি, পয়োধর, কর এবং পা এ-গুলোর শৃঙ্গার একে একে বর্ণনা করছি।"[৪৯]

"সে তার হাত দিয়ে তার কেশগুচ্ছ সংযত করে রেখেছিলো, তার সিঁথি আমি দেখেছি যা ছিলো অত্যধিক প্রাণঘাতিকা। তা ছিলো শ্বেতচন্দন-লিপ্ত অথবা বলা যায় সেখানে মুক্তার এক পংক্তি সাজানো রয়েছে যেন। সে-সুহাবনী পংক্তি যেন ঘন কালো বাদলের মধ্য থেকে জেগে উঠেছে। তার সিঁথির জ্যোতির প্রকাশ এমন ছিলো যেন অন্ধকার রাত্রে বিচ্ছুরিত তারা। তার শিরোদেশে সিঁথিটি ছিলো খড়্গের ধারের মতো যার স্পর্শে মানুষ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। সে-খড়্গ আমার মস্তকে পড়ে আমাকে দশ খণ্ড করে ফেললো, আমার হাত, মাথা, পা সব আলাদা হয়ে গেল। তুমি অমৃত সিঞ্চন করে আমাকে জীবন দিয়েছ, তাতেই তো আমি তার ভাব বা সৌন্দর্য বর্ণন করতে পারছি।"[৫০]

"তার চিকুর ছিলো মেঘ-বর্ণের এবং অত্যধিক সুন্দর যার ফাঁদ গলায় পড়ায় নাগ রুষ্ট হয়েছে। যখন সে তার চিকুরকে মুক্ত করছিলো, তখন একটি অপূর্ব চিত্র ফুটে উঠছিলো। বিচূর্ণিত কেশ যখন তার কপোলে এসে পড়ছিলো, মনে হচ্ছিলো যেন কমল নাগিনীর সঙ্গে প্রেম করছে। যেই সে অলকাবলী দেখতো তার মধ্যেই বিষক্রিয়া হতো যার না ছিলো ঔষধি, না ছিলো জড়ি, না ছিলো চিকিৎসক। তার কুঞ্চিত কেশ শিরোদেশ থেকে পা পর্যন্ত নেমেছিলো যেন বিষাক্ত কালো ভুজঙ্গ। সে-বিষ আমার সর্বশরীরে প্রবাহিত হয়ে আমাকে মূর্ছিত করলো। তুমি আমাকে প্রাণ দিয়ে নিরুক্ত বচনে যে প্রশ্ন রেখেছ তারই উত্তর আমি দিচ্ছি।"[৫১]

"তার ললাট ছিলো দ্বিতীয়ার চন্দ্রের মতো দীপ্ত যেন মীন রাশিতে চন্দ্রমা উদিত হয়েছে এবং সকল বিশ্ব তা দেখছে। তাকে দেখতে দেখতে নেত্রের দৃষ্টি সঙ্কুচিত হয়ে আসে, উদীয়মান ভানুতে দৃষ্টি পড়লে যেমন হয়। তার মুখমণ্ডলের প্রস্বেদ-বিন্দুকে

তারকার মতো মনে হয়েছে, যেন চন্দ্র নক্ষত্রকে নিয়ে আকাশে উদিত হয়েছে। তার ললাট এরূপ দীপ্তিমান ছিলো যেন দামিনীর চমকিত মূর্ছনা, সে কারণে দৌড়ে চলতে গিয়ে আমি পড়ে গেলাম। ললাটের জ্যোতির প্রকাশ এমন ছিলো যে আমি চমকিত হলাম এবং আপনাকে সংবরণ করতে পারলামনা। তার ললাট দেখে আমি বিমুগ্ধ হলাম এবং হে ধাত্রীমাতা, আমি বুদ্ধিহারা হলাম। হৃদপিণ্ডের রক্ত তপ্ত হয়ে পানি হয়ে গেল। হে মাতা, এখন এর ঔষধির কথা বল।"[৫২]

"তার ভুরু ছিলো অর্জুনের ধনুকের মতো, যার দিকে ঘুরে দেখতো তার প্রতিই সে বাণ নিক্ষেপ করতো। কালকূটের মতো বিষাক্ত তার বাণ, পঞ্চবাণের মতো দৃষ্টিতে পতিত হতে না হতেই আহত করতো। অথবা এ বাণ কর্ণের বাণের মতো প্রখর এবং তীক্ষ্ণ। মুখ ফিরিয়ে ভুরু-ভঙ্গে যার উপর সে শর নিক্ষেপ করতো, তার জন্য তন্ত্র, মন্ত্র অথবা ঔষধির উপযোগিতা থাকতোনা। আমি যেন মৃগ হয়েছিলাম এবং সে শিকারী, সে বিষাক্ত বাণ নিক্ষেপ করে আমাকে আহত করে গিয়েছে। কামিনীর ভুরুকে কলি-যুগে সংহার-কর্তা পরশুরাম বলে বিবেচনা করতে হবে। হৃদয়ে তার শল্য প্রবেশ করেছে কিন্তু রুধিরও প্রবাহিত হয়নি, আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ছেনা।"[৫৩]

"তার বরুণী-বাণের বর্ণন করছি যে বিষাক্ত বাণ লক্ষ্যগোচর হতে না হতেই শরীর জর্জরিত হয়। লোমকূপের মতো আমার সর্বশরীরে সে-বাণ বিদ্ধ হয়েছে, আমি আপনাকে সংবরণ করতে পারছিনা। শুধু বাণ বিদ্ধ হবার সংবাদটি উচ্চারণ করতে পারছি। আবার তাও পারছিনা। সখন রূপময় এ-বাণ মহাভারত জয় করে মহাবীর কর্ণের শরে রূপান্তরিত হয়েছে। কর্ণ এবং অর্জুনের যুদ্ধের ক্ষেত্রে সে একই সঙ্গে কর্ণ এবং রোরুদ্যমান পার্থ। সহজ অভিব্যক্তিতেও সে-বাণকে কাজল-লিপ্ত মনে হয়। শৃঙ্গার রসের এ-উপকরণ বীর রসের সৃষ্টি করেছে। চতুর্দশ ভুবনের পৃথিবী, সপ্ত দ্বীপ, নব খণ্ড আকাশ তথা পাতাল বরুণী-বাণে বিদ্ধ হয়েছে এবং আমি পাষাণের মতো স্তব্ধ রয়েছি।"[৫৪]

"তার লোচন শ্বেত এবং কিঞ্চিত রক্তবর্ণের যেন কমল-পত্রের উপর ভ্রমর বসে আছে। লোচনের কটাক্ষ ছিলো চপল এবং বিশেষ রূপে লোল, তার লোচন স্থির ছিলোনা যেন কম্পমান গজমুক্তা। বিরহে মত্ত আমি তাকে এমত দেখলাম যেন সমুদ্র তার বিশেষত্ব নিয়ে উচ্ছলিত হয়েছে। উক্ত পদ্মিনী বালিকার চক্ষু ছিলো মদনের দীপক যা সহজভাবেই এমন ঘূর্ণ্যমান ছিলো যেন পবনের আবর্তিত উল্লাস। অথবা তা ছিলো কুরঙ্গিনীর নেত্র-সদৃশ যা আপন স্বার্থ ভুলে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পথ দেখছিলো। তার চক্ষু ছিলো অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, দীপ্ত এবং প্রখর; তাই ক্ষণ-প্রতিক্ষণে তাকে শল্যসদৃশ মনে হচ্ছিলো। হে ধাত্রী, তার চকিত-লোচন অত্যন্ত প্রবল ছিলো তাই তা আমার জন্য কাল হয়েছে।"[৫৫]

তার চক্ষু এবং কর্ণের মধ্যবর্তী স্থানে একটি তিল ছিলো যেন বিধাতা কমল সৃজন করে তার মধ্যে ভুজঙ্গ বা ভ্রমর নির্মাণ করেছেন। মনে হচ্ছে যেন প্রেমে অভিভূত প্রাণী উড়ে যেতে পারছেনা। অথবা বিরহের তিলে রূপান্তরিত হয়ে একই স্থানে স্তব্ধ

হয়ে আছে এবং জগৎকে মোহিত করছে। অথবা সেই তিলে বিবিধ শৃঙ্গার পুঞ্জীভূত হয়েছে এবং সেই কারণে সংসার নিরস হয়েছে অর্থাৎ সংসারের রসের আশ্রয় একমাত্র এই তিল, তার বাইরে রসের কোনো প্রশ্রয় নেই। এই তিল স্বর্ণস্বপ্নের মতো আমার হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছে।[৫৬]

তার শ্রবণ সুডৌল, ক্ষুদ্রও নয়, দীর্ঘও নয়, যেন ঝিনুকের মতো সুসংবদ্ধ। তার কপোল স্পর্শমনির স্বচ্ছতায় উজ্জ্বল। তার নাসিকা দীপ্তবর্ণের এবং সুডৌল। মনে হয় নাসারন্ধ্র যেন স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নের বার্তা ধারণ করেছে। তার নাসিকা হীন নয়, উঁচুও নয়, মুখমণ্ডলের যোগ্যই তার শোভা। তার অধর এত সুন্দর বর্ণের যেন পানে রসসিক্ত হয়েছে। দুগ্ধের নবনীর চেয়ে অধিক কোমল তার অধর, মনে হয় তা যেন অমৃত রসে পরিপূর্ণ। মনে হয় সুরম্য প্রবাল দিয়ে তার অধর নির্মিত হয়েছে। তার মুখের সামনের চারটি দাঁতের জ্যোতি এমন যেন উজ্জ্বল হীরা অথবা সেই দামিনীর মতো যা গভীর রাত্রিতে চমকিত হয়। তার মুখ-গহ্বরের রসনা অত্যন্ত রসযুক্ত, শব্দ উচ্চারণে তার কম্পিত রসনা দর্শকের হৃদয়কে হরণ করে। তার উচ্চারিত বাক্য অত্যন্ত মধুর, তার বাণী কোকিলের মতো। সে যখন হেসে হেসে কথা বলে তখন মনে হয় চতুর্দিকে ফুল ঝরে পড়ছে। তার গ্রীবা অনুপম, তা নৃত্যরত ময়ূরের মতো অথবা অশ্বের গ্রীবার মসৃণতার মতো। তার গ্রীবা দীর্ঘও নয় হালকাও নয় ক্ষুদ্রও নয়। বিধাতা তার শিল্প-কৌশলে এ গ্রীবাকে অতুল সৌন্দর্যে ভূষিত করেছেন। তার গ্রীবায় তিনটি কণ্ঠমালা ছিলো। তার গ্রীবা দেখে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি।[৫৭]

"তার শ্রেষ্ঠ ভুজদয় যেন মৃণাল-তন্তু দিয়ে তৈরী অথবা সুসজ্জিত বৃক্ষ শাখা। তার মণিবন্ধন এমন সুন্দর যা আমি আর কোথাও দেখিনি। মণিবন্ধের অলঙ্কার তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। তার হাতের তালু এতো আরক্তিম যে মনে হয় সৌভাগ্যশালিনী সেখানে মেহেদী লাগিয়েছে। তার করপল্লব ভুজদণ্ড থেকে প্রস্ফুটিত পুষ্পের মতো এবং আঙ্গুলের নখদন্ত অত্যন্ত উজ্জ্বল। তার সৌন্দর্য দেখে আমি ক্রমানুয়ে বিহ্বল হয়েছি এবং দিন-প্রতিদিন সে আমার প্রিয়তমায় পরিণত হয়েছে। তার মসৃণ পৃষ্ঠদেশ শঙ্খের শুভ্রতা নিয়ে উজ্জ্বল। তার পৃষ্ঠদেশ এতো দীপ্ত যে দৃষ্টি প্রতিহত হয়। তার কণ্ঠদেশের সূক্ষ্ম তিনটি রেখা তার শরীরকে মোহনীয়তা দিয়েছে। তার বেণী বিষম ভুজঙ্গ হয়ে কণ্ঠদেশকে বেষ্টন করেছে। সে চতুর এবং বিচক্ষণ এবং তার বেণী তার সমগ্র শরীরকে নিত্য ত্রস্ত করছে।"[৫৮]

"তার কটিদেশ এতো ক্ষীণ যে কারো সঙ্গেই তার তুলনা করা চলেনা। কখনও একে মনে হয় কেশরীর ক্ষীন কটি। তার কটি এমন ক্ষীণ যে অবাক হতে হয়, বাতাসের আন্দোলনে তা ভেঙ্গে পড়েনা। তার কটি দেখে গণ-গন্ধর্ব মনুষ্য এবং মহাদেব বিমোহিত হয়ে যায়।"[৫৯]

সে নারীর পয়োধর কঠিন এবং কঠোর যেন হাতীর কুম্ভস্থল, যেন পত্র রচনা করে তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, তার কুচদ্বয় কমলের মতো উত্থিত হয়েছে এবং তার উপর

কৃষ্ণবর্ণ ভ্রমর যেন বসে রয়েছে। এই তরল এবং তীক্ষ্ণ কুচযুগল যার হৃদয়কে স্পর্শ করবে তার হৃদয় বিচূর্ণ হবে। এই ভয়ে তার নিকটে কেউ যায়না। দেখে দেখে মানুষ মৃত্যুবরণ করে কিন্তু নিকটে যেতে সাহসী হয়না। নয়ন দিয়ে দেখে লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করে কিন্তু প্রাপ্ত হয়না। উক্ত সুভগা কামিনী তার কনক কলসী অনন্ত রসে ভরে রেখেছে। দৃষ্টিতে পতিত তার কুচযুগল স্পর্শ করা যায়না যেন মদোন্মত্ত গজের কুম্ভস্থল।[৬০]

"তার কৃষ্ণবর্ণ রোমাবলী সুসজ্জিত হয়ে রয়েছে। এ রোমাবলীকে কখনও মনে হয় যেন বিরহদগ্ধা কালিন্দী, তার বুকের দুটি কনকশিখরের মধ্যস্থল থেকে রোমাবলী নাভি গহ্বরের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিম্নাভিমুখী হয়েছে এবং সে কারণে তা প্রয়োগতীর্থে পরিণত হয়েছে। তার পেট এতো নবনীত এবং স্বচ্ছ যে ভিতরের অন্ত্র পর্যন্ত যেন দেখা যায়। তার দুটি জঙ্ঘা যেন দুটি কদলী স্তম্ভ। উজ্জ্বলতায় স্বর্ণকান্তি যেন তার মধ্যে সিন্দুর লিপ্ত হয়েছে অথবা মলয়াগিরির চন্দন দিয়ে তৈরী। উক্ত রমণীর মধ্যে ষোড়শ শৃঙ্গার একত্রিত হয়েছে। শিরোদেশ থেকে পদতল পর্যন্ত উক্ত রমণী শুভ লক্ষণাক্রান্ত। তার চরণ দুটি রুদ্ররেখাঙ্কিত।"[৬১]

তার দেহবর্ণ অত্যন্ত উজ্জ্বল। কাঁচা কমলকালিকায় সোনার স্পর্শ দিয়ে বিধাতা তার শরীরকে নির্মাণ করেছেন। পৃথিবীতে যত পুষ্প আছে তার সমস্ত সুগন্ধ তার অঙ্গে। কমলের কথা কি বলবো? সে তার মুখ-লাবণ্যের কথা স্মরণ করে লজ্জিত হয়ে রয়েছে। এই লাবণ্যপূর্ণ পদ্মিনীর গুণের কি বর্ণনা আমি করবো। শরৎ ঋতুতে শশী যেমন উজ্জ্বল ঠিক একই রকম উক্ত রমণী ষোড়শ কলাযুক্ত ঔজ্জ্বল্য দ্বারা নির্মিত। তার দেহকিরণ যখনই আমার নেত্রে পতিত হয়েছে তখনই আমি ব্যাকুল হয়েছি। তার ষোড়শ শৃঙ্গারের বর্ণনা করছি যার মধ্যে চারটি হচ্ছে শ্বেত, চারটি হচ্ছে কৃষ্ণ, চারটি হচ্ছে ক্ষীণ আর চারটি হচ্ছে পরিপুষ্ট। শ্বেত হচ্ছে তার শিথি চক্ষু, সামনের চারটি দাঁত এবং নখ। কৃষ্ণ হচ্ছে তার কুচ-বৃন্ত, কেশ এবং চক্ষু। তার নাক, অধর এবং কটি ক্ষীণ, তার করপল্লব তো আরও ক্ষীণ। তার কপোল, মণিবন্ধ, ভুরু, কুচ এবং কদলীবৃক্ষসদৃশ পদদ্বয় ক্ষীণ নয়।[৬২]

পৃথিবীতে দ্বাদশ প্রকার আভরণের কথা বলা আছে। তার শরীরে এই দ্বাদশ প্রকার অলঙ্কার যা ছিলো তা আমি বর্ণনা করছি। দাক্ষিণাত্যের চীর সম্বরণ করে উক্ত তরুণী যেভাবে শরীর আচ্ছাদন করেছে তাতে তাকে মদনের অপ্সরা বলে মনে হচ্ছিল। স্নান করে সে শিরোদেশে সিন্দুর লাগিয়েছে, মুখে তার তাম্বুল রাগ এবং চক্ষুতে কাজল। কুসুম্ভী বস্ত্র পরিধান করে সে যখন চন্দন পিসছে তখন তাকে দেখে মনে হচ্ছে যেনো বৃন্দাবনে বসন্ত ঋতু মুকুলিত হচ্ছে। শিরোদেশ, কণ্ঠ, হাত, কটি এবং পায়ে সে পাঁচ আভরণ ধারণ করেছে। দর্পণে তারই প্রতিবিম্ব, তার সমতুল্য আর কেউ নয়। সে এমনভাবে চলছিলো যেন সমুদ্র হিল্লোলিত হচ্ছে, তার গতি ছিলো কখনও মরালের মতো, কখনও

গজের মতো। গর্ব করবার আত্যন্তিক কারণ ছিলো, পংক্তি পংক্তিতে সে ছিলো সুরাঙ্গনা এবং মৃগীসদৃশ। যখন আমি তার পদ ধারণ করতে ধাবিত হলাম, সে উড়ে গেল। তার চমকিত উড়ন্ত গতিতে একটি ঝংকার উঠলো এবং আমি মুছিত হয়ে পড়লাম।৬৩

ধাত্রী বললো, "হে রাজপুত্র, হে কুমার, যা ঘটেছে তা ঘটবার অনেক কারণ আছে। কোনও চিন্তা করনা, আমি বুদ্ধি দিচ্ছি, তুমি ভালো করে বুঝবার চেষ্টা কর। এক বুদ্ধিমান এবং গুণী ব্যক্তির কাছ থেকে যা আমি শুনেছিলাম তাই তোমাকে বলছি, তুমি গ্রহণ কর। মৃগাবতী রাণীর ধর্মের উপর আসক্তি আছে, সে-কারণে সে নির্জলা একাদশী করতে এখানে আসে। পুনরায় সে তার পর্বের জন্য যেখানে আসবে সেখানে তুমি লুকিয়ে থাক। তাকে তুমি হস্তগত করতে পারবে যদি তুমি তার পরিধেয় বস্ত্র অপহরণ করতে পার।"৬৪

মৃগাবতী-বন্ধন খণ্ড

ধাত্রীর মন্ত্র রাজকুমারের শ্রবণ এবং চিত্তে জড়িয়ে পড়লো এবং সে সরোবরের তটে একটি কূপ খনন করলো। যখন নির্জলা একাদশী এল, সে সেখানে লুকিয়ে রইলো। মৃগাবতী তার সকল সখীকে আহ্বান করলো, তারা সবাই এলো। সে সখীদের আপন কথা বললো, যত কথা সম্ভব সব কথাই বললো। শুধু একটি কথা সে বলেনি যে রাজ-কুমারের প্রতি সে অনুরক্ত। সে যে অস্থিরতায় শয্যায় শয়ন করতে পারতোনা সে-কথা সখীদের বলেনি। সে শুধু মনে মনে বিধাতার কাছে প্রার্থনা করতো যেন কুমারের চিত্ত তার প্রতি অনুরক্ত হয়। যেমন করে বোবা মিষ্টির রসাস্বাদ করে কিন্তু বলেনা, সেও তেমনি তার গোপন অনুভবের কথা কাউকে বলেনি। সে শুধু বললো, "সকালে স্নান করতে এসো, আমরা নির্জলা একাদশী করবো।" সকল সখী শৃঙ্গার করে তার সঙ্গে এলো, চন্দন ছিটিয়ে অনেক পুষ্প চয়ন করে তারা এলো। তারা সকলেই ছিলো সুন্দরী, সুভগা এবং যৌবনবতী। মধুর শব্দ করে, ক্রীড়া-কৌতুক করে তারা নিমেষ মাত্রে সরোবরের তটে এলো। আপন আপন আভরণ এবং চীর পরিহার করে সকলেই স্নানের জন্য সরোবরে প্রবিষ্ট হল। মনে হল যেন, শশি নক্ষত্র এবং তারাগণ সঙ্গে নিয়ে সরোবরে ক্রীড়া করতে এসেছে।৬৫

চঞ্চল, চপল এবং চতুর নারী সখীদের সঙ্গে মিলে ধমার খেলছিলো। খেলা করছিলো এবং কুমুদিনীকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পানিতে ডুবিয়ে দিচ্ছিলো। হেসে হেসে তারা কমলগুচ্ছ ভেঙ্গে ফেলছিলো। রাজকুমার যেখানে লুকিয়ে ছিলো, সেখান থেকে দেখে সে কমলের মতো উদ্ভাসিত হল যে প্রকার শশীকে দেখে কুমুদ বিকশিত হয় অথবা বর্ষাকালে চন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে চকোর প্রসন্ন হয়। সে মনে মনে বললো, "যার জন্য এত সব ব্যবস্থা আমি নিয়েছি, হে সৃষ্টিকর্তা তুমি তাকে এখানে এনে দিয়েছ।" তার বুক কাঁপছিলো। তার মনে জাগলো, "এখন মৃগাবতীর চীর অপহরণ করতে হবে। যদি এ-চীর আমার হাতে না আসে আমি এ-স্থানেই মৃত্যুবরণ করবো।"৬৬

দৈবকে স্মরণ করে দৌড়ে বেরিয়ে এসে কুমার মৃগাবতীর বস্ত্র অপহরণ করলো। ধাত্রী যে-যুক্তি তাকে শিখিয়ে ছিলো তাই স্মরণ করে সে বস্ত্র হরণ করলো। নারীরা মনুষ্য শব্দ শুনলো, ভাবলো কেউ হয়তো বস্ত্র নিতে এসেছে। সকলেই আপন আপন বস্ত্রের জন্য সরোবর থেকে বেরিয়ে এলো। সকলেই বস্ত্র পেল, কিন্তু মৃগাবতীর ক্ষীরোদকের বস্ত্র কোথাও ছিলোনা। সখীরা বললো, আমরা তো তোমাকে মনুষ্য উপস্থিতি বিষয়ে সাবধান করেছিলাম কিন্তু তুমি বলেছিলে এখানে কেউ নেই। একথা বলে বায়ুবেগে তারা উড়ে চলে গেল।[৬৭]

মৃগাবতী যখন বস্ত্র পেলোনা তখন সে পুনরায় পানিতে নামলো। কুমারকে সরোবরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে এ-বাক্য তার মুখ থেকে নির্গত হল, "হে কুমার, সখীদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তুমি ভালো কাজ করোনি।" কুমার বললো, "আমার একটি কথা শুন। তোমাকে যে আমি প্রত্যাশা করছি, এটা তার দ্বিতীয় বছর। সেদিনের কথা স্মরণ কর যখন তুমি মৃগী হয়ে এসেছিলে এবং আমার চিত্ত অস্থির করে রেখে গিয়েছিলে। সেদিন থেকেই তুমি আমার জীবন। আমার চিত্ত এবং মন তোমার সঙ্গেই মিশে রয়েছে। এ-স্থানে আমার দু-বছর কাটলো এবং এখন তৃতীয় বর্ষের সময় এসেছে। তোমার জন্য অনেক প্রকার দুঃখ আমি সহ্য করেছি। ভাষায় যা বর্ণনা করা যায়না তার চেয়েও অধিক দুঃখ আমি দেখেছি। যদি তুমি কান পেতে শুনতে প্রস্তুত থাক তা'হলে আমি আমার দুঃখের কথা বলবো। হৃদয়ে যখন পীড়া তখন কি করে আমি আত্মসংবরণ করি? যখন তুমি মৃগীর ছায়া আমাকে দেখালে এবং ফাঁদে ফেলে আমাকে এখানে নিয়ে এলে কিন্তু নিজে সরোবরের মধ্যে বিলীন হয়ে গেলে, আমি তখন মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলাম। আমি আচ্ছন্ন অবস্থায় আমার হাত পা এবং শিরোদেশ বাঁচাবার চেষ্টা করিনি, এবং অপার দুঃখ আমাকে আক্রমণ করলো। পিতা এসে আমাকে অনেক বুঝালেন কিন্তু তোমার জন্য আমি তার সঙ্গে গেলাম না। আমি মন্দির তুলে এখানে অপেক্ষা করতে থাকলাম যদি তোমাকে ধরতে পারি।"[৬৮]

"দ্বিতীয় বৎসর এলো। তুমি তখন সখীদের নিয়ে এলে সরোবরের তটে। তুমি দেখলে, আমি দৌড়ে এসে তোমার পায়ের কাছে আসবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তুমি বিলীন হয়ে গেলে এবং আমি ভূ-পৃষ্ঠে মূর্ছিত হয়ে পড়লাম। আমার ধাত্রী আমাকে অমৃত সিক্ত করে জীবন দিলো এবং আমি তোমাকে প্রাপ্ত হবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু নিয়ে জীবন ধারণ করে রইলাম। তোমার বিয়োগে আমি পরিমল, ফুল এবং তাম্বুল বিস্মৃত হলাম এবং মাতা-পিতা, কুটুম্ব এবং সংসারও বিস্মৃত হলাম। সেদিন থেকে আমি অন্ন গ্রহণ করিনি এবং ওষ্ঠে পানের চিহ্ন মলিন হয়েছে। আরও অনেক দুঃখ আছে তাও বলা হল বলে ধরে নাও।"[৬৯]

মৃগাবতী বললো, "হে রাজকুমার শ্রবণ কর। আমি তোমার জন্যই মৃগীর ছায়া ধারণ করেছিলাম। দ্বিতীয় বর্ষে তোমার জন্যই আমি এসেছিলাম, সখী এবং সহেলীদের সঙ্গে

এনেছিলাম। পুনরায় এবার একাদশীর ছলনা করে এসেছি, ক্রতই এসেছি, বেশী সময় নেইনি। তাহলে কেন তুমি আমার বস্ত্র লুকিয়েছ এবং সখীদের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটিয়েছ ? তুমি আমার চীর প্রত্যর্পণ কর। আমি আদেশ করছি, চতুরতা ছেড়ে দাও।" কুমার বললো, "আমি তোমার বস্ত্র ফিরিয়ে দিতে পারিনা। সব কথা আমি ধাত্রীর কাছে শুনেছি। আমি আমার তনু, মন এবং জীবন তোমাকে অর্পণ করছি। তোমার বস্ত্রের পরিবর্তে অন্য অনেক বস্ত্র আমি তোমাকে দেবো।"[৭০]

মৃগাবতী বললো, "তুমি আমার বস্ত্র কেন দেবেনা ? অন্য কোনও বস্ত্র আমি পরিধান করতে পারিনা।" রাজকুমার বললো, "তোমার বস্ত্রের চেয়েও উত্তম বস্ত্র, আমার আপন ক্ষীরোদক বস্ত্র তোমাকে এনে দিচ্ছি।" মৃগাবতী বললো, "তার মৃত্যু হোক যে তোমাকে এ-সব শিখিয়েছে। এখন আমার আপন বস্ত্র এনে দাও।" মনে মনে কিন্তু তখন বলছিলো, "এ ভালো বুদ্ধি শিখে নিয়েছে।" কুমার তাকে অতি উত্তম বস্ত্র দিলো যা পরিধান করে সে চতুর্দশীর চাঁদের মতো সরোবর থেকে বেরিয়ে এলো। সরোবর থেকে বেরিয়ে এসে উক্ত শশিমুখীকে দেখে কুমুদের মতো কুমারের মুখ আনন্দে বিকশিত হল। দিনকর যেন প্রভাতের উদয় ঘটিয়েছে এবং তা দেখে কমল তার দল মেলেছে।[৭১]

আগে চললো কুমার এবং পিছনে সে, যেন মদমত্ত গজ বনের মধ্য দিয়ে সজ্জিত হয়ে আসছে। অথবা মেঘ-স্পর্শ পেয়ে হাঁস যেন রঙ্গ করছে অথবা আশ্বিন মাসে যেন আকাশে বলাকা পাখা মেলে উড়ছে। অথবা যেন তুলা রাশিতে জন্ম নিয়ে শশী এসেছে। এভাবেই বিভিন্ন প্রকারের জীবনের প্রকাশ ঘটে। হর্ষিত হয়ে কুমার মন্দিরে প্রবিষ্ট হল এবং স্বর্ণ সিংহাসনে উপবিষ্ট হল। ধাত্রীকে বললো, "দেখ এই সে, যার প্রেমে আমার চিত্ত আচ্ছন্ন হয়েছিলো।" সিংহাসনে বসে তারা একে অন্যের সাহচর্য পেল। কুমার তখন মৃগাবতীর স্তনের উপর বিন্যস্ত হারের উপর হাত রাখলো।[৭২]

মৃগাবতী বললো, "কুমার, সংবরণ কর। আমি একটি কথা বলছি, শুন। তুমি নিশ্চয়ই তা প্রতিপালন করবে, তুমি রাজার পুত্র। আমি তোমাকে কামনা করি কিন্তু আমি কুলবতী। আমি তোমাকে যা বলবো কান পেতে শুনবে। আমার সখীদের আসতে দাও। বলের সাহায্যে রসপ্রাপ্তি ঘটে না, যদি রসের সাহায্যে রসের সাধন করা যায় তবেই উভয় জগতে রসভোগ সম্ভব। রস কখনও বলের সাহায্যে আস্বাদন করা যায়না। রসের সাহায্যেই রস তাৎপর্য পায়। আমি রসের সাহায্যে রস প্রাপ্তি এবং ভোগের কথা বললাম, তুমিও নিশ্চয়ই সে-রসের কথাই বলবে। উভয় জগতে এ-রসই তার জন্য বিদ্যমান থাকে যে রসের দ্বারা রস-প্রাপ্তি এবং ভোগের উপর অনুরক্ত থাকে।"[৭৩]

কুমার বললো, "হে কুমারী, তোমার কথা কেন আমি গ্রাহ্য করবোনা যেখানে তোমার জীবনকে আমি আমার জীবন বলে গণ্য করি। তুমি আমার জীবন এবং আমি মাত্র কায়া। তুমি যা কিছু বলবে, কায়া তা অবশ্যই পালন করবে। জীব হচ্ছে প্রভু এবং কায়া হচ্ছে তার ভৃত্য। প্রভু যা আদেশ করেন ভৃত্য ত্বরিৎগতিতে তা করে। প্রভুর

আদেশকে ভৃত্য কখনও মুছে ফেলতে পারেনা। প্রভু যা আদেশ করেন ভৃত্য তা সাধন করে। বৈদ্যের নির্দেশ রোগী নিশ্চয়ই মানবে। গোরক্ষের মার্গে যে চলে সেইতো যোগী। তুমি বৈদ্য এবং আমি রোগী। তুমি গোরক্ষ বা গুরু এবং আমি তোমার শিষ্য। সেই রোগী দুঃখভোগ করে যে বৈদ্যের কথা শুনেনা।"[৭৪]

মৃগাবতী বললো, "তুমি যখন আমার কথা মান্য করতে স্বীকৃত রয়েছ, আমি তাহলে দাসী হয়ে তোমার সেবা করতে প্রস্তুত রয়েছি। যদি তুমি আমার কথন না শুনতে আমি দাঁত দিয়ে জিহ্বা কাটতাম অর্থাৎ লজ্জিত ও অপমানিত হতাম। যেহেতু তুমি আমার কথা শুনেছ তুমি পুরুষ হয়েছ এবং আমি তোমার রমণী হয়েছি। ব্রহ্মা, রুদ্র এবং শিবের সৌগন্ধ আমি আহার করেছি কেননা আমার জীবন তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। হে নাথ, সখীদের আগমন পর্যন্ত সংযত থাক, তারা শীঘ্রই আসছে। আমার সঙ্গে তোমার সর্বপ্রকার ভাবের আদান প্রদান হবে একমাত্র সুরত সঙ্গম ছাড়া। সখীদের আসতে দাও। তদনন্তর যা তোমার অভিপ্রায় তাই করবে।"[৭৫]

উভয়ের মধ্যে বাচনিক সিদ্ধান্ত হল এবং কুমার পত্রিকা লিখে পিতার নিকট প্রেরণ করলো। রাজা কুমারের পত্রিকা দেখলেন, পাঠ করলেন এবং তাঁর হৃদয় উন্মুক্ত হল। তিনি পত্রিকার অংশবিশেষ সভাসদদের পাঠ করে শুনালেন, "পত্রিকায় লিখেছে 'হে পিতা, তুমি যুগ-যুগান্তর রাজত্ব কর, যুধিষ্ঠিরের ধর্ম তোমাতেই শোভা পায়। দশ সহস্র বর্ষ তোমার আয়ু হোক।' এর পর অনেক সেবা এবং ভাবের কথা লিখেছে। অবশেষে লিখেছে, হে রাজন, তোমার ধর্ম অনুসারে আমি যাকে চেয়েছিলাম তাকে প্রাপ্ত হয়েছি। মনে যত কামনা ছিলো, পূর্ণ হয়েছে এবং সব কিছু তোমারই পুণ্যে হয়েছে।"[৭৬]

এভাবে পত্রিকা সবাইকে শুনিয়ে রাজা হর্ষিত হলেন, তার সর্বাঙ্গ চঞ্চল হল। সকলকে বললেন, তোমরা অশ্বে আরোহণ কর—প্রজা, পদাতিক এবং পরিবার সকলেই অশ্বে আরোহণ কর। অশ্বশালা থেকে অশ্ব ছুটে এলো, এ-সব হরি জাতীয় অশ্ব দেখতে ছিলো সুবর্ণ এবং সুদর্শন। হঁসলা, কার এবং কয়াহ জাতীয় ঘোড়ার পায়ে পিছাড়ী পড়লো, আরও এলো শ্যামকর্ণ এবং মহত্র জাতীয় ঘোড়া। গররা, সোরাহ জাতীয় ঘোড়া এলো, পঞ্চকল্যাণ ঘোড়ার কি বিবরণ দেব? ইন্দ্র বলাহক, কোকাহ, সমল এবং আরও অনেক প্রকার ঘোড়া এলো। আমি ঘোড়ার জাতিভেদ বললাম, এখন বৈশিষ্ট্যের বিচার বলছি।[৭৭]

অশ্ব সকল ছিলো চঞ্চল এবং চপক যেন তারা মৃগের শিক্ষা পেয়েছে। তারা ছিলো বহুভোজী এবং দেখতে অত্যধিক তীক্ষ্ণ। দু'কান খাড়া করে তারা নিশ্বাস নেয়। বায়ু এবং তাদের পায়ের মধ্যে প্রীতি ছিলো, চাবুক দেখলেই তারা উড়ে চলে এবং এটাই হল তাদের রীতি। তাদের পুচ্ছ চামরের মতো দোলে যেন কোনও চামরধারী চামর দোলাচ্ছে। তাদের কান অতি সুদর্শন, যেন কাঁচি দিয়ে কেটে সুডৌল করে বানানো হয়েছে। মুক্তার কান্তি তাদের শরীরে। পিঠে জিন পড়তেই তারা প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।[৭৮]

সকলেই প্ররোহণ বা অশ্ব বেছে নিল। রাজা এবং রাণী অশ্বারোহণ করলেন, তাদের মাথার উপরে ছিলো মেঘডম্বর ছত্র। তূর্য আদি তরপুর শব্দ করছিলো। অনেক দ্রব্য তাঁরা সঙ্গে নিলেন। পুত্রবধূকে বরণ করবার জন্য তারা এসে পৌঁছলেন। কুমার অশ্বারোহণ করে পিতার সম্বর্ধনার জন্য প্রস্তুত ছিলো। রাজাকে দেখে সে ঘোড়া থেকে নামলো এবং রাজা তাকে আলিঙ্গন করলেন। তদনন্তর উভয়ে আবার অশ্বারোহণ করে হাস্যোজ্জ্বল মুখে মন্দিরে প্রবেশ করলেন।[৭৯]

রাজা বধূকে বহুবিধ উপচারে বরণ করলেন এবং দু-চার দিন তিনি সেখানে থাকলেন। তদনন্তর সকলকে নগরমুখী যাত্রার আজ্ঞা দিয়ে গৃহে ফিরলেন। রাজকুমার এবং মৃগাবতী সেখানে রয়ে গেল এবং দিন দিন একে অন্যের ঘনিষ্ঠ হতে লাগলো। একই স্থানে তারা হেসে খেলে অবস্থান করছিলো যেন দৈব সম্পাদিত সারস-জোড়ী। একদিন মৃগাবতী ভাবলো, "যদি এ সত্যিই আমাকে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহলে আমার দেশে সে নিশ্চয়ই আসবে।" পুনরায় সে ভাবলো, "কোনও প্রকারে যদি আমার নিজস্ব বস্ত্র পাই, তাহলে উড়ে চলে যেতে পারি।"[৮০]

এদিকে একদিন রাজার মনে মোহ এলো অর্থাৎ ইচ্ছে জাগলো এবং তিনি কুমারের কাছে মনুষ্য অর্থাৎ দূত প্রেরণ করলেন। সে এসে বললো, "হে কুমার, রাজা সন্দেশ প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন যে তাঁর প্রতি তোমার মোহ নেই। অনেক দিন হয়ে গেল তুমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওনি এবং তুমি শুধু মৃগাবতীকে নিয়েই আছ। কুমার একথা শুনে ঘোড়া আনলো এবং ভাবলো, "পিতাকে নমস্কার করতে যাব। ধাত্রী মৃগাবতীর কাছে থাকবে।" ধাত্রীর কানে কানে সে বললো, "তোমরা ভালোয় ভালোয় থাকবে। মৃগাবতীর নিজস্ব বস্ত্র এমন স্থানে রাখবে যেখান থেকে অনুরক্ত জন অর্থাৎ মৃগাবতী তা খুঁজে পাবেনা।"[৮১]

একথা বলে কুমার অশ্বারোহণ করলো, কিন্তু তখন অশুভলক্ষণ দেখা দিল। অনুচর বললো, "কুমার যাত্রায় ক্ষান্ত দিন, একটু বসুন এবং কিছুটা সময় কাটিয়ে যান।" কুমার বললো, "পিতার মনুষ্য অর্থাৎ সন্দেশ-বাহক এসেছিলো; সুতরাং কি করে এখন আমি যাত্রা বিরতি করবো? বিধাতা যা ভাগ্যে রেখেছেন তাতো হবেই, শুভলক্ষণ বা অশুভ-লক্ষণ যাই দেখা যাক না কেন। সে যাত্রা করলো এবং অতি দ্রুত গমন করে রাজার সান্নিধ্যে এল। রাজা কুমারকে দেখে হর্ষিত হলেন। কুমার তার নিজের গৃহে এলো বটে কিন্তু তার জীবন পড়ে রইলো মৃগাবতীর কাছে।"[৮২]

মৃগাবতী মোক্ষ খণ্ড

মৃগাবতী ঘরে বসে ছিলো, ধাত্রীর সঙ্গে সে রসের কথা বলতে লাগলো। রসবার্তায় ধাত্রীকে মোহিত করে কোনও কার্যসম্পাদনার জন্য সে তাকে অন্যত্র প্রেরণ করলো। যতক্ষণ ধাত্রী কর্মসম্পাদনায় ব্যস্ত ছিলো ততক্ষণে সে তার নিজস্ব বস্ত্র সন্ধান করে পেল

এবং পরিধান করে উড়ে চললো। ধাত্রী ফিরে এসে তাকে গৃহে পেলনা, চমকিত হয়ে ভাবলো রাণী কোথায় গেল। সে বললো, "যখন অল্পক্ষণের মধ্যেই কুমার আসবে তখন তাকে আমি কি করে মুখ দেখাবো ? ক্রন্দন করতে করতে ধাত্রী চতুর্দিকে মৃগাবতীকে খুঁজতে লাগলো, কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পেলনা। সে বললো, আমি কার কাছে কি বলবো ? এ-দুঃখ বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।"[৮৩]

গৃহের অভ্যন্তরে সন্ধান করে যখন সে বাইরে এলো, তার দৃষ্টি পড়লো ভবন-শিখরে। সে দেখলো ভবন-শিখরে মৃগাবতী বসে রয়েছে। সে বললো, "মৃগাবতী এ তুমি কি করলে ? যদি আমি কোনও অপরাধ করতাম তা হলে এ বিলগ্নতা তোমার শোভা পেত। আমিতো কোনও অন্যায় করিনি, তবে কি কারণে ক্রুদ্ধ হয়ে চলে যাচ্ছ ? কুমারকে আমি কি উত্তর দেব ? এ খবর পেয়ে কুমারতো মরে যাবে, তাতে তোমার কি লাভ হবে ? হে সুহাগিনী এবং প্রিয়তমা, তুমি নেমে এস, আমার চিত্তে শান্তি আসুক। তোমার মনে হয়তো মোহ নেই, কিন্তু কুমার তার জীবন অর্থাৎ তোমাকে ছাড়া কি করে বাঁচবে ?"[৮৪]

মৃগাবতী বললো, "হে ধাত্রী, তোমার কোনও দোষ নেই, কুমারকে আমার জুহার বা নমস্কার বলবে। কুমারকে বলবে, আমি তার প্রতি অনুরক্ত কিন্তু যে-বস্তু অল্প মূল্যে পাওয়া যায় তার মর্ম মানুষ জানেনা। এ-কারণে আমি উড়ে চলে যাচ্ছি। তুমি কুমারকে বলবে সে যেন ত্বরিৎগতিতে চলে আসে। আমার স্থান কাঞ্চননগর এবং আমার পিতার নাম রূপমুরারি।" ধাত্রীকে এ-কথা বারবার বলে সে উড়ে চলে গেল। তাকে চলে যেতে দেখে ধাত্রী উচচরোলে রোদন করতে লাগলো।[৮৫]

এদিকে হাস্য-পরিহাসে কুমার যখন সময় কাটাচ্ছিলো, হঠাৎ মৃগাবতীর কথা তার স্মরণ হল। সঙ্গে সঙ্গে তার চিত্ত চঞ্চল হল এবং হৃদয়ে দাহ জাগলো। পিতাকে সে বললো, "আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি, সেখানে ধাত্রীকে একা রেখে এসেছি।" রাজা তাকে বস্ত্র দিলেন পরিধানের জন্য। সে পিতাকে নমস্কার করে ভবনে এলো। ধাত্রী তাকে দেখে হাহাকার এবং ক্রন্দন করতে লাগলো। কুমার মনে মনে বললো, "কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনে হয় রাবণ এসে সীতাকে অপহরণ করেছে।" সে বললো, "কি ঘটেছে যে তুমি ক্রন্দন করছো ? আমাকে কিছু বলছোনা কেন ? ধাত্রী বললো, "রামের যে-জন্য বিয়োগ-দুঃখ হয়েছিলো, অতিশয়তার সঙ্গে তোমারও তাই ঘটেছে।"[৮৬]

ধাত্রীর কথা কানে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে কুমার ঘোড়া থেকে লুটিয়ে পড়লো। শিরস্ত্রাণ ভূমিতে ছুঁড়ে ফেলে তার কাপড় ছিঁড়তে লাগলো এবং বুকে আঘাত করবার জন্য অস্ত্র হাতে নিল। সঙ্গী-সাথীরা হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বললো, "আমরা তোমার হারিয়ে যাওয়া জোড়ী মিলিয়ে দেব।" কুমার বলতে লাগলো "আমাকে বিষ দাও যা আমি তৃপ্তির সঙ্গে পান করে শীঘ্রতাপূর্বক মরে যেতে চাই। এখন আমি জীবিত থাকতে চাইনা। প্রেমপত্র-বিহীন অবস্থায় একাকী বাঁচা সম্ভবপর নয়। আমার কায়াকে ছেড়ে

আমার জীবনকে যমে নিয়ে গিয়েছে। আমাকে বিষ পান করে মরতে দাও কেননা কোনও প্রকারেই বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। জীববিহীন অবস্থায় কায়াকে নিয়ে আমি কি করবো? তাকে ছাড়া আমার শান্তি আসবেনা।"৮৭

শান্ত হবার পর তার মনে ক্ষোভ জাগলো। দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ এবং উচাটনের আধার হল তার মন। সে বললো, "হে দৈব, আমি কি আগুন বা অপরাধ করেছি যার কারণে তুমি পুনরায় আমাকে বিরহের সন্তাপ দিয়েছে? প্রেমের ক্ষত যে দুঃখ তা বহন করা সত্ত্বেও হৃদয়ে বিষ-বাণ কেন প্রবিষ্ট হল? এখন আমার ঔষধির আশা নেই, নিশ্বাস নিয়ে যে বেঁচে থাকবো, তাওতো অত্যধিক কঠিন। বিয়োগের আঘাতের অনন্তর যদি বেঁচে উঠি, তবেওতো শরীরে পঞ্চশরের দংশন থাকবে।" এ-সব কথা বলে সে সন্তপ্ত হচ্ছিলো এবং ক্রন্দন করে অস্থির হচ্ছিলো। এখন সে ভাবলো, "এখন উপায় সন্ধান করতে হবে কি করে মৃগাবতীর সমাচার পাই। যদি কেউ মৃগাবতীর সমাচার বলে এবং তার পরিবর্তে আমার জীবন নিতে চায় তাও দিতে আমি প্রস্তুত আছি। রামতো সীতার জন্য সেতু বেঁধেছিলো, আমি আমার প্রেয়সীর জন্য আগুনে ঝাঁপ দিতে পারি। হনুমানতো সীতার জন্য লঙ্কা দাহন করেছিলো, আমি মৃগাবতীর জন্য প্লক্ষ দ্বীপ বিধ্বস্ত করতে পারি। সপ্ত স্বর্গে আরোহণ করে আমি তার সন্ধান করবো এবং সেখানেই যাব যেখানে মৃগাবতীর নাম শুনবো। মহাদেব সতীর জন্য কামকে দগ্ধ করেছিলো, আমি মৃগাবতীর জন্য শিবলোককে দগ্ধ করবো।" যেভাবে ভর্তৃহরি বিয়োগপক্ষের যোগী হয়েছিলো পিঙ্গলার বিরহে সেভাবে দু'হাত কটিপ্রান্তে স্থাপন করে সে ক্রন্দন করলো এবং বললো, "আমি বিয়োগ পথের পথিক।" ক্রন্দন করে এবং তাকে স্মরণ করে সে বলতে লাগলো, "হে বিধাতা, কেন তুমি আমার সংযোগকে নিষিদ্ধ করেছ? আমিতো তার জন্য অনেক দুঃখ দেখেছি কিন্তু সেজন্য তো আমার প্রতিবাদ ছিলোনা।" ধাত্রীকে সে জিজ্ঞেস করলো, "উড়ে যাবার সময় সে কি কিছু বলেছিলো?" ধাত্রী উত্তরে বললো, "সে তোমাকে নমস্কার জানিয়েছিলো এবং আপন নগরের নাম উচ্চারণ করেছিলো। বলেছিলো, কাঞ্চননগর আমার আবাস-স্থান। কুমারকে এ-সংবাদ দেবে এবং বলবে সে যেন বিলম্ব না করে সেখানে চলে যায়। অনেক দুঃখভোগের পর সে আমাকে পাবে।"৮৮

এ-সন্দেশ শুনে সে তার শির ভূমিতে লুটালো এবং হাত দিয়ে মস্তকের কেশ আকর্ষণ করতে লাগলো। সব লোক সেখানে ছুটে এলো, সকলেই তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, "কুমার ধৈর্য ধর, দৈব পুনরায় তাকে মিলিয়ে দেবে।" কুমার বললো, "সে এক, যে এক অঙ্গুলী পানির অভাবে মরে যায় সে মৃত্যুর পর এক ঘড়া পানি দিয়ে কি করবে? কোন্ সে ব্যক্তি যে পিশুনের (যে একজনের অপবাদ অন্যের কাছে দেয়) মিত্র হয়ে ঘরে প্রবেশ করলো এবং স্বজনের শত্রু হয়ে তাকে পাগল করলো? কে সে দূতের বেশে প্রবেশ করে তাকে আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিল যেভাবে প্রবল বায়ু বাদলকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়? কোন্ স্বজন বা কোন্ দুর্জন আমাকে এ-বিয়োগ সন্তাপ দিল? কে আমার শত্রু হয়ে আমার জন্য যোগী-জীবন নির্মাণ করলো?"৮৯

সকল লোক কুমারকে প্রবোধ দিচ্ছিলো, তাই কুমার বললো, "সবাই ভেবেছে আমি পাগল হয়েছি যেভাবে পিঙ্গলার জন্য ভর্তৃহরি বিয়োগী হয়েছিলো। আমি মৃগাবতীর জন্য যোগী হব।" চিন্তারূপ যোগতন্ত্র তার গ্রীবায় লেগেছে দেখে ভোগের অস্তিত্ব নষ্ট হল। মাতা, পিতা কারো কথাই সে ভাবলোনা, সে যোগীর বেশ ধারণ করলো। সে লোক, দেশ, কুটুম্ব এবং ঘর-বাড়ী পরিত্যাগ করলো এবং পিতা তথা সংসারের মোহ থেকে মুক্ত হল। মৃগাবতীর প্রেম-রসে সিক্ত হয়ে সে কোন বাধাই মানলোনা। গজেন্দ্র যেমত পঙ্কে, সেও সেমত মৃগাবতীর প্রেমে ক্ষণ-প্রতিক্ষণে জড়িত হয়ে পড়ছিলো।[৯০]

সে গোরখ পন্থে উন্মত্তবৎ বেরিয়ে পড়লো, পায়ে পরলো পাঁবরী, শরীরে মেখলা তথা ছিন্ন বস্ত্র। সঙ্গে নিলো জটা, চক্র, মুদ্রা, জপমালা, দণ্ড, খর্পর এবং কেশরীর চর্ম। আরও নিলো যোগ পট্ট, রুদ্রাক্ষ এবং অধারী। ত্রিশূল হাতে নিয়ে ভস্ম মাখলো গায়ে। হাতে কিঙ্গরী নিয়ে গোরখধন্ধ মন নিবিষ্ট করলো। রাত্রিতে সে একা একা গীত বাজাতে লাগলো। সে শিঙ্গায় ফুৎকার দিতে দিতে মৃগাবতীর কথা স্মরণ করলো। কুরঙ্গিনী বা মৃগাবতীর নাম সে ক্ষণ-মুহূর্তেও বিস্মৃত হচ্ছিলোনা। যোগ-যুক্তিতে আরূঢ় হয়ে সে মুক্তির পথে চললো, সাধন-পথের শিষ্য হবার জন্য পথে নামলো। সে বললো, "আমার ভুক্তি হচ্ছে মৃগাবতী, আমি তাকে ভিক্ষা হিসেবে পেতে চাই।"[৯১]

যোগী রূপে কুমার পথে চললো। রাজা যখন এ-কথা শুনলেন তখন তাঁর বুকে দাহন লাগলো। পুত্র বিয়োগে দশরথের যে দশা হয়েছিলো, সে-মতই তিনি প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলেন। অভিমন্যুর মৃত্যুর পর অর্জুনের যে অবস্থা হয়েছিলো রাজারও সে অবস্থা ঘটলো—তিনি ক্রন্দন ও হাহাকার করতে লাগলেন। তিনি শিরে করাঘাত করতে লাগলেন কিন্তু মৃত্যু এলোনা, কেননা আয়ু সমাপ্ত না হলে কেউ কি মরতে পারে? তিনি না দেখছিলেন সামনে না পিছনে। মৃত্যুর জন্য যদি প্রস্তুত না হতে পারলেন তবে বাঁচবেনই বা কার জন্য? তিনি ভাবলেন, "মৃত্যুর পরও আমার পশ্চাত্তাপ যাবেনা যদি জীবনে তাকে না পাই।"[৯২]

জঙ্গম-ভেট তথা সমুদ্র-সন্তরণ খণ্ড

যেখানে মৃগাবতী ছিলো সে-দিকের পথে কুমার যাত্রা করলো। সে-পথে সিংহ ছিল, শার্দূল ছিলো এবং অগম্য বন ছিলো। কিন্তু তার ভয় হচ্ছিলোনা, সে প্রেমের যোগী হয়ে কিঙ্গরীতে প্রেমের গীত বাজাচ্ছিলো। বেভুল পথিক হিসেবে তার কাছে পথ-অপথের ভেদ ছিলোনা, সে শুধু বিরহের কথাই বলছিলো। ততক্ষণ পর্যন্তই পথ-বিপথ নির্ণয় করা সম্ভব যতক্ষণ পর্যন্ত জীবনের প্রতি মানুষের মোহ থাকে। ততক্ষণ পর্যন্ত কুল-শীল বিদ্যমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত কামিনীর বঙ্কিম-কটাক্ষ নিক্ষিপ্ত না হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তার জাগুতি, ততক্ষণ পর্যন্ত তার গুণময়তা, ততক্ষণ পর্যন্ত তার জপ-তপ যতক্ষণ পর্যন্ত কটাক্ষ-বাণে সে আহত না হচ্ছে।[৯৩]

এক বন ছেড়ে সে অন্য বনে এলো, অবশেষে আরও এগিয়ে গিয়ে এক বড় নগরের সন্ধান পেল। সে-নগর ছিলো সুন্দর এবং উত্তম। সেখানে অনেক ধর্মশালা ছিলো এবং অনেক ধর্মের প্রতিষ্ঠা ছিলো। সে মনে মনে বললো, "আজকের দিন এ-নগরে অতিবাহিত করবো, হয়তোবা এখানে মৃগাবতীর সমাচার পেতে পারি। 'সে ভিক্ষাও চাচ্ছিলোনা, কোন গৃহেও যাচ্ছিলোনা, সে শুধু কেঁদে কেঁদে কিন্নরীতে বিয়োগ-সঙ্গীত বাজাচ্ছিলো। সে স্থানের লোকেরা তাদের রাজার কাছে সংবাদ দিলো, "এক কুমার যোগীর বেশে এখানে এসেছে। সে অত্যধিক রূপমান এবং সুলক্ষণ-সম্পন্ন, তার মুখগহ্বরে বত্রিশ দাঁতের পংক্তির পূর্ণতা আছে। কর্ম-জ্যোতির মণি তার মস্তকে চমকাচ্ছে এবং কোন লক্ষণই তার ক্ষীণ নয়।"[৯৪]

রাজা বললেন, "আমিই সেখানে যাব এবং তার আগমনের মর্ম জিজ্ঞেস করবো।" রাজা সেখানে পৌঁছে তাকে দেখলেন, দেখলেন যে, সে অত্যন্ত রূপবান এবং সুলক্ষণ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "কি কারণে তুমি যোগ-সাধন করছো ?" কিন্তু প্রেম-দুঃখে দগ্ধ সাধক কোনও উত্তর দিলোনা। রাজা পুনরায় বললেন, তুমি বলছোনা কেন, কি কারণে তুমি যোগী হয়েছ এবং কার জন্য বিরাগী হয়েছো ? তোমাকে যোগ শোভা পায়না। কোন্ সে কুমারী যার প্রতি তুমি লুব্ধ হয়েছ ? কুমার উত্তরে বললো, "সে এমন কথা যা বলা চলেনা। হে রাজা, আপনি আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেননা। এ-দুঃখের কথা আমি কাউকে বলিনা, কেননা বললেই চিত্তে দাহ জাগে।"[৯৫]

তদনন্তর সে তার বিরহ, বিয়োগ তথা প্রেমের দুঃখের কথা বলতে লাগলো এবং যারা শুনলো তারা সবাই অচেতন হয়ে পড়লো। সে যখন প্রেমের রসময়ী বার্তা বললো, রাজার চিত্তেও বিভ্রম এলো। যারা তাকে বিরহ-কথা বলতে শুনলো তারা সবাই ক্রন্দনে অধীর হল এবং হাত দিয়ে নেত্র-সলিল মুছতে লাগলো। দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ এবং উচাটনের কাহিনী শুনে সকলেই লুব্ধ হল। সে তো আর কোন কথাই বলছিলোনা, কেবল মৃগাবতীর প্রেমের ব্যাখ্যা করছিলো। কুতবন বলেন, সাত সমুদ্রের প্রামাণিক রূপে তাদের পানি সংগ্রহের অনুমান করা যায় কিন্তু এত পানি সত্ত্বেও চাতক নিশ্চিতরূপে স্বাতীর পানির অপেক্ষায় থাকে।[৯৬]

রাজা যখন বিরহের গাথা শুনলেন, তাঁর হৃদয়ে অত্যধিক মমতা জাগ্রত হল। তার মনে স্নেহপূর্ণ কৃপায় আবেগ উদিত হল এবং তিনি কাঁদতে লাগলেন। তিনি বললেন, যদি তোমার তৃপ্তি হয় তাহলে আমি তোমাকে অমূল্য পদ্মিনী দিতে পারি।" রাজা তাঁর অনুচরগণকে নির্দেশ দিলেন কুমারকে প্রভূত প্রসাদ দিতে। কিন্তু যোগী অর্থাৎ কুমার বললো, "হে রাজা, আমার অন্য কোনও প্রয়োজন নেই, আপনার কাছে আমার শুধু একটি মাত্র ভিক্ষা, যদি এ-নগরে কেউ কাঞ্চনপুরের গম্যপথ জানে তাকে এখানে আহ্বান করুন। রাজা বললেন "আমার নগরে জনৈক জঙ্গম বা পরিব্রাজক আছে, সে অনেক স্থান ভ্রমণ করেছে।" রাজা তৎক্ষণ আপন সেবককে প্রেরণ করলেন একথা বলে, "জঙ্গমকে ডেকে

নিয়ে আস, এবং তাকে বলবে কাঞ্চনপুর কোথায় এবং কোন স্থানে এ-খবর সে যেন কুমারকে বলে।"[৯৭]

সে লোক দৌড়ে গিয়ে জঙ্গমকে নিয়ে এলো। কুমার আপন নেত্র জঙ্গমের মুখে স্থাপিত করলো। সে তাকে বললো, "তুমি যদি কাঞ্চনপুর দেখে থাক তবে তার সন্ধান আমাকে দাও।" সে উত্তর করলো, "আমি অনেক নগর, অনেক গ্রাম দেখেছি, অনেক রাজস্থান এবং অপূর্ব স্থান দেখেছি। কাঞ্চননগরও আমি দেখেছি। সেখানকার পথ অত্যন্ত জটিল এবং তার দুর্গমতার বিবরণ দেওয়া কঠিন। সে-পথে সাগর, সমুদ্র, অগম্য বন আছে যেখানে প্রেত এবং মনুষ্য ভক্ষণকারী রাক্ষস বসতি করে। ভূত-প্রেত এবং সর্প সে-পথে এত প্রচুর যে সেখানে পা ফেলাই কঠিন। এ-সমস্ত দুঃখ উত্তীর্ণ হয়েই একজন কাঞ্চন-পুর পৌঁছতে পারে।"[৯৮]

কুমার উত্তর দিলো, "ভূত এবং সর্পকে আমি ভয় পাইনা। কায়াতে জীবন থাকলেই না ভয়ের কথা উঠবে। কোনও রাক্ষস অথবা ভূত যদি আমাকে আহার করে, তাহলে আমার সিদ্ধি ঘটবে এবং আমি পুরস্কৃত হব। প্রিয়তম-বিহীন আবাস বনসদৃশ, তবুও ভাব-পন্থের পথিক সেখানেই অপেক্ষা করে, পলায়ন করেনা। প্রিয়তমের জন্য অনেক দুঃখ সহ্য করেই সুখ লাভ সম্ভবপর। হাতের যে দশ নখ ছিলো দৈন্য নিবেদনের জন্য কুমার তা দিয়ে তার মুখ ঢাকলো এবং বললো, "সে দুঃখপূর্ণ পথই আমাকে দেখাও। যাই ঘটুক না কেন তার জন্য আমি আমার জীবনকে সংকল্প রেখেছি। যে-জীবনকে কারও জন্য দক্ষিণা দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা কেন?"[৯৯]

রাজা তাকে যেতে দিতে চাচ্ছিলেননা এবং তাকে অনেক ভাবে বুঝাচ্ছিলেন কিন্তু সে প্রবোধ মানছিলোনা। সে বললো, "হে রাজন, আমার শরীরে জীবন নেই এবং জীবন-বিহীন শরীরের জন্য ভয়ই বা কি, শীতই বা কি, গ্রীষ্মই বা কি? আমার জীবনতো মৃগাবতী অপহরণ করে নিয়েছে, এবং আমার কায়া জীবন-বিহীন অবস্থায় শূন্যতা নিয়ে আছে। বিস্ময়, বিষাদ, লজ্জা এবং হর্ষ এখন আমার নেই, প্রেম আমার চিত্তকে গভীর-ভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। একথা বলে কুমার দৌড়ে গিয়ে জঙ্গমের পা ধরে বলতে লাগলো, "হে ভাগ্যবান, তুমি আমাকে পথ দেখাও। যে প্রেম-সুরা পান করে সে বুদ্ধি-হারা হয়, তার চিত্তে না চিন্তা থাকে, না ভয় থাকে, বিস্ময় বিষাদ কিছুই থাকেনা, হর্ষও থাকেনা।"[১০০]

জঙ্গমের মনে কুমারের প্রতি মোহ-মমতা এলো এবং সে পথ-প্রদর্শনের জন্য কুমারের সঙ্গে চললো। তারা সাগরের তটপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। সে বললো, "কাঞ্চননগরের পথ এটাই, এবং এ-সমুদ্রের একমাত্র ঘাটও এটাই। দৈব বিধাতাকে স্মরণ কর, সিদ্ধি তোমার তখনই মিলবে যখন তুমি নির্ভয় হবে।" সাগরতটে একটি নৌকো ছিলো, কুমারকে নৌকোয় চড়িয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে ঘরের পথে চললো। কুমার মনে মনে বললো, "আমি এখন আমার প্রিয়তমকে উভয় নেত্রে প্রসন্ন অবস্থায় দেখবো। যেখানে কমল

তার সর্বাঙ্গ দিয়ে সরোবরের পানিতে অবস্থান করে, তেমনি আমার সমস্ত অঙ্গে তারই অনুভূতি।"[১০১]

তদনন্তর সে বহিত্র বাইতে লাগলো, এবং এমন এক স্থানে উপস্থিত হল যেখানে প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাস ছিলো। জলোচ্ছ্বাসে সে হিণ্ডোলের মতো দুলতে লাগলো। তার নৌকো উন্মত্তবৎ এদিক-ওদিক ঘুরছিলো। চক্রাকারে কখনও তা পূর্বে, কখনও পশ্চিমে, কখনও উত্তরে এবং কখনও দক্ষিণে ঘুরছিলো। কুমার বললো, "জীবনের জন্য আমার শঙ্কা নেই, শুধু এ-কথাই ভাবছি যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবেনা।" কুতুবন বলছেন, আমার প্রিয়তম অগম্য ভূমিতে রয়েছে এবং সেখানে সে নিশ্চিন্তে নিবাস করছে। কিন্তু আমার হৃদয়ে নিত্য যে-রকম উদ্বেলতা বৈরোচনের হৃদয়ে জেগেছিলো বৃক্ষের শাখার কল্পমানতার শব্দ শুনে।"[১০২]

এক মাস অতীত হল কুমার সমুদ্র তরঙ্গেই দুলতে লাগলো। তখন সে বিধাতার কাছে মিনতি করে বললো, "আমি দু'হাত জুড়ে তোমার বন্দনা করছি এবং যাচ্ঞা করছি যে তুমি এ-সঙ্কট থেকে আমাকে মুক্তি দাও। আমি যেন এ-তরঙ্গেই নিঃশেষ না হই।" দৈব-কৃপায় সঙ্গে সঙ্গেই এক তরঙ্গাঘাতে সে তটপ্রান্তে নীত হল। সেখানে সে এক গিরি-পর্বত দেখলো। দু'ব্যক্তি সেখানে তাকে নমস্কার করলো। কুমার জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কারা এবং কোথায় থাক?" তাদের একজন বললো, "আমরা এখানেই থাকি যেখানে কোনও মনুষ্য থাকেনা। যেখান থেকে ভ্রান্তিতে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ আমরাও সেখান থেকে এসেছি। পর্বত দেখে আমরা ভেবেছিলাম এখানে উত্তরণের ঘাট আছে কিন্তু এখানে শুধুই পর্বত। আমাদের সঙ্গে অনেক বহিত্র এসেছিলো, সে-গুলো সবই ডুবে গেছে এবং সে-সব নৌকোয় যারা ছিলো তাদের কারো সন্ধানই আমরা পাইনি। অনেক আশ্চর্য বস্তু এখানে আমরা দেখেছি, এক ভয়ানক সর্প দেখেছি। সে এক এক দিন এক এক জন মনুষ্যকে সম্পূর্ণ গলাধঃকরণ করে এবং অস্থি পর্যন্ত ফেলেনা। আমাদের সঙ্গে আরও যারা ছিলো তাদের সবাইকে সে খেয়ে ফেলেছে, একমাত্র আমরা দু'জন বেঁচে আছি। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আসবে এবং আমাদের দু'জনের একজনকে আহার করবে।" তার কথা শেষ না হতেই সেই বিষধর সর্প এলো এবং দুজনের একজনকে ধরে কোথায় যেন চলে গেল।[১০৩]

পুনরায় সর্প এসে অন্যজনকেও নিয়ে গেল। এ-দৃশ্য দেখে কুমার ক্রন্দন করতে লাগলো এবং বলতে লাগলো, "এ-আমার কর্মফল। আমার ভাগ্য আমার প্রতিকূল। আমি কাউকে সঙ্গী-সাথী করিনি, এবং একাকী বনখণ্ড এবং সাগরে প্রবেশ করেছি। আমি প্রাণের ভয় করিনা কিন্তু চিন্তা হয়, আমার সমাচার মৃগাবতীকে কে দেবে? যদি সর্প আমাকে খেয়ে ফেলে তাহলে সে-সংবাদ মৃগাবতীকে কে দেবে? সে হয়তো ভাবছে আমি সুখেই আছি। কে আমার কথা শুনবে? আমি কাকে মৃগাবতীর কাছে পাঠাবো যে তাকে আমার দুঃখের কথা বলবে?"[১০৪]

কুমার বললো, "হে দৈব বিধাতা, আর কেউ থাকুক বা না থাকুক, একমাত্র তুমি তো আছ। তোমাকে ছাড়া আমি আর কার মিনতি করবো ? তোমাকে বাদ দিয়ে যে অন্য কারও ধ্যান করে সে কর্মহীন মনুষ্যজন্মের অধিকার হারায়।" পুনঃ সেই সর্প এলো, কিন্তু তখন আকাশে প্রচণ্ড মেঘ-ঘটা উঠলো। মনে হলো মৃত্যুর তাণ্ডব জেগেছে। কুমার জীবনের আশা পরিত্যাগ করলো। "যদি আমার আয়ুর সমাপ্তি এ-প্রহরেই, তাহলে এ-সময় গৃহে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলে দোষের হত। এখানে মৃত্যু ঘটলে আমার এ আনন্দ হবে যে তার প্রেমের জন্য তারই দ্বারপ্রান্তে আমার মৃত্যু ঘটেছে। যদি এই কাল সর্পের কাছে আমার মৃত্যু অবধারিত থাকে, তাহলে পালিয়েও আমি বাঁচবোনা।"[১০৫]

সর্প তার নিকটে এলো এবং তাকে খাবে বলে অগ্রসর হল। সে মুহূর্তে কুমারের প্রতি দৈবের দয়া হল। অন্য একটি সর্প সেখানে দেখা দিল। তদনন্তর উভয় সর্প একে অন্যকে আক্রমণ করতে করতে সাগরে পতিত হল। উভয়ের পতনে সমুদ্রে প্রবল তরঙ্গবিক্ষেপ দেখা দিল এবং যে বহিত্র পাহারের পায়ে আটকে পড়েছিলো তা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। কুমার সঙ্কট থেকে মুক্ত হলো। সে আশ্বস্ত হল, তার শরীরে শ্বাস এলো। সে মনে মনে বললো, "যখন আমি এ-কালসর্পের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তাহলে হয়তো প্রিয়তমের সঙ্গে মিলনের আশা আছে।"[১০৬]

রূপমিনী উদ্ধার খণ্ড

জলযান ছেড়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে সে একটি সুন্দর আম্রকুঞ্জ দেখলো। সে বললো, "কুঞ্জের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে দেখবো, এবং ছায়ায় কিছুক্ষণ বসবো।" যখন সে কুঞ্জের মধ্যে এসে বসলো একটি সুদৃশ্য নয়নরঞ্জন পুষ্পোদ্যান তার দৃষ্টিতে পড়লো। যেন শিব-লোকের উদ্যান অথবা ইন্দ্র যেন আপন বসবাসের জন্য নির্মাণ করেছেন। সে মনে মনে বললো, "বাটিকায় প্রবেশ করে কারো কাছে নগরের নাম জিজ্ঞেস করি, জিজ্ঞেস করি এ-গ্রাম কি নামে আখ্যাত।" সে তদনন্তর অগ্রসর হতেই সামনে এক অপূর্ব ভবন দেখলো। বললো, "দেখি এর ভিতরে কি আছে।"[১০৭]

ভিতরে পায়ের শব্দ করে প্রবেশ করে সে মানুষের সাড়া পেল। একটু এগিয়ে কুমার দেখলো, এক লাবণ্যবতী কুমারী শয্যায় বসে রয়েছে। সে বিস্মিত হয়ে দেখলো কুমারীর মুখকান্তি উদিত চন্দ্রমার মতো। সে ভাবতে লাগলো, "এ-চন্দ্রমা কি কারণে একাকী অবস্থান করছে ? এর চতুর্দিকের নক্ষত্র কোথায় অর্থাৎ সেবিকারা কোথায় ? এ অমূল্য কমলিনী কেন একাকী রয়েছে ? কোনও ভ্রমর কেন একে যাচ্ঞা করছেনা ? মনে হচ্ছে যেন অমৃত সরোবর অধোমুখী কমলিনীকে আকর্ষণ করে রেখেছে অথবা পাবস যেন সঘন মেঘকে বন্দী করে রেখেছে। এ-লীলাযুক্ত অবলা অশ্রুপূরিত নয়নে কি কারণে এখানে রয়েছে ?"[১০৮]

সূর্যস্বরূপ কুমার প্রশ্ন করলো, "হে শশিমুখী, তুমি কি কারণে ক্রন্দন করছো? তোমার গ্রহণ লেগেছে, অর্থাৎ তুমি বন্দী হয়েছ অথবা তুমি কিছু হারিয়েছ?" সে উত্তরে বললো, "আমি কিছুই হারাইনি, আমি শুধু আমার জীবনকে হারিয়েছি। ক্ষণ-প্রতিক্ষণ আমার গ্রহণ লেগেই রয়েছে। চন্দ্রের গ্রহণ লাগলে রাহু একসময় তাকে ছেড়েও দেয়, কিন্তু যে-রাক্ষস আমাকে বন্দী করে রেখেছে সে আমাকে ছাড়ছেনা। দৈব আমার জন্য যা নির্দিষ্ট রেখেছে আমার জীবনে তাই ঘটবে, তুমি চলে যাও, রাক্ষস এখনই আসবে। দক্ষিণাস্বরূপ রাক্ষসের কাছে সমর্পণ করা হয়েছে, মাতা-পিতা স্নেহবসত আমাকে রক্ষা করতে পারেননি। তুমি এ বনভূমি থেকে চলে যাও, তোমার প্রতি আমার মমতা জাগছে তোমার রূপ এবং তারুণ্য দেখে তোমার প্রতি আমার মোহ জাগছে।" ১০৯

রাজকুমার বললো, "তুমি স্ত্রীলোক এবং এ-স্থানে বন্দী রয়েছ। আমি তোমাকে ছেড়ে কোথায় পলায়ন করবো? আমি তোমাকে যে বার্তা জিজ্ঞেস করছি তার উত্তর দাও। কি করে তোমার মাতা-পিতা রাক্ষসের হাতে তোমাকে সমর্পন করলো? তোমার পিতার নাম কি? এ-নগরের নাম কি এবং কে এর স্বামী?" নারী উত্তর করলো, "এ-স্থানের স্বামীর নাম দেবরায় এবং এ-নগরের নাম সুবুধ্যা, এখানকার রাজা রাঘব-বংশীয় যাঁরা মূলতঃ অযোধ্যা থেকে এসেছিলো। আমি দেবরায়ের দুহিতা, তিনি আমাকে রূপমিনী নাম দিয়েছিলেন। এখানে এক রাক্ষস বাস করে, সে প্রতিবছর একটি প্রাণী গ্রহণ করে। এ-বছর আমার পালা ছিলো, তাই বাধ্য হয়ে আমার পিতা-মাতা আমাকে সমর্পণ করেছেন।" ১১০

কুমার বললো, "যে পথ অথবা ভাগ্য তোমার, সে ভাগ্য আমিও মেনে নিচ্ছি। সুতরাং তোমাকে পরিত্যাগ করে আমার পক্ষে চলে যাওয়া সম্ভবপর নয়। তোমাকে ছেড়ে যদি আমি চলে যাই, তাহলে আমি লক্ষ এক বর্ষও বাঁচবোনা অর্থাৎ আমার মূল্য থাকবেনা। সে রাক্ষস হোক অথবা আরও ভয়াবহ কিছু হোক আমি তাকে আজ হত্যা করবো এবং বিধ্বংস করবো।" কুমার যখন নির্ভয়তাপূর্বক এ-কথা বললো, উক্ত নারী তখন মনে মনে বললো, "এ নিশ্চয়ই ক্ষত্রিয় হবে।" অতঃপর কুমারী বললো, "যদি তুমি নাই যাবে তা'হলে আমার প্রতিচ্ছায় বস।" কুমার বললো, "আমি আমার জীবন অবধি কোনও স্ত্রীর পাশে বসবোনা অর্থাৎ মৃগাবতীকে আমি যে কথা দিয়েছি সে-কারণে আমি অন্য কোনও রমণীর পাশে বসবোনা। যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে শ্বাস আছে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকবো।" ১১১

কুমারের বাক্য শেষ না হতেই রাক্ষস এসে উপস্থিত হল যে রাক্ষসের জন্য কুমারী আনীত হয়েছে। উক্ত রাক্ষসের সাতটি মস্তক এবং চতুর্দশ ভুজদণ্ড ছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন বলবান রাবণ এসে উপস্থিত হয়েছে। রূপমিনী কুমারকে বললো, "এই সেই রাক্ষস যে আমাকে গ্রাস করতে এসেছে।" এ-কথা বলেই কুমারী ব্যাকুলতার সঙ্গে ক্রন্দন করতে লাগলো। কুমার তখন কুমারীকে বললো, "তুমি আমার শরণ গ্রহণ কর। আমি মস্তক

খণ্ডিত করে একে হত্যা করবো।" কুমার চক্র ঘুরিয়ে তাকে প্রহার করলো যার ফলে তার একটি মস্তক দেহচ্যুত হল কিন্তু সে নিঃশেষ হলোনা। কুমার তখন তার সাতটি মস্তকের জন্য সাতবার আঘাত করলো। তখন সে প্রচণ্ড শব্দ করে মৃত্যুতে গত হল যেন সুমেরু পর্বত বিচূর্ণ হল অথবা আকাশে মেঘের ঘনঘটার প্রচণ্ড আলোড়ন হল।[১১২]

কুমার দেখলো যে কুমারী অচেতন হয়েছে তার গ্রীবার ফুলমাল্য অবিন্যস্ত হয়েছে। তখন সে পানিতে সিক্ত করে তাকে জাগ্রত করলো, বললো "দেখ আমি শক্তির সাহায্যে রাক্ষসকে হত্যা করেছি।" মনে হল চাঁদ থেকে রাহু দূরীভূত হয়েছে এবং আকাশে নক্ষত্র দেখছে। নারী কুমারকে অনেক মণিমাণিক্য উপঢৌকন দিল এবং বললো, "তুমি রাক্ষসকে হত্যা করে আমাকে জীবন দিয়েছ। যে-ভাবে সঙ্কটের মুহূর্তে মহাবীর ভীম দ্রঙ্গপতিকে সহায়তা করেছিলেন সে-ভাবে অন্তিম সীমা পর্যন্ত তুমি আমার সহায়তা করেছ। যখনই তুমি আমাকে এখানে পেয়েছ তখনই তুমি আমার জন্য আর্ত হয়েছ এবং তোমার উপকার আমি মান্য করেছি। তার কাছে আমি বারংবার আত্মসমর্পন করি যে অন্যের জন্য পীড়া ভোগ করে। যে অন্যের উপকারকে স্বীকার করেনা সে কি করে জগতে কুলীন হতে পারে? অতঃপর উক্ত নারী বলতে লাগলো, "হে সূর্য, তুমি এসে আমার সঙ্গে একই রাশিতে স্থিত হয়ে নিত্য যাত্রা পথে চল।" কুমার উত্তরে বললো, "সূর্যতো চন্দ্রমার রাশিতে কখনও আসেনা, কেননা সূর্য আস্তাচলে গেলেই চন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়।" কুমারী বললো, "দু'দিন অবধি আমরা এক স্থানে রয়েছি। তুমি আমার পুরুষ এবং আমি তোমার ছায়া।" রূপমিনী এভাবে অনেক মিনতি করলো তখন কুমারের মনে তার প্রতি স্নেহ জাগলো। সে ভাবলো, "মন যদি আমার শুদ্ধ থাকে তা হলে এর বাক্যে দোষতো কিছুই দেখিনা।" একথা ভেবে কুমার মুগ্ধা রমণীর শয্যায় বসলো।"[১১৩]

কুমারী বললো, "তুমি কখনই যোগী হতে পারোনা, আমি শপথ দিয়ে তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তোমার নাম কি? তোমার গৃহ কোথায়? কি কারণে তুমি যোগী বেশ ধারণ করেছ?' কুমার বললো, "আমিতো শত জন্মের যোগী, সিদ্ধিলাভের জন্য পুনঃ পুনঃ জন্ম নিচ্ছি।" কুমারী বললো, "তুমি মিথ্যা বলছো। সত্য বলছোনা, তোমাকে আমি তার শপথ দিচ্ছি তুমি যার অনুরক্ত।" কুমার বললো, "আমি যোগের কথাই আজীবন বলছিনা। তুমি আমার অনুরক্তের কথা বলে শপথ দিয়েছ তাই বলছি। আমার জীবন একটি নারীর প্রতি অনুরক্ত এবং তার জন্যই আমি যোগীর বেশ ধারণ করেছি।"[১১৪]

কুমার বললো, "তুমি শপথ না দিলে আমি জীবন-ভর তোমাকে কথার মর্ম বলতামনা। তুমি যা জিজ্ঞেস করেছ সে-কথা এখন বলছি। যার প্রতি আমি অনুরক্ত হয়েছি সে-কাহিনী আমি তোমাকে বলছি। আমার পিতা একজন মহৎ রাজা, তাঁর গঢ় চন্দ্রগিরি অত্যধিক উত্তঙ্গ। আমার পিতার নাম গণপতি দেব এবং আমি সূর্য বংশোদ্ভূত। কাঞ্চনপুরে মৃগাবতী রাণী বাস করে তাঁকে দেখে আমি বিভ্রান্ত হয়েছি। কুমারী বললো, "আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি তাকে কি করে দেখলে? সে তো তোমার নিকটে

ছিলোনা। স্বপ্নে দেখে কেউতো কারো প্রতি অনুরক্ত হয়না। সম্প্রত্যক্ষ হলেইনা অনুরাগ জাগে।"[১১৫]

কুমার বললো, "একদিন আখেটে গিয়ে হরিণী রূপিণী মৃগাবতীকে আমি দেখেছিলাম। সে ছিলো সাত বর্ণে সুরঞ্জিত, আমি ভ্রমিত হয়ে তার পশ্চাতে ধাবিত হলাম। কিন্তু তাকে ধরতে পারলাম না। তার সন্ধানে সরোবরের তীরে তপস্যা করলাম। এক বছরের তপস্যায় ঋষি, গণ-গন্ধর্ব এবং দেবতা প্রসন্ন হলেন। তখন তার দেখা পেলাম। সে সরোবরে সখীদের নিয়ে স্নান করতে এলো। প্রথমবার তাকে আমি ধরতে পারিনি কিন্তু দ্বিতীয় বর্ষে তার বস্ত্র অপহরণ করে তাকে ধরতে পারলাম। চীর অপহরণ করে তাকে হাতে পেলাম এবং পাঁচ মাস পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে ছিলাম। সে কথা দিয়েছিলো আমার সঙ্গে থাকবে কিন্তু সে তার বচন রাখেনি। সে উড়ে চলে গেল। তার প্রতি আমার চিত্ত অনুরক্ত ছিলো তাই তার জন্য আমি যোগীবেশ ধারণ করেছি। সে নারীই আমার জীবন, সেই আমার ভোজন এবং সেই আমার আধার।" এ-কথা রূপমিনীর মনে প্রভাব বিস্তার করলো। সে মনে মনে বললো, "এমন কুলীন পৃথিবীতে কেউ নেই যে প্রেমের জন্য জীবন বিসর্জন দেয়। এ-তার মাতা-পিতা এবং স্বজন-বান্ধব সবাইকে ছেড়েছে এবং প্রেমের অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে অঙ্গারে পরিণত হতে স্বীকৃত হয়েছে।" চার প্রহর পর্যন্ত এরা দু'জনে কথা বলে বলে রাত্রি অতীত করলো। এর পর প্রভাত হল।[১১৬]

রূপমিনী বিবাহ খণ্ড

যখন ভানু উদীয়মান হল এবং প্রকাশ পেল, রূপমিনীর সন্ধানে সবাই বেরিয়ে পড়লো। ক্রন্দনরত রাজা অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে চন্দনকাষ্ঠ নিয়ে অগ্রসর হলেন। তিনি বললেন, "গিয়েতো তার অস্থিমাত্র দেখবো সেগুলো সংগ্রহ করে অগ্নিদাহন করবো।" এভাবে নিরাশাযুক্ত রাজা অগ্রসর হলেন কিন্তু দৈবের কার্যক্রমতো কেউ জানেনা। দৈব এক নিমেষে যে জয়ী হতে যাচ্ছে তাকে সংহার করে, আবার মৃত্যুতে যে গত তাকে মনুষ্যরূপে জীবন্ত করে। যখন রাজা নিরাশ হয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, তখন তিনি রূপমিনীর বেঁচে থাকার সূচনা পেলেন। লোকজন বলছিলো, "কুমারী জীবিত আছে এবং তার সঙ্গে কোনও এক অন্য ব্যক্তি আছে।"[১১৭]

রাজা এ-কথা শুনে দৌড়ে এলেন, এবং রাক্ষসকে মৃত দেখে প্রসন্ন হলেন। সম্মুখে দেখলেন, স্পষ্টই দেখলেন কে এক দ্বিতীয় ব্যক্তি তার কন্যার পাশে রয়েছে। রাজাকে দেখে কুমারী ভাব-বিভোর হল এবং কুমারের সঙ্গ ছেড়ে উঠে এলো। রাজা কুমারীকে আলিঙ্গন করলেন যেমন করে জননী প্রথম জন্মের পর সন্তানকে বক্ষে ধারণ করে। যেন সে নবীন রূপে অবতীর্ণ হয়েছে এবং যে অন্যায় কার্য বিঘটিত হতে যাচ্ছিলো তা সংবৃত হয়েছে। রাজা রূপমিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে কন্যা, তুমি কি করে রক্ষা পেলে? কোন সে রাম যে রাক্ষস বধ করে সীতাকে জীবন দান করলো।"[১১৮]

কুমারী বললো, "দেখ, এই সে রাম যে দৈত্য নিধন করেছে এবং তার বিধ্বংস ঘটিয়েছে।" রাজা তার গ্রীবা বন্ধন করে তাকে পান অর্পণ করলেন এবং দেখলেন যে যুবক ক্ষত্রিয় এবং শূর-বংশীয়। রাজা কুমারীকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ-ব্যক্তিকে তুমি কি জান?" কুমারী উত্তরে বললো, "এ-ব্যক্তি আমার চেয়েও উচ্চ মর্যাদার এবং সংসারে বিখ্যাত সূর্য বংশের সন্তান। এর পিতা একজন মর্যাদাবান রাজা এবং তিনি চন্দ্রগিরির পতি। "দেবরায় তখন মনে মনে বললেন, "এখন একে কিছু জানতে দেবনা। আমার গৃহে পুত্র নেই, আমি আমার দুহিতা দিয়ে একে পুত্ররূপে গ্রহণ করবো।"[১১৯]

রাজা বললেন, "হে কুমার, তুমি যোগবস্ত্র পরিত্যাগ কর এবং সমস্ত যোগবস্ত্র আলিয়ে দাও। আমি চাই আমার রাজ্য-পাটের অর্ধেক তোমাকে দিই এবং তার পরিবর্তে তুমি জাগতিক কর্মবৃত্তে জেগে উঠ"। কুমার উত্তর করলো, "তুমি একজন রাজা এবং রাজ-কুলের মধ্যে একজন সম্মানিত ব্যক্তি। আমিতো একজন যোগী মাত্র, আমার তো কোনও লালসা নেই। রাজ্যপাট দিয়ে যোগী কি করবে? যে যোগ সাধন করে, সে ভোগকে গ্রহণ করেনা। যোগী যে-পর্যন্ত না সিদ্ধি লাভ করে সে-পর্যন্ত সে এক স্থানে অচল থাকেনা। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি গোরক্ষ পাদ প্রাপ্ত হচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যোগবেশ পরিত্যাগ করবোনা। যোগী জঙ্গম দীন-দরিদ্র হয়। এজন্য কোনও বস্তুর প্রতি আমার মোহ নেই, কোনও কিছুর স্বাদ গ্রহণেও আমার আগ্রহ নেই।"[১২০]

রাজা যোগীকে অনেক প্রলোভন দেখালেন, কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত যোগী কোন প্রকারেই প্রলুব্ধ হচ্ছিলোনা। রাজার মনে ক্রোধ জাগলো, তিনি মনে মনে ভাবলেন, "একে বন্দীগৃহে আবদ্ধ করবো যেন সে পালিয়ে না যেতে পারে এবং এমন ব্যবস্থা নেব যেন সে তার স্থানে ফিরে না যেতে পারে।" কুমার এদিকে মনে মনে বলছিলো, "আমার ভুল হচ্ছে। যদি সত্যিই ইনি আমাকে বন্দী করেন তা'হলে আমি কি করবো? ভাবছি যদি কোথাও চলে যাই, স্বপ্নেওতো তার দেখা পাবনা! এখনতো আমি পাথরের নীচে পড়েছি, কোনও না কোন উপায়তো বের করতেই হবে। রাজা যা বলছেন, তাই মেনে নেওয়াই আপাততঃ ভালো। আমি যদি এর কথা না শুনি, তবে আমি এমন দুঃখে পড়বো যে তার থেকে মুক্তির উপায় থাকবেনা। দিন দশেক এখানে থাকি, তদনন্তর অনুসন্ধান করে তার পথে পা বাড়াবো।" প্রকাশ্যে বললো, "হে রাজন, তোমার যা আদেশ হবে এবং তোমার চিত্তে যে ইচ্ছা জাগবে তা' আমি পূর্ণ করবো। আমার কি যোগ্যতা আছে যে তোমার নির্দেশ অমান্য করি। তোমার কথায় আমি যোগের বেশ-বিন্যাস পরিত্যাগ করছি।" যোগ-পরিচ্ছদ সে পরিত্যাগ করলো এবং যোগতন্ত্রকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করলো। যখন তাকে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করানো হল তার অপার রূপ স্ফুট হল। তদনন্তর রাজা কুমারকে হাতির পিঠে আসীন করালেন।[১২১]

দেশ তথা নগরের জন-সম্প্রদায় রাজকুমারকে দেখবার আগ্রহে দৌড়ে এলো। তারা বলতে লাগলো, "ইনি হচ্ছেন রাম যিনি রাবণকে হত্যা করে সীতাকে উদ্ধার করেছেন।

ইনি সেই রাম যিনি বালীকে হত্যা করেছেন, ইনি সেই কৃষ্ণ যিনি কালীয় দমন করেছেন। ইনি সেই ভীম যিনি হাস দিয়ে কীচক বধ করেছেন এবং ইনিই দুঃশাসনের ভুজদ্বয় উৎপাটন করেছেন। ইনিই শংখাসুর এবং হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করেছেন। এর জননী একে জন্ম দিয়ে ধন্য হয়েছেন।" জনগণ অক্ষত পুষ্প এবং তাম্বুল নিয়ে কুমারের ভুজবলের পূজা করলো। তারা বললো, "রাত্রি-তুল্য সে-জননীর গর্ভ ধন্য যেখানে সূর্য-তুল্য অনন্য পুরুষের উৎপন্ন হয়েছে।" ১২২

যে চাঁদ অর্থাৎ রূপমিনী অমাবস্যায় (রাক্ষস কর্তৃক) গৃহীত হয়েছিলো, সে এখন সূর্যের সঙ্গে অর্থাৎ কুমারের সঙ্গে প্রকাশিত হল। সমস্ত দেশ এবং কুটুম্বগণ সামনে এলো এবং ধ্যানগত নেত্রপাতে কুমারীকে দেখতে লাগলো। জনসাধারণ এবং কুটুম্বে গৃহ ভরে গেল যেন রূপমিনী আজই অবতীর্ণ হয়েছে। তারা সবাই কুমার এবং রূপমিনীকে অভ্যর্থনা এবং সাদর সম্ভাষণ জানালো। ঘোড়া, রেশমী বস্ত্র, সোনা এবং চাঁদী অগণিত ভাণ্ড ভরে তারা উপঢৌকন দিলো। তারা সবাই বলছিলো, "যেভাবে রাজা নিরাশ ছিলেন, সে-রকম নিরাশ যেন কেউ না থাকে, এবং যেভাবে তাঁর আশা পূর্ণ হয়েছে সেভাবে যেন সকলেরই আশা পূর্ণ হয়।" ১২৩

রাজার চিত্তে আনন্দ জাগছিলো কিন্তু কুমারের মন থেকে চিন্তা দূর হচ্ছিলোনা। সে ভয় পাচ্ছিলো মনে মনে, যদিও প্রকাশ্যে হাসছিলো ও কথা বলছিলো। তার হৃদয়ে আগুনের তাপ ছিলো তাই তার ছিলো নিরুদ্ধ শ্বাসের অবস্থা। আগুনের ঔষধতো সকলেরই জানা কিন্তু কোন ঔষধিই তার কাজে আসছিলোনা। পানি সিঞ্চন করলেইতো আগুন নেভে কিন্তু এর চিত্তের আগুন নির্বাপণের জন্য সমুদ্র আনতে হবে। কিন্তু সমুদ্রতো তার চিত্ত দাহনে জ্বলে যাচ্ছে, সমস্ত গগন জ্বলে যাচ্ছে এবং পাতালে বাসুকীও জ্বলতে জ্বলতে বেচে গিয়েছে। যাকে সে কামনা করছে সে যদি প্রাপ্য না হয় তাহলে অগ্নিশিখা নখাগ্র পর্যন্ত স্পর্শ করবে। এ-বিরহের অগ্নিতে বসুধা জ্বলন্ত হবে এবং কেউ রক্ষা পাবেনা। ১২৪

রাজা মনে মনে বললেন, "এর গুণের পরীক্ষা করতে হবে। গুণের পরিচয় পেলেই এর মর্ম অনুধাবন করতে পারবো। যদি যথার্থই এ রাজপুত্র হয়ে থাকে তাহলে এর মধ্যে সকল সদগুণের সম্পূর্ণতা থাকবে।" বিভিন্ন ক্রীড়ায় কুমার অংশ নিল, জুয়া খেলায় প্রতিপক্ষকে হারিয়ে দিল, কৌড়ি খেলায় সুদক্ষতা প্রমাণ করলো। বুদ্ধিসাগর এবং চৌবল্কী খেলায় তার সমকক্ষ কেউ ছিলোনা, দোবল্কী খেলায়ও সে অভিজ্ঞ ছিলো। সে সকল প্রকার খেলায় চাতুর্য প্রকাশ করলো। রাজা তখন মনে মনে বললেন, "অন্যান্য বিষয়েও এর গুণ পরীক্ষা করবো তাহলেই আমার প্রতীতি হবে।" ১২৫

চৌগান খেলায় নিযুক্ত হয়ে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে সকলকে বিস্মিত করে অসাধারণ তীব্রতায় সে গোলক নিক্ষেপ করলো। গাছের সূক্ষ্ম পাতাকে বিদ্ধ করে সফলতার সঙ্গে প্রথম প্রয়াসেই তীর নিক্ষেপ করলো। রাজা তখন তাকে বন্য জন্তু শিকার করতে

আদেশ করলেন। কিন্তু কুমারতো বাণ নিক্ষেপে পারধী বা সুদক্ষ ছিলেন। সে কেশরী-সদৃশ উৎফুল্লতায় বাণ নিক্ষেপ করলো। রাজা মনে মনে প্রবলভাবেই হর্ষিত হলেন এবং ভাবলেন, "দৈব আমাকে সহায়তা করেছে, আমি যে-রকম চেয়েছিলাম, সে-রকমই পেয়েছি। এ বালকতো যমের তুল্য শক্তিশালী।" ১২৬

রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি পাঠ এবং গণনা জান?" এ-প্রশ্ন করেই তিনি ষড়ভাষার সাহিত্য এনে উপস্থিত করলেন। তার মধ্যে ছিলো সংস্কৃতের অর্থ পঞ্চাশিকা, সূর্য সারিণা, মর্কটী চতুরাশীতি। কুমার মহাভারত, পিঙ্গল এবং অমরকোষেরও জ্ঞান রাখতো। সে এ-গুলোর অর্থ এবং সঙ্গতি ব্যাখ্যা করলো। সে শালিহোত্র এবং কোককোকের রিতি রহস্য পাঠ করলো। কোনও অংশই সে বাদ দিয়ে পড়লোনা। অসাধারণ পাঠক বলে সে নির্ধারিত হলো। সে ভাগ্য গণনা করতে পারতো, অপার কথনের অধিকার তার ছিলো এবং আর্যা গণনা করতে পারতো। সে স্ত্রী-চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিলো, বৈদ্য কর্মও সে জানতো এবং সর্বাঙ্গ রূপে সঙ্গীত বিষয়ে জ্ঞাত ছিলো। গণ-গন্ধর্বের অনেক বিদ্যাই সে জানতো এবং চতুর্দশ বিদ্যার নিদান করতে পারতো।১২৭

রাজা সব কিছু দেখে মনে মনে বিচার করলেন "একেতো এ যথার্থরূপে কুল-শুদ্ধ, দ্বিতীয়তঃ এ রূপবান ক্ষত্রিয়। সুতরাং এ-নিশ্চয়ই রাজবংশীয়। সদবংশের না হলে কেউ গুণবান হয়না।" রাজা তখন বললেন, "এখন আমি এর সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে পারি। জানিনা এর জাতি কি কিন্তু আমি সে-প্রসঙ্গ তুলবোনা।" রাজার মনে বিবাহের চিন্তাই প্রধান ছিলো যখন কুমার অন্যপক্ষে চিন্তা করছিলো কাঞ্চনপুরের কথা। কুমার তার মনের কথা কাউকেই বলছিলোনা কেবল যোগী এবং জঙ্গমদের কাছে কাঞ্চনপুরের পথের সন্ধান জিজ্ঞেস করছিলো। কুমার দিন রাত সন্তপ্ত ছিলো, শ্বাস ফেলছিলো এবং দৈবের কাছে প্রার্থনা করছিলো, "আমাকে কেউ যেন কৃতঘ্ন না বলে, আমি আমার প্রদত্ত বচন ভঙ্গ করবোনা।"১২৮

বিবাহের তিথি গণনা করে তৎসম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য সুনিশ্চয় করা হল। দেশের লোকজন আমন্ত্রিত হয়ে এল। অপার নিমন্ত্রণ হল। চারি প্রকার ব্যঞ্জনভেদ এবং ছত্রিশ প্রকার রন্ধন প্রক্রিয়া ঘটলো। ব্যঞ্জনের জন্য বায়ান্নটি পাত্র এবং অন্যান্য খাদ্যসম্ভারের জন্য চৌরাশী ভাণ্ড পরিপূর্ণ হল। মুখরোচক আচার ছিলো, গরিষ্ঠ অন্ন ছিলো। বিচিত্র বস্ত্র বিছানো হল যেখানে লোকেরা পংক্তিতে বিভক্ত হয়ে বসে পড়লো। লোকেরা আহার করছিলো যেখানে ছয় রস এবং পঞ্চামৃতের স্বাদ ছিলো। মিষ্ট, লবণযুক্ত, লঘুপাচ্য, টক, তিক্ত এবং কসযুক্ত ষটরসের খাদ্য ছিলো। আরও ছিলো দুগ্ধ, দধি, মাংস, মাসকলাই তথা সমস্ত পঞ্চামৃতের পদার্থ।১২৯

ভোজনের পর সকলে তৃণ-শলাকা দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করলো। হস্তধৌতের পর তারা পান গ্রহণ করলো। জনসাধারণ বিদায় নেবার পর ব্রাহ্মণগণ এলেন এবং মণ্ডপের তলে আসন গ্রহণ করলেন। রাজন্যবর্গদের রীতি এবং প্রথা অনুসারে সর্বপ্রকার আচার অনুষ্ঠিত

হল। সোনার সিংহাসন এবং ছত্র সজ্জিত হল এবং সেখানে মুকুট পরিহিত কুমার আসন গ্রহণ করলো। রূপমিনী জয়মালা হাতে নিয়ে কুমারকে পরিয়ে দিলো। ব্রাহ্মণগণ বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে কুমার এবং রূপমিনীর নামও উচ্চারণ করছিলেন। জন্ম-পত্রিকা বিচার করে তাঁরা বলছিলেন, "কুমারীর জীবন সপত্নীর সঙ্গে কাটবে।"১৩০

রাজা তখন ব্রাহ্মণদের হাত দিয়ে কুমার এবং কুমারীর গ্রন্থি-বন্ধন করলেন। তিনি বললেন, "কাকের কর্কশ বাক্য চিনতে শিখবে এবং জম্বুক ও উল্লুকের ডাকও বিচার করে চলবে। কিন্তু আমি জানি, কুমার জ্ঞানবান এবং পণ্ডিত। সুতরাং ভাল-মন্দ ভেদ সে নিশ্চয়ই জানে। প্রার্থনা করি সৃষ্টিকর্তা যেন এর দাবী পূরণ করেন এবং এরা যেন স্নেহ কথায় পরিপূর্ণতা পায়।" সকল প্রকার কুল-রীতি তথা কুলাচার পালন করা হল। রাজা এত উপঢৌকন দিলেন যা পৃথিবীতে কেউ ধারণা করতে পারেনা। তিনি বললেন, "আমার অর্ধেক রাজ্যপাট এবং ভাণ্ডার গ্রহণ কর এবং দশ সহস্র বৎসর পর্যন্ত তা ভোগ কর।"১৩১

শয়ন-মন্দির পরিচ্ছন্ন করে শয্যা বিছানো হল এবং উভয়ে হর্ষভরে শয্যায় গিয়ে বসলো। কুমার রমণে আগ্রহী ছিলোনা, সে মনে মনে ক্রন্দন করছিলো এবং তার কথা স্মরণ করছিলো যাকে সে হারিয়েছে! মনে মনে সে বললো, "আমার মনের ভাব তাকে বুঝতে দেবনা। এমন সব কথা বলে তাকে ভুলাবার চেষ্টা করবো যাতে তার প্রতীতি হয়। আমি এক বর্ষ পর্যন্ত কথা বলে একে ভুলিয়ে রাখতে পারি। স্ত্রী-চরিত্র আমি যে-রকম জানি তাতে একে ভুলিয়ে রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হবেনা। আমি কোমল মধুর কথা বলবো কেননা কঠোর বাক্য বললে স্নেহ হবেনা। এমন ভাবে কথা বলবো যাতে এ সুনিশ্চয় হয় যে আমি তাকে কামনা করি। কমলিনী যখন বুঝবে যে রসবেধ হয়েছে, ভ্রমর তখন উড়ে যাবে।"১৩২

কুমার রসপূর্ণ বাক্য বলতে লাগলো। সে বললো, "তুমি আমার প্রাণাধার। আমি মৃগাবতীর চেয়ে তোমাকে অধিক সুন্দরী পেয়েছি, সে-কারণে আমার মন-চিত্ত ধাবিত হয়ে তোমাকে আশ্রয় করেছে। মনে হচ্ছে আমি যেন ইমলী বা তেঁতুলের সন্ধানে এসে আম্র পেয়েছি। আমি কন্যা বা বাজনার সিঁড়ি চেয়েছিলাম কিন্তু পেলাম সোহারী পুরিয়া। তোমার সমতুল্য স্ত্রী আমি কোথাও দেখিনি। যে মুহূর্তে তোমাকে দেখেছি সে-মুহূর্ত থেকেই তোমার প্রেমে আকুল হয়েছি।" এমনভাবে কুমার কথাগুলো বললো, কুমারী ভাবলো যে কুমার সত্য কথাই বলছে। কুমারের মন ছিলো কপটতাপূর্ণ, বচন ছিলো সরল এবং চিত্ত ছিলো মৃগাবতীর প্রতি অনুরক্ত।১৩৩

সুবুধা ত্যাগ খণ্ড

ক্রীড়া-কৌতুকে নিশা অবসান হল, কুমার স্নান করতে গেল। স্নান করে বস্ত্র পরিবর্তন করলো এবং হাতে তাম্বুল নিয়ে ভাগ্যবান কুমার হাঁটতে লাগলো। সে রাজসভায়

গিয়ে বসলো, তার আসন দেখে লোকের মনে হল যেন প্রকাশ যুক্ত চন্দ্র। কুমার আসন গ্রহণ করতেই রাজা গৌরবিত হয়ে গেলো যে রাজপুত্র রূপে মুরারি বা কৃষ্ণ-সদৃশ ছিলো। সে বললো, "আমি এখানে ধর্মশালা তুলবো এবং পথিকদের সম্মান করবো। যোগ, জঙ্গল, তপস্বী, যতী এবং সন্ন্যাসী যে কেউ আসবে, এবং যারাই আসবে তারাই সেখানে ভোজন পাবে।"[১৩৪]

একটি সুন্দর ধর্মশালা নির্মাণ করালো যেখানে যোগী, জঙ্গম এবং পথিক আসতে লাগলো। কুমার সকাল থেকে পুষ্প এবং কর্পূর বিতরণ দিতো এবং বহু উপাচার দিয়ে তাদের ভোজন করাতো। যোগী, যতী এবং সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে কুমার দেশ-বিদেশের সমাচার জিজ্ঞেস করতো। তাদের সঙ্গেই সে বসতো এবং কাঞ্চনপুরের নাম জিজ্ঞেস করতো। কেউ নিশ্চিত সমাচার দিতে পারতোনা, সে-কারণে তার হৃদয় পীড়িত ছিলো। তার সমস্ত শরীর এবং মন ছিলো রূপমিনীর কাছে। মুখে যে বচনই সে বলুক না কেন, তার চিত্ত ছিলো পবনের সঙ্গে যুক্ত এবং তার দৃষ্টি ছিলো চন্দ্র বা মৃগাবতীর মার্গ পথে।[১৩৫]

এদিকে রূপমিনী মনে মনে চিত্তে বিচার করলো, "কুমারের মন আমার সঙ্গে নেই। মুখাগ্রের কথায় সে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছে, তার চিত্ত রয়েছে অন্যত্র এবং শরীর মাত্র আমার এখানে।" একথা ভেবে রাণী খাটের পায়া ধরে পড়ে রইলো। এ-সংবাদ শুনে কুমারের মুখ শুকিয়ে গেল। সভা ছেড়ে সে রাজভবনে এলো। কুমারকে দেখে কুমারী মৌন থেকে খাটের পায়া ধরেই পড়ে রইলো। কুমার দেখলো যে সে রোষে জলছে। রূপমিনী দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলো এবং ক্রন্দন করছিলো। কুমার তখন তার আঁচল ধরলো। তার বুক ফেটে যাচ্ছিলো এবং ক্ষণকালের জন্যও তার ধৈর্য বাঁধ মানছিলোনা।[১৩৬]

কুমার বললো, "হে বালিকা, তুমি কেন ক্রন্দন করছ? তুমিতো আমার প্রাণাধার। আমিতো আমার চিত্ত এবং মন তোমার সঙ্গে যুক্ত করেছি এবং তোমার অতিরিক্ত অন্য কাউকে মান্য করছিনা। আমি তোমার জন্য আমার জীবন ছিন্ন-ভিন্ন করেছি এবং দৈব আমাকে সিদ্ধি দিয়েছিলো বলেইতো আমি দৈত্যকে হত্যা করতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমি পরদেশী এবং ভিখারী। তুমি আমার উপর অভিমান কোরনা।" কুমারী উত্তর করলো, "হে কুমার, তুমি আমার সঙ্গে চতুরতা করছো। এতদিন আমাকে যা বুঝিয়েছ আমি মেনেছি। কিন্তু আমি ধূর্ত চরিত্র চিনি এবং চতুরতাও কিছু কিছু জানি। তোমার বাস বা ঘর এখানে কিন্তু তোমার চিত্ত অন্যত্র উড়ে চলেছে।"[১৩৭]

কুমার বললো, "তুমি যদি বল তাহলে হাত উঠিয়ে আমি দিব্য করতে পারি অথবা সর্পকে জাগিয়ে তার বুকের উপর হাত রাখতে পারি অথবা কূপের মধ্যে তৃণ নিক্ষেপ করি অথবা আরও ভালো হয় আমি যদি জলন্ত চিতায় পা ফেলি।" রূপমিনী যেমন যেমন প্রবোধ বাক্যে ভুলবে, তেমন তেমন বাক্য কুমার বলতে লাগলো, এবং গৃহিনী সঙ্গতিতে তাকে পান খাওয়ালো। পান খাইয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং বললো, "আমি

তোমাকে মৃগাবতীর চেয়েও সুন্দরী পেয়েছি।" এভাবে প্রবোধবচন বলে ঘরের বাইরে এসে কুমার দ্বারপ্রান্তে এক যোগীকে বসে থাকতে দেখলো। কুমার জিজ্ঞেস করলো, "কোন দেশ থেকে তুমি যাত্রা করেছ এবং তুমি কোন গুরুর শিষ্য?" সে উত্তর করলো, "আমার গুরু হচ্ছেন বৃষনাথ এবং আমি গোরখপুর থেকে এ-খেলা খেলছি। আমার সঙ্ঘ হচ্ছে যোগীদের সঙ্ঘ। আমার ব্যাঘ্র চর্মাসন আমাকে নিয়ে চলেছে গোদাবরীর দিকে। আমি জানি আমার গোরখ গুরু আমার সঙ্গে আছেন। আমি জানিনা কে সিদ্ধি লাভ করবে এবং সিদ্ধিপ্রাপ্তিতে কার সৌভাগ্য ঘটবে?" কুমার গোষ্ঠি বা বার্তালাপ করে জানতে চাইলো, "তুমি কি কাঞ্চনপুরের স্থিতি জান?" সে উত্তর করলো, "এখান থেকে কাঞ্চনপুর কিছুটা দূর হবে। মাঝে এক তরঙ্গিত সমুদ্র পড়বে। সমুদ্র অতিক্রম করলে একটি কজ্জলী বন পড়বে যা কূপের মতো অন্ধকার এবং যেখানে কোনও পথ নেই। যদি তুমি সত্য পূর্বক চল তাহলে চলতে চলতে মার্গ পাবে। তোমার সত্য তোমার সাথী হবে এবং ব্যাঘ্র অথবা সিংহ তোমাকে ভক্ষণ করবেন।" ১৩৮

কুমার যোগীকে বললো, "আমাকে তোমার কন্থা বা বস্ত্র দাও এবং তার বিনিময়ে তুমি যা কিছু চাইবে তাই পাবে।" কুমার তাকে অনেক ভিক্ষা দিল, এবং পরিবর্তে যোগীর সমস্ত সজ্জা নিল। শিকারের বাহানা করে সে পথে চললো এবং খেলবার ভান করে চলতে লাগলো। চলতে চলতে সকল থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো এবং তার সঙ্গে কোন মনুষ্যই রইলোনা। ঘোড়াকে ছেড়ে দিয়ে আপন বস্ত্র পরিত্যাগ করে যোগীর বস্ত্র পরিধান করলো। সে ভোগকে ছেড়ে যোগী হল। বারবার পিছনে তাকিয়ে সে দেখছিলো কেউ আসে কিনা। এভাবে চলতে চলতে সে সাগরের তটপ্রান্তে এসে একটি নৌকোকে যেতে দেখলো। ১৩৯

সে তার আধারী বা পুটুলি থেকে কিছু দ্রব্য কেটে বা মাঝিকে দেবার জন্য বের করে কোমরের কাপড়ে গুছে রাখলো। কুমার বললো, "হে স্বামী, আমাকে তুমি মোক্ষ দিয়েছ। আমি বন্ধনে আবদ্ধ ছিলাম, তুমি সে-বন্ধন থেকে আমাকে মুক্ত করেছ।" স্রোতে ধাক্কা খেয়ে নৌকো যখন এগিয়ে যাচ্ছিলো তখন সে মনে মনে বলছিলো, "ভাগ্য ভালো যে পালাতে পেরেছি।" চলতে চলতে সূর্য যখন অস্ত গেল, রাত্রি এলো। বাদলের রাত্রি ছিলো এবং ভাদ্রপদের ষষ্ঠ তিথি ছিলো। দীর্ঘ অথবা লঘু যে-রকমেরই পা হোক না কেন একমাত্র মূর্খই ঘরে বসে থাকে। কিন্তু এ নিগোড়া বা অভাগা বসে থাকতে পারেনা কেননা তার চিত্তে এক তিলও শান্তি নেই। নখ থেকে শিখ পর্যন্ত প্রেমের দুঃখ-দাহনের কারণে সে বিরহ-সন্তাপের অগ্নির মধ্যে জ্বলছে। ১৪০

কুমারের সঙ্গীরা যারা পিছনে পড়েছিলো তারা নিজেদের মধ্যে বলছিলো, কুমার শ্বাপদের সঙ্গে রয়েছে। জিজ্ঞেস করতে করতে পথ চলি, জানিনা কুমারের কেন দেরী হচ্ছে। পথ চলতে চলতে তারা কুমারের ঘোড়াকে দেখতে পেল। নিজেদের মধ্যে বলাবাল করলো, "কুমারকেতো বাঘে খেয়েছে।" কিন্তু তাদের মধ্যে একজন বললো, "যদি বাঘ

বা সিংহ তাকে খেয়ে থাকে তবে কিছুনা কিছু চিহ্ন থাকবে।" কুমারকে যখন পেলনা তখন তারা সন্তপ্ত হল। সন্তাপ করতে করতে তারা প্রত্যাবর্তনের পথে চললো এবং বলতে লাগলো, "প্রত্যাবর্তন করে কি ফল হবে? দেবরায় যখন জিজ্ঞেস করবেন তখন তাকে কি উত্তর দেব?" ১৪১

লোকেরা ফিরে এসে এ-কথাই বললো অর্থাৎ কুমারকে বাঘে খেয়েছে এমন কথাই বললো। রাজা শুনলেন, রূপমিনীও শুনলো। রাজা অচক বা স্তম্ভিত হলেন, তার মুখে বাক্য এলোনা। সে-সুখ তাঁর চলে গেল যা তিনি সহজে পেয়েছিলেন। এ-খবর শুনে রূপমিনী তুষারাবৃত লতার মতো হল অথবা যেন কমলিনী লতা হেমন্ত ঋতুতে জ্বলে গিয়েছে, অথবা যেন কোনও প্রকারে রৌদ্র লেগে শুকিয়ে গিয়েছে এবং তার পরিমল ভগ্ন বা বিনষ্ট হয়েছে। অথবা যেমন পানি না পেলে কমল শুকিয়ে যায় তেমনি এ-সংবাদ শুনে রূপমিনী প্রভাহীন হল। সে মনে মনে বললো, "মালতী লতাকে ত্যাগ করে ভ্রমর অন্য কোনও লতার কাছে গিয়েছে। কিন্তু যে-ক্ষেত্রে আমার কোনও দূষণ নেই সে-ক্ষেত্রে সে কেন আমাকে ত্যাগ করলো? যোগী এবং ভ্রমর স্থির থাকেনা। এদের সঙ্গে আজীবন মিত্রতা করা চলেনা। ভ্রমর পরিমলের জন্য ঘুরে বেড়ায় এবং যোগী যোগতন্ত্রের জন্য ঘুরে বেড়ায়। এরা উভয়েই পৃথিবীতে কৃতঘ্ন বলে গণ্য। এদের কারো প্রতিই মোহ হওয়া উচিত নয়। যোগী হচ্ছে তৃণ কর্তনকারী শুকপাখীর মতো, ভালো হয় যদি কেউ তাকে হত্যা করে। যা ভাগ্যে লিখিত ছিল তাই হয়েছে। সে-ভ্রমর কমলকোষরূপী আমার হৃদয়ে ছিদ্র করে আমার মায়া মমতা ত্যাগ করে চলে গিয়েছে। যে-দিন বিধাতা আমাকে নির্মাণ করেছেন সে-দিনই তিনি আমার কপালে কর্মফল লিখেছেন। সাত স্বর্গ পর্যন্ত পলায়ন করবার চেষ্টা করলেও ললাটের অঙ্ক মুছে যায়না।" ১৪২

রজনী কালের জন্য যে তার বেশ পরিবর্তন করেছিলো সকাল হতেই কালরূপ হয়ে সে-সূর্য পুনঃ উদিত হল। কুমার দিনকরকেই তার সঙ্গী করেছিলো, অন্য কাউকে নয়। কোনও মনুষ্যের সামনে সে কোনও কথা বলছিলোনা। তার শরীরে বিরহ ছিলো যে-কারণে জ্বলে জ্বলে সে খাক হচ্ছিলো, তার উপর সূর্য তাকে অধিকতর দগ্ধ করছিলো। যে সঙ্গী, তাকেতো আমরা সুপখর জন্য সঙ্গী করি, কিন্তু সেই যদি জ্বলতে থাকে তবে তাকে সঙ্গী করে কি লাভ? কাল বন সামনে এলো, তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে কুমার তার সঙ্গী সূর্যের কাছ থেকে বিদায় নিলো। কুমারের জন্য প্রজ্বলন্ত সূর্যই ছিলো সঙ্গী যাকে সে পরিত্যাগ করলো। সে-বনে অন্ধকার এত অটল এবং প্রগাঢ় ছিলো যে এক হাত অন্য হাতকে দেখতে পেতনা। ১৪৩

কুমার ঠিক করতে পারছিলোনা যে কোন দিকে যাবে। সে পাগলের মতো বনের মধ্যে ঘুরতে লাগলো। বাঘ, সিংহ, হাতী, নীলগাই কেউ তাকে পথ দেখাচ্ছিলোনা, কেউ তাকে খেয়েও ফেলছিলোনা। সে মনে মনে বলছিলো, "প্রেম হচ্ছে বিষ-পূরিত সর্প, হাতে দণ্ড থাকলেই তার হাত থেকে বাঁচা যায়। সে-ই বুদ্ধিমান যে প্রেমের খেলা খেলেনা, যারা খেলে তারা প্রেম-সর্পের মুখে পড়ে। প্রেম করলে দুঃখ পেতে হয় এজন্য

না করাই ভালো। প্রেম করতে গিয়ে যে সুখ কামনা করে তাকে মূর্খ বলতে হয়। দৈব যা করবে তাই হবে। আমি তাই কাউকে না জিজ্ঞেস করেই পথ চলছি।" বনে এক পা অগ্রসর হওয়াই কঠিন ছিলো কেননা সর্বত্র সঘন অন্ধকার পরিব্যাপ্ত ছিলো। তখন রাত ছিলো না দিন ছিলো বলা অসম্ভব ছিলো কেননা চন্দ্র অথবা সূর্য কোনও কিছুই দেখা যাচ্ছিলোনা। এভাবে অপরিসীম দুঃখে ত্রিশ দিন বনে কাটলো, এবং এমন দুঃখই তা ছিলো যা জগতে অন্য কেউ ভোগ করেনি। দময়ন্তীর বিরহে নলও এ-প্রকার দুঃখে পতিত হয়নি, এবং পিঙ্গলার বিরহে ভর্তৃহরির কথাও এতটা দুঃখপূর্ণ ছিলোনা। সকল প্রকার অনুরাগই অজ্ঞানপনা, এ থেকে বিরক্ত থাকাই ভালো। ভাগ্য লিখে থাকলে সাপের মুখ থেকেও আঙ্গুল সরিয়ে আনা যায়। ১৪৪

গড়রিয়া বা মেষ-চারক খণ্ড

চলতে চলতে বনের প্রান্ত দেখা দিল এবং উজ্জ্বলতায় জনবসতি চোখে পড়লো। কুমার ছাগ এবং মেষ সামনে দেখলো এবং মনে মনে বললো, "কেউ না কেউ এদের সঙ্গে নিশ্চয়ই আছে।" আরও একটু এগিয়ে গিয়ে একজন গড়রিক বা মেষ-চারক দেখলো। কুমার বললো, "হে স্বামী, ভালই হল। এখন দু-একদিনের মধ্যে মনুষ্য বসতিতে উপস্থিত হব। সেখানে গিয়ে কাঞ্চনপুরের পথ জিজ্ঞেস করবো এবং যে দ্বীপে তার অবস্থান হবে সেখানকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করবো।" মেষ-চারক মনুষ্য দেখে দৌড়ে এলো এবং কপটাচরণের মধ্যে "অতিথি, অতিথি" বলে কুমারকে সম্বোধন করলো। ১৪৫

সে কুমারকে বললো, "আজ তুমি আমার আতিথ্য গ্রহণ কর। আমি তোমার ভুক্তি বা ভোজন দিতে চাই এবং তোমার পদসেবা করতে চাই। অনেক দিন পর বান্ধব বা অতিথি এসেছে এবং এ-আমার ভাগ্য যে আমি এক যোগীকে অতিথি পেয়েছি। অদ্য তুমি আমার গৃহে নিবাস করবে, আগামী কাল তোমার কথা শুনবো। যে-পথে তুমি যেতে চাও সে-পথ আমি দেখিয়ে দেব এবং তোমার সঙ্গে পথ-প্রদর্শক দেব, যে তোমাকে সেখানে নিয়ে যাবে।" কুমার যখন এ-কথা শুনলো তার অনেক আনন্দ হল। মেষ-চারক তাকে সঙ্গে নিয়ে চললো। যেহেতু বিশ্বাসঘাতকতা করবার অভিপ্রায় তার ছিলো, তাই কথা-বার্তায় কুমারকে সে ভুলিয়ে ফেললো। ১৪৬

আগে আগে মেষ-চারকের রূপে ধূর্ত লোকটি চলছিলো, পিছনে পিছনে যোগী নিভ্রম রূপে চলছিলো। কুমারকে নিয়ে সে এক গুম্ফতার মধ্যে প্রবেশ করলো এবং নিজে বেরিয়ে গিয়ে ঢাকনি দিয়ে গুহার মুখ বন্ধ করলো। কুমার বিস্মিত হল, এবং ভাবলো যে মেষ-চারক তাকে কেন ধোঁকা দিল? গুহার চতুর্দিকে তাকিয়ে সে দেখলো যে সেখানে আরও মনুষ্য আছে। সে তাদের জিজ্ঞেস করলো, "তোমরা কে এবং কোথায় থাক? তোমরা তো অসম্ভব মোটা এবং চলৎশক্তিহীন। কি খেয়ে তোমরা এমন মোটা হলে? তারা বললো, "মোটার কথা কি বলছো? আমাদেরে পাগল বানিয়ে রেখেছে। এক ঔষধি আমাদেরে খাইয়েছে যা খেয়ে আমরা চলৎশক্তিহীন হয়েছি।" ১৪৭

একথা শুনে কুমারের রক্ত শুকিয়ে গেল। সে মনে মনে বললো, "আমি সুখের জন্য এসেছিলাম কিন্তু বিরাট দুঃখের মধ্যে পড়লাম। ভালো আতিথ্যইতো পেলাম। আমাকে কোনও ভোজন দেয়নি, বরঞ্চ মনে হচ্ছে আমাকেই আহার করতে চায়। নিত্য নিত্য এ-রকম আতিথ্য যদি কেউ পায়, তবে সেতো তার সর্বস্ব খোয়াবে। এ-রকম আতিথ্যের আকাঙ্ক্ষা যদি কারো থাকে তবে সে যে মেষ-চারকের ঘরে আসে। এতো খাবার দেয়না, খাবার চায় তথা স্বর্গে যাবার পথ দেখিয়ে দেয়। ভগবান করুন অন্য লোকের ভাগ্যে সে যা ঘটিয়েছে তার ভাগ্যেও তা ঘটুক এবং সে যে-ভাবে পথিককে পথ দেখাচ্ছে, সে-ভাবে সেও যেন স্বর্গের পথে যায়। আমি দুঃখের গঙ্গা পার হয়ে ভেবেছিলাম তটপ্রান্তে এসেছি কিন্তু আমি এখানে গভীর কুণ্ডের মধ্যে পড়েছি যেখানে চক্রাকারে আবর্তিত হব কিন্তু বেরুতে পারবোনা। এ-চক্রতো আমাকে ছাড়বেনা, তাইতো সে দরজা বন্ধ করে পথে বাঁধাস্বরূপ হয়ে বসে রয়েছে। পথ নেই রাম এবং লক্ষ্মণের মতো সঙ্কটের মধ্যে স্থিতি ঘটেছে সীতাকে মহিরাবণ যখন হরণ করেছিলো। সে অবস্থাই এখন আমার। মহিরাবণ পথে ফম-কর্তরী রেখেছিলো, আর এতো দ্বারমুখ বন্ধ করে রেখেছে। রাম-লক্ষ্মণকে হনুমান বলপ্রয়োগ করে মুক্ত করেছিলো কিন্তু আমার একমাত্র সম্বল আমার নিজের বল এবং তাও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"[১৪৮]

এ-কথা বলে সে সন্তাপ করতে লাগলো কিন্তু তার চিত্তে মুক্তির কোনও উপায় উদ্ভাবিত হলনা। সে মনে মনে বলতে লাগলো, "সমুদ্রের তরঙ্গ থেকে দৈব আমাকে উদ্ধার করেছে, সর্পের হাত থেকে সৃষ্টিকর্তা আমাকে মোক্ষ দিয়েছে। দৈব সিদ্ধি দিয়েছিলো বলেইতো আমি রাক্ষস সংহার করতে পেরেছিলাম, রাজ-পাট ছেড়েছিলাম এবং বস্ত্রাদি পুড়িয়েছিলাম। পুনরায় অন্ধকার বনে বিরাজ করেছিলাম, এবং বন থেকে নির্গত হয়ে মনুষ্য দেখে মনে মনে বলেছিলাম, আমি জীবন পেয়েছি। সে-মনুষ্যই বিশ্বাসপাত করে এমন স্থানেই আমাকে আবদ্ধ করেছে যেখানে নিশ্বাস নেওয়া যায়না। এখান থেকে মুক্তির কোনও আশা নেই। এখানে আমি যমের জন্য উপঢৌকন হয়েছি যে কারও কথাই মান্য করবেনা। কৌরবরা যখন পাণ্ডবদের অপহরণ করেছিলো, তখন ভীম গিয়ে তাদের উদ্ধার করেছিলো। আমারতো সে-রকম কোনও সেবক-বান্ধব নেই, তাই আমি দু'হাত যুক্ত করে হে দৈব তোমাকে স্মরণ করছি। আমি দৈবের কাছে এ মিনতি করছি, দৈবকে ছেড়ে অন্য কাউকে স্মরণ করবোনা। দৈবকে স্মরণ করতে করতে যা হবার তাই হবে, অন্য কাউকেই আমি স্মরণ করবোনা কেননা এ-পৃথিবীতে কেউতো কারোই নয়। অথবা আমি স্মরণ করছি মৃগাবতীর স্নেহকে যার জন্য আমি দারুন এবং শিরোপরে বৃষ্টিপাত সহ্য করেছি। আমার জন্য সুদিনের সমাধি ঘটেছে বটে কিন্তু আমার চিত্ত তার সঙ্গেই জড়িয়ে রয়েছে। সে-মিত্রের জন্য যদি প্রাণ দেওয়া যায় তবে সে-প্রাণও পবিত্র হয়। মৃত্যুতে আমার কোনও ভয় নেই কেননা প্রেমের পথে মৃত্যু ঘটলে সমস্ত পাপ মুছে যায়। স্নেহের জন্য যে জীবন দেয় উভয় জগতেরই ধর্ম সে কিনে নেয়। সে সত্যকেই সুর এবং দেব দেখে যা একটি জীবনকে মিত্রের জন্য পরিচ্ছন্ন করে। যদি সত্য আমার সঙ্গে থাকে তা হলে সিদ্ধি হবেই, দুর্জন এবং ধূর্ত কেউ কিছুই করতে

পারবেনা। সত্য যার সঙ্গী হয় সে এক মহৎ সঙ্গীকে পায়। আমি সত্যকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি তাই সত্য নিশ্চয়ই এ-সঙ্কটের স্থিতি থেকে আমাকে মুক্ত করবে। আমি সে-মহৎ সত্যের নাম জপ করছি।[১৪৯]

গুহার ভিতরের মানুষগুলো এতক্ষণ রাজকুমারকে দেখছিলো। তারা বললো, "আমাদের এক যুক্তি শোন। তোমাকে কোনও ভাবে জীবিত থাকতেই হবে। যতক্ষণ না তুমি ঔষধি খাচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের বুদ্ধি গ্রহণ কর। দানবটি এখনই আমাদের একজনকে ধরে আগুনে পুড়িয়ে খাবে। খেয়ে সে ঘুমিয়ে পড়বে। সে-সময় তুমি তার জীবনকে সমাপ্ত করতে পার। যতক্ষণ সে ঘুমিয়ে থাকবে ততক্ষণ লৌহশলাকা আগুনে তপ্ত করে তার দুচোখে বিদ্ধ করবে।" কথা সমাপ্ত হতে না হতেই দানবটি ভিতরে ঢুকে একজন মানুষকে ধরে ঘাড় ভেঙ্গে আগুনে ঝলসিয়ে খেতে লাগলো। দেখে কুমার স্তম্ভিত হল। আহার শেষ করে সে শুয়ে পড়লো এবং কুমার সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলো। সে অগ্নির মতো লোহাকে তপ্ত করে দানবটির দু'চোখে বিদ্ধ করলো। দানবটি ভীষণ চীৎকার করে কুপিত হয়ে কুমারকে ধরবার চেষ্টা করলো। কুমার তাকে লক্ষ্য করে বললো, "হে মিত্র, এতদিনতো বহু অতিথি সৎকার করলে, এখন আর তোমার দ্বারপ্রান্তে কেউ আসবেনা।" দানবটি দ্বারপ্রান্ত রুদ্ধ করে প্রহরায় বসে রইলো কিন্তু দু-দিন পর মেষ চরাবার জন্য দ্বার মুক্ত করতে হল। প্রতিটি মেষকে সে হাত দিয়ে পরখ করতে লাগলো। কুমার এবং অন্যান্য মনুষ্য কয়েকটি মেষকে হত্যা করে তাদের চামড়ায় দেহ আবৃত করে অন্যান্য মেষের সঙ্গে গুম্ফল থেকে বেরিয়ে এলো। বেরুবার সময় কুমার প্রার্থনা করলো, "হে দৈব স্বামী এবং সৃষ্টিকর্তা, আমাদের মোক্ষ দাও।"[১৫০]

কুমার আবার পথে চললো, কাউকে মার্গ-অমার্গ ভালো-মন্দ কিছুই জিজ্ঞেস করলোনা। মনুষ্য দেখে তাদের নিকটে গেলনা, দূর থেকে সরে মনে মনে বললো, "দৈব তুমি আমার জীবনে যথেষ্ট কুচাল এনেছ, নবীন রূপে নির্মিত করে পুনঃ আয়ু প্রদান করেছ। যেভাবে তুমি আমাকে মোক্ষ দিয়েছ সেভাবেই প্রেম-পাত্রকে এনে দাও। দু'হাত জুড়ে তোমার বন্দনা করছি, "হে বিধাতা, আমার একটি মাত্র যাচ্ঞা, যার কারণে দুঃখ সহ্য করছি তাকে আমার প্রাপ্ত কর।"[১৫১]

সিংহকে দেখলে যেভাবে মৃগী দ্রুত পলায়নপর হয় সে-ভাবেই কুমার বার বার পিছন ফিরে দেখে ছুটে চলছিলো। কোনও মৃগী সঙ্গী হারা হলে যেমন হয় অথবা কোনও শিকারীর ফাঁদ থেকে মুক্ত হলে যেমন হয়, কুমারও তেমনি সজাগ হয়ে চলছিলো, ক্ষণকালও স্থির থাকছিলোনা এবং মনুষ্য দেখে তার নিকটে যাচ্ছিলোনা। আপন প্রিয়তমার কথা স্মরণ করে সে পথ চলছিলো। এভাবে চলতে গিয়ে সামনে একটি ভবন তার চোখে পড়লো। দিনকর অন্ধকারে অস্তগমন করছিলো এবং চন্দ্র তার প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করছিলো। কুমারের কাছে রাত্রিকে সুন্দর এবং শীতল মনে হল। সে মনে মনে বললো,

"আজ রাত এ-স্থানে অবস্থান করি। আরও চার প্রহরের নিশার দুঃখ-সুখ প্রিয়তমার পথে মিলিয়ে দেব।" ১৫২

যখন কুমার উক্ত ভবনে এলো, সেখানে মনুষ্য এবং পক্ষী কাউকেই দেখলোনা। সে মনে মনে বললো, "এতো আশ্চর্য ব্যাপার মনে হচ্ছে। এখানে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি কিছু দেখা যায় কিনা। এটা কার ভবন? এখানে কি কেউ আছে? লুকিয়ে অপেক্ষা করবো না শুয়ে পড়বো?" এত সব কথা যখন সে ভাবছে তখন সেখানে চারটি অপূর্ব কবুতর উড়ে এল। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে চারটিই বেশ পরিবর্তন করে সুন্দরী স্ত্রীর রূপ ধারণ করলো। তদনন্তর তারা দুটি শব্দ উচ্চারণ করলো, সঙ্গে সঙ্গে শয্যা চলে এলো। এমন ভাবে এলো যে ধারণাও করা গেলনা কে শয্যা আনলো আর কেই-বা সে-গুলো বিছালো। তদনন্তর স্ত্রীরা মন্ত্র উচ্চারণ করে সঙ্কেত করতেই চারটি ময়ূর নাচতে এলো। এরা মাটিতে লুটিয়ে পুরুষ রূপ ধারণ করলো এবং শয্যায় বসে পারাবত থেকে পরিবর্তিত স্ত্রীদের চুম্বন করলো। তাদের উরোজের সঙ্গে আপনাদের বক্ষ লগ্ন করলো এবং আলিঙ্গন অর্পণ করে তাদের অঙ্গমর্দন করতে লাগলো। এভাবে সীৎকার করে, কূজন করে, হাস্যকৌতুকে এবং ক্রীড়ায় রাত্রির চার প্রহর ব্যতীত করতে লাগলো। খেলায় এবং হাসিতে তাদের রাত্রি ব্যতীত হল এবং কুমারের সমস্ত রাত্রি শঙ্কায় বিনষ্ট হল। সকাল হতে না হতেই তাদের ধারণ বা দূত এসে সংবাদ দিল, "তোমরা এখানে বসে রয়েছ। ওদিকে যে গড্ডরিক মেষ চরাতো কি করে সে যেন অন্ধ হয়ে গেছে।" ১৫৩

কুমার যদি এ-সব দেখে উৎত্রস্ত হত, তাহলে সে নিজের ক্ষতি করতো। তাই কুমারের মনে চিন্তা জাগলো। এক নিমেষ পর্যন্ত সে বিহ্বল হয়ে রইলো, তদনন্তর সে সেই ভ্রান্তির স্থান ত্যাগ করে পালিয়ে গেল। সে দ্রুত বেগে পালাতে লাগলো যেমন করে গড্ডরিকের ভয়ে পালাচ্ছিলো। অগ্র-পশ্চাৎ দেখে সে পলায়ন করছিলো। এভাবে সে অনেক দূর চলে গেল। সূর্য তপ্ত হল এবং তার শরীরে রৌদ্র লাগলো। সে এক সুন্দর বৃক্ষ দেখে মনে মনে বললো, "কিছুক্ষণ এর ছায়ায় বিশ্রাম নিই।" যখন সে বৃক্ষের ছায়ায় বসলো তখন পবন প্রবাহিত হচ্ছিলো। ১৫৪

মৃগাবতী-কৃত প্রতীক্ষা খণ্ড

যখন মৃগাবতী প্রত্যাবর্তন করলো, তার সখীরা দৌড়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগলো। তারা প্রশ্ন করলো, "সখী, সে কে ছিলো যে তোমাকে দেখে তোমার বসন অপহরণ করলো? কি কারণে সে তোমার বসন নিয়েছিলো? কোনও সম্বন্ধ ছাড়া কেউতো ক্ষীরোদক গ্রহণ করেনা। তুমি আমাদের কাছ থেকে কেন দূরে থাকছো? তোমার শপথ, তুমি সব কথা আমাদের বল। মৃগাবতী হেসে উত্তর করলো, "বলছি শোন, আমিতো এখন লুকিয়ে নেই, এখন আমি স্পষ্ট ভাবেই সব বলবো। যেদিন তোমাদের সঙ্গে নিয়ে সরোবরে স্নান করতে গেলাম, তোমরা স্নান শেষে অগ্রবর্তিনী হয়ে ঘরে ফিরে এলে এবং

আমি ভুলে পিছনে পড়ে রইলাম। আমি অগ্রসর হচ্ছিলাম, তখন এক কুমারকে দেখলাম এবং আমার জীবন তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে সংলগ্ন হল যেমন করে চিত্রপটে চিত্র সংলগ্ন হয়। আমি মৃগের রূপ ধারণ করে তাকে দেখতে লাগলাম এবং আপনাকেও তার চোখে দৃশ্যমান করে পালিয়ে এলাম। সে আমাকে দেখে জুহার বা শব্দ করে আমাকে ধরবার চেষ্টা করলো কিন্তু আমি ধরা দিলামনা, উপরন্তু তার মনে বিয়োগের সঞ্চার করলাম। আমি মানসসরোবরে বিলীন হলাম যে-সরোবরে তোমরা স্নান করতে গিয়েছিলে। কিন্তু আমি প্রাণ ধারণ করতে পারছিলামনা, আমি তার প্রতি লুব্ধ হয়েছিলাম। তাই একটি উপলক্ষ্য করে তোমাদেরও সেখানে আবার সাথী করে নিয়ে গিয়েছিলাম। স্নান করবার সময় তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এ-মন্দির কার? আমি মনে মনে বললাম, এ-মন্দির সেই নির্মিত করিয়েছে, যে আমার জন্য রাত-দিন অপেক্ষা করে পথ দেখছে।১৫৫

আমরা স্নান করে ঘরে ফিরে এলে কুমারকে তার ধাত্রী মন্ত্র দিল, 'যদি তুমি আকাশ পর্যন্তও অনুসন্ধান কর তাকে পাবেনা যে-পর্যন্ত না তার চীর অপহরণ কর। ধাত্রীর পরামর্শে কুমার আমার চীর অপহরণ করলো এবং আমাকে তার ক্ষীরোদক পরতে দিল। আমার বস্ত্র এমন স্থানে সে লুকিয়ে রাখলো যেখান থেকে তা পাওয়া দুষ্কর ছিলো। সে রসবার্তায় আমাকে বললো, "এখন আমরা রঙ্গ-রস করবো এবং আমি নারঙ্গ ও বেলের সুবাস নেব অর্থাৎ কুচ-যুগের স্পর্শ নেব।" উত্তরে আমি তাকে বললাম, "তুমি যদি তোমার কাম্য লাভের জন্য শক্তি প্রয়োগ কর তাহলে আমি জীবন রাখবোনা।" অতঃপর আমি তাকে বললাম, "তুমি আমাকে বলপূর্বক দখল করেছ, যদি আরও বল প্রয়োগ কর তাহলে আমি প্রাণ দেব কিন্তু যদি মধুর রসে আমাকে গ্রহণ করতে চাও, তাহলেই আমি তোমার সেবা করবো।" সে হাত সঙ্কুচিত করে বললো, "আমি রমণের ইচ্ছায় সাড়া দেবনা।" তখন আমি বললাম, "আমার সখীদের আসতে দাও এবং তাদের কাছ থেকে আমাকে চেয়ে নাও। তখনই আমাকে শয্যায় রসপূর্বক রমণ করতে পারবে।" আমার কথা তখন সে মেনে নিলো এবং শয্যা-বাসর কামনা করলোনা। পাঁচ মাস পর্যন্ত আমরা এভাবে এক সঙ্গে থাকলাম যেভাবে সূর্য তেজ-পূর্বক দীপ্ত থাকে।১৫৬

এ-সময় তার পিতা তাকে ডেকে পাঠালো। সে যখন আমাকে ছেড়ে পিতার সান্নিধ্যে গেল তখন আমি অবকাশ পেলাম। সে তার ধাত্রীকে আমার কাছে রেখে গিয়েছিলো। তাকে আমি কথাবার্তায় ভুলিয়ে ফেললাম এবং কোনও কাজের বাহানায় অন্যত্র পাঠিয়ে দিলাম। ইত্যবসরে আমার বস্ত্র খুঁজে নিলাম এবং ধারণ করলাম। ধাত্রীকে আমার পিতার নাম দিলাম, কাঞ্চনপুরের নাম দিলাম এবং বললাম, কুমারকে বলতে যদি আমার প্রতি তার প্রেম থাকে তাহলে যেন কাঞ্চনপুর আসে। আজও তার অপেক্ষায় আমি আছি। যা মর্ম ছিলো তা আমি বললাম। তার উপর আমি এতটা লুব্ধ যে তা ভাষায় বর্ণনা করা যায়না। তাই আমি এতদিন কিছুই বলিনি।" সখীরা বললো, "এই যদি ঘটনা তাহলে তখনইতো আমাদের বলতে পারতে। ওদের মধ্যে একজন খুবই বুদ্ধিমতী ছিলো এবং প্রেমের খেলায় সুনিপুণা ছিলো। তদুপরি সুন্দর কথাও বলতে

পারতো। সে বললো, "হে ভ্রান্তিযুক্তা, তুমি প্রেমের কিইবা জান? আমি তোমাকে প্রেম-রসের বার্তা শুনাবো। অমৃত মহারসের সাহায্যে প্রেম-সম্পর্কে এমন ভাবে আকৃষ্ট করবে যে দেহ-দিগন্ত ছেড়ে সে আর কোথাও যাবেনা। সেই প্রেমের স্বাদ পায় যে আপনাকে বিলুপ্ত করে। শুধুমাত্র মুখের উচ্চারণে প্রেমের হর্ষ এবং রস সৃষ্টি হয়না, যে জীবন দান করতে পারে সেই প্রেমকে পায়। প্রেমের সুমহান অট্টালিকা অনেক উত্তুঙ্গ, দুঃখ ছাড়া প্রেমকে যে কামনা করে সেতো বাতুল। প্রেমের খেলা যে খেলবে জীবনের মোহ তাকে ছাড়তে হবে।" কুতবন বলছে, "প্রেমের কঙ্কুরা অত্যন্ত উত্তুঙ্গ। যতক্ষণ না শিরোদেশকে মাটিতে স্থাপন করে দুঃখদাহনে অগ্রসর না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রেম খণ্ডিত থাকবে।"[১৫৭]

সখী আরও বললো, "তুমি তার সঙ্গে প্রীতি স্থাপন করতে পারনি। প্রেমের প্রসঙ্গে তুমি কেন অজ্ঞ রইলে? যখন কোনও বেপথু মৃগী ফাঁদে পড়ে, তখন শিকারী কি তাকে ছেড়ে দেয়? সেইতো উন্মাদ যে হাতের বস্তুকে ছেড়ে দেয়। প্রেমের ভাবনায় কেউতো স্থির থাকতে পারেনা। যেখানে প্রেম সেখানেই দুঃখ। সে-দুঃখকে সঞ্চিত করে রাখতে হবে। আমি এখন তার সন্ধানে যাব। যদি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার জীবন থাকে শীঘ্রই প্রিয়তমকে পাবে।" মৃগাবতীর বুকে এমনিতেই অগ্নিদাহন ছিলো, এখন জলন্ত প্রদীপে তেল পড়লো। প্রেম অত্যন্ত কঠিন খেলা, বুদ্ধির সঙ্গেই এ-খেলা খেলতে হয়।[১৫৮]

মৃগাবতী বললো, "প্রেম উৎপন্ন হতেই আমার মনে ক্ষোভ জেগেছিলো, প্রেমের মর্ম এখন আমি তোমার কাছে শুনলাম। যদি তুমি আমার কোনও উপকার করতে চাও তাহলে প্রয়াণে প্রস্তুত আমার প্রাণকে সংযত কর।" সখীরা তখন মৃগাবতীকে বলতে লাগলো, চার এক দিন আরও তোমাকে দুঃখার্তা থাকতে হবে। আম শুকিয়ে গেলে আর পাকতে পারেনা। দশ দিন বুঝে-সুঝে চল এবং আপনাকে সংযত রাখ। আমরা ইতিমধ্যে তোমার উপকারের জন্য উপায় করি। তখনই হংস দময়ন্তীর সঙ্গে নলের মিলন ঘটাবে এবং সুখপূর্ণ সময় নির্মাণ করতে পারবে।[১৫৯]

রূপ-মুরারিদের জন্য এতটা দুঃখক্ষোভই পর্যাপ্ত ছিলো। তিনি পৃথিবী থেকে প্রয়াণ করলেন এবং ইন্দ্রসভায় যোগ দিলেন। এদিকে তার প্রজারা সভা ডেকে মন্ত্রণা করলো, মৃত রাজার কোনও পুত্র নেই যাকে রাজ্যভার দেওয়া যায়। এখন আমরা কাকে রাজতিলক দেব? মহৎ লোকেরা তখন মনে মনে সিদ্ধান্ত নিল, মৃগাবতীকে রাজ্য দেওয়া যেতে পারে। তারা তখন মৃগাবতীর কপালে রাজতিলক লাগিয়ে তাকে নমস্কার করলো এবং রাজ্যের ভার দিলো। তদনুসারে যতদূর পর্যন্ত প্রজা এবং ভৃত্যরা ছিলো, তারা স্ব স্ব কার্যে নিযুক্ত হল।[১৬০]

মৃগাবতী সকল দেশে পুণ্যধর্মের শাসন প্রবর্তন করলো। একটি সুন্দর ধর্মশালা নির্মাণ করলো। সেখানে যত সব যোগী-জঙ্গম আসতো তাদের সকলের জন্য ভোজন এবং

জলের ব্যবস্থা হল। সে নির্দেশ দিল, যে-সব পথিক পায়ে হেঁটে এখানে আসবে আমার সঙ্গে তাদের দর্শনের ব্যবস্থা করবে। এভাবে যোগী, যতী, সন্ন্যাসী যাঁরাই এলো মৃগাবতী সকলকেই নিকটে ডেকে কথা শুনতো। নানা কথার পর চন্দ্রাগিরির কথা তাদের কাছে জানতে চাইতো। এ-ভাবেই খোঁজ-খবর নিতে নিতে দিন চলে যেতে লাগলো, আশা-লুব্ধ হয়ে সে জিজ্ঞাসাবাদ করছিলো যদি কোনওক্রমে কুমারের সন্ধান পাওয়া যায়।[১৬১]

এদিকে কুমার বৃক্ষছায়ায় বসে আপন মনে বলছিলো, "এখন চলি। আর কতটা সময় বসে থাকবো?" চলতে গিয়ে তার দৃষ্টি বৃক্ষ শাখায় দুটি সাখীর উপর পড়লো যারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিলো। তারা সরস প্রেম কথা বলছিলো এবং কুমার তা বুঝতে পারছিলো। তারা পরস্পরে বলছিলো, এক কুমার মৃগাবতীর প্রতি অনুরক্ত। সে এতদিন যত দুঃখ পেয়েছে তা কাগজ এবং মসির সাহায্যে লিখে শেষ করা যাবে না। আর দু'একদিন শেষ হলেই সে অশেষ সুখের সন্ধান পাবে। তার বিপক্ষ সঙ্কট কেটে গেছে এবং এখন তার মনে শান্তি আসবে।[১৬২]

একথা শুনে কুমারের এত আনন্দ হল যে ভাষায় বলা যায়না। যেন পিপাসার্ত মৃত্যু মুহূর্তে পানি পেয়েছে, অথবা কোনও প্রেমীর প্রেম-ক্ষতের উপর ঔষধি পড়েছে। অথবা কোনও দরিদ্র যেন লক্ষ্মী বা সম্পদ পেয়েছে। সে ক্ষণে ক্ষণে হর্ষিত হচ্ছিলো এবং আনন্দকে আপন অঙ্গে সমাবৃত রাখতে পারছিলোনা। ততক্ষণে পাখী দুটি উড়ে যাচ্ছে। কুমার মনে মনে বিচার করলো, "যে পথে পাখীরা উড়ে যাচ্ছে আমি সে পথেই যাব।" তদনুসারে আকাশ পথে দৃষ্টি রেখে কুমার দৌড়ুতে লাগলো। মনে হল কামের দহন অসহ্য হবে বিবেচনা করে পাখীরা তাকে দ্রুত পথ প্রদর্শন করছে।[১৬৩]

চলতে চলতে সে এক পথ দেখলো, ভাবলো, "এ-পথ দিয়েই চলবো। সামনে এক লখরাউ বা বিরাট বাগান চোখে পড়লো, তাতে সে ভাবলো, এখানে নিশ্চয়ই কোনও গ্রাম হবে। ক্ষণে-প্রতিক্ষণে সে আনন্দে বিভোর হচ্ছিলো, ভাবছিলো এটাই হয়তো কাঞ্চনপুর। প্রবিষ্ট হয়ে বাগানের শোভা দেখতে লাগলো যেখানে পংক্তি পংক্তি বৃক্ষরাজি দৃশ্যমান। কোথাও ঝরে পড়া পাতার বা ঘাসের চিহ্ন ছিলোনা, ভূমি এত পরিচ্ছন্ন যেন রূপার আস্তরণ দেওয়া হয়েছে। কোথাও তা উঁচু ছিলোনা, কোথাও নীচু নয়। এক এক বৃক্ষের জন্য চার চার পাঁচ পাঁচ মালি ছিলো।[১৬৪]

পৃথিবীর যেখানে যত রকমের বৃক্ষ আছে সবই সে-বাগানে ছিলো। এত ধরনের বৃক্ষ যে বর্ণনা করে শেষ করা যায়না। যার নাম কখনও কানে শুনিনি তার বর্ণনা কি করে করা সম্ভব? বাগানের অভ্যন্তরে পুষ্পকুঞ্জ ছিলো অনেক যেখানে পুষ্পিত মালতী, বেলী, গুল্লালা, সেবতী এবং চম্পক-মল্লিকা শোভা পাচ্ছিলো। যেখানে জুহী, নিবারী এবং করণা ফুল ফুটেছিলো এবং মালতীর সুবাসে মধুকর ভ্রমিত হচ্ছিলো। সোনজর্দ, নাগকেশর এবং জুহী অপূর্ব বিন্যাসে প্রস্ফুটিত ছিলো। এ-সমস্ত ফুলের বিস্তার দেখে সে তন্ময় হয়ে পড়লো।[১৬৫]

যেখানে কেতকী আছে, সেখানে পাটল আছে আবার করণ ফুল আছে। কোন ফুলের কাছে যাবে বুঝতে না পেরে ভ্রমর বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কারও না কারও প্রেমে বন্দী হয়ে তাকে মরতেই হবে। চামেলী বলছিলো, ভ্রমরের সঙ্গে যদি আমি রমণ করতে পারি তবে নাগেশ্বরের শিরোদেশে ফুল ছড়াবো অথবা নাগকেশরও প্রফুল্লিত হবে। ভ্রমরকে দেখে ভূমি-চম্পা লজ্জিত হয়ে ভূমিতে লুণ্ঠিত হয়ে রইলো, ভ্রমরের সঙ্গে হোলী খেলবার জন্য কুব্জা এবং গুল্লাল পুষ্পিত হল। ভ্রমরের সঙ্গে খেলা চলছিলো কর্ণিকার এবং চম্পা নিকরের। কর্ণিকাতো সাধারণ ফুল নয়, ভ্রমরের কাছে সে সুরতরু। ফুল এবং ভ্রমরের কৌতুক দেখে কুমার আত্মবিস্মৃত হচ্ছিলো। সে মনে মনে বললো, "মধুকরের জীবন ধন্য কেননা পুষ্প-সুবাসে সে অচৈতন্য হয়ে থাকে।" ১৬৬

উদ্যানটি এত সুন্দর এবং মনোমুগ্ধকর যে তার শোভা চোখেই দেখা যায়, বর্ণনা করা যায়না। উপরে সকল ফুলের এবং পরিমলের কথা বলা হয়েছে কিন্তু সুবাসহীন পুষ্প-শোভাও সেখানে ছিলো। সুন্দর দল এবং সুন্দর রূপের কারণে ভ্রমর ভ্রান্তিতে তাদের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। অনেক পুষ্প ছিলো যাদের নাম কেউ জানেনা। এই অপূর্ব উদ্যানের পুষ্পকুঞ্জ দেখতে দেখতে কুমার স্তম্ভিত ও বিহ্বল হয়ে রইলো। যে-সমস্ত ফুল কবিরা দেখেছেন এবং বিবিধ কাব্যে গণনা পেয়েছে সে-সব পুষ্পের বিষয়ে আমি প্রামাণিক রূপেই সব কথা বললাম কিন্তু জগতে আরওতো পুষ্প আছে যে-গুলো কাব্যে আসেনি তাদের নাম কে বলতে পারে? ১৬৭

কুমার আরও অগ্রসর হয়ে লক্ষ্য করলো রহট যন্ত্রের সাহায্যে আম্রকুঞ্জের পানি সিঞ্চন করা হচ্ছে। সে নগরের অট্টালিকা শোভা যখন দেখলো তখন অবাক হয়ে দেখলো যে সবই সুবর্ণ নির্মিত। তখন সে মনে মনে বললো, "এটাই কাঞ্চনপুর। আমার চিত্ত-চোর এ-নগরেই আছে, আমি চিহ্ন পেয়েছি সে এ-স্থানেই আছে। সে মনে মনে শপথ বাক্য উচচারণ করে ভাবতে লাগলো, "আর সে যাতে পালয়ে যেতে না পারে সে-ব্যবস্থা আমাকে করতেই হবে।" সে ভাবলো, "লোকজনকে জিজ্ঞেস করে দেখি এ-নগরের নাম কি? যদি সত্যিই এটা কাঞ্চনপুর হয় তাহলে এখানে মৃগাবতীকে খুঁজে বের করবো। সামনে কূপের কাছে এক পলিহারিণ আছে, তাকে জিজ্ঞেস করি এ নগরের স্বামী কে? কূপের কাছে এসে সুন্দরী পলিহারিণকে দেখে সে মুগ্ধ হল, বললো, "যে দেশের পলি-হারিণ এত সুন্দরী, সে-দেশের রাজকুমারী যেন আরও কত সুন্দরী! যেন সিংহল দ্বীপের পদ্মিনী-সদৃশা লাবণ্যবতী।" কুমার জিজ্ঞেস করলো, "এ-নগরের নাম কি? এবং এর রাজ্যেশ্বরী কে?" রমণী উত্তর করলো, "এ রাজ্য মৃগাবতীর এবং এর নাম কাঞ্চনপুর, যা হচ্ছে জগতে সূর্যতুল্য। যতী এবং সন্ন্যাসীদের এদেশে অনেক সম্মান।" ১৬৮

কাঞ্চনপর আগমন তথা পুনর্মিলন খণ্ড

মৃগাবতীর নাম উচচারিত হতেই সে এমনভাবে হর্ষিত হল যেন মাধবানল কামকন্দলাকে পেয়েছে। মৃগাবতীর নাম শুনে সে প্রসন্ন হল যেন নল দময়ন্তীকে পেয়েছে। সে মনে

মনে বললো, "এখন আমি নগরে যাব, হয়তো সেখানে এমন কাউকে পাব যে আমার সমাচার মৃগাবতীকে দেবে।" অগ্রসর হয়ে যখন কুমার নগরের দ্বারপ্রান্তে এলো সে দেখলো, সেখানকার ভবনসমূহ কনকপত্র এবং রত্নে সজ্জিত। নগরের ভিতরে নরেন্দ্র এবং সমৃদ্ধ মহাজন বসে রয়েছে। এবং নগরের স্কন্ধে অনেক বাণিজ্যকারক অবস্থান করছে এবং ছত্রিশ কুলজাত ব্যাপারীরা ব্যবসা করছে। সেখানকার মন্দির, ধবলগৃহ এবং দেবগৃহ দেখলে পাপ সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। ১৬৯

তদনন্তর যখন সে রাজদ্বারে এসে পৌঁছলো, তখন কুমারের পথ সমাপ্ত হল। সুরপতি সভার কথা সে যেমন শুনেছিলো, তার চেয়েও বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সভা এখানে তার দৃষ্টিতে পড়লো যেখানে অনেক গুণী বসেছিলেন। পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং রূপবানের সমাহারে রাজগৃহ উৎফুল্ল ছিলো। তারা পাণ্ডুর বর্ণের পান খাচ্ছিলো, যার সুগন্ধে সমগ্র গৃহ ভরপুর ছিলো। সমস্ত সভায় ভোগবার্তার প্রচলন ছিলো, দুঃখকথার সঞ্চরণ ছিলোনা। বিভিন্ন দেশের শাসক রাজদ্বারে আদেশের প্রতীক্ষা করছিলো এবং প্রতিহারের কানে কানে বলছিলো, "একটু পথ ছেড়ে দাও, আমি ভিতরে প্রবেশ করে বিনয় নিবেদন করি।"১৭০

এ-সব দেখে কুমারের মনে চিন্তা জাগলো, "আমার সূচনা অর্থাৎ আগমন-বার্তা রাণী পর্যন্ত কি করে পৌঁছবে, যখন রাজা এবং রায় প্রবেশ করতে পারছেনা, তখন আমি কি করে গণনার মধ্যে আসি? তদনন্তর সে বিয়োগের বার্তা বলতে লাগলো। কিন্নরী হাতে নিয়ে সে বিয়োগের গীত বাজাতে লাগলো। যারাই তার গান শুনতে পেল তারাই দৌড়ে এলো তাকে দেখতে। বিয়োগের গান শুনে সবাই অবাক হল। এ রাগিণীতে হারির আসনও দ্রবিত হয়। যারাই তার গান শুনলো তারাই আপনাকে ভুলে গেল, কারোই চেতনা রইলোনা। যার চিত্ত বজ্রের মতো কঠোর ছিলো, গীত শুনে তারও বিয়োগের অনুভব জাগলো।১৭১

সমস্ত নগর তার বিয়োগ-গীতে সন্তপ্ত হয়ে উঠলো এবং ঘরে ঘরে এ-বার্তা পৌঁছে গেল যে, এক যোগী কোথা থেকে যেন এসেছে; সে বিরহ, বিয়োগ এবং সন্তাপের রাগিণী বাজাচ্ছে। এ-বার্তা মৃগাবতীও শুনলো, "এক যোগী এসেছে, সে অনেক গুণযুক্ত।" আজ্ঞা হল, "তাকে ডেকে নিয়ে আস। জিজ্ঞেস করতে চাই, সে কোন দেশের লোক।" বিশ এক নারী উঠে দৌড়ে গিয়ে যোগীকে রাজদ্বারে আহ্বান করতে গেল। তারা বললো, "রাজ আজ্ঞা হয়েছে হে যোগী, তোমার আহ্বান হয়েছে,, তুমি দৌড়ে চল।" একথা শুনে যোগী এতটা হর্ষিত হল যে ছিন্ন কন্থায় তার শরীরকে সামলানো যাচ্ছিলোনা। ১৭২

সে মনে মনে বললো, "সম্ভবতঃ আজ আমার কর্মফল লাভ হবে। গুরু আমাকে সিদ্ধি লাভের জন্য আহ্বান করেছে। যদি সে শরৎ-শশীর মুখকান্তি দেখতে পাই তবে আমার সন্তপ্ত নেত্র শীতল হবে।" সাতটি পৌরি বা আলিন্দ অতিক্রম করে কুমার সখীদের দেখলো। মনে হল যেন চাঁদকে বেষ্টন করে তারকারাজি দেদীপ্যমান হয়েছে। অথবা

মনে হল যেন আকাশে কৃত্তিকা নক্ষত্রমালা উদিত হয়েছে অথবা সরোবরে যেন কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়েছে। যখন সে স্বর্ণ সিংহাসনে ভানু-সদৃশ মৃগাবতীকে আসীন দেখলো তখন বিহ্বল কুমারের পা সরলোনা।[১৭৩]

যোগীর মূর্ছা-গতি থেকে মৃগাবতীর মনে সন্দেহ হল। সে মনে মনে বললো, "এ আজীবন যোগী হতেই পারেনা। এ সেই রাজকুমার কেননা সে ছাড়া কে আমার সম্বন্ধে বিরহ-বিয়োগের গান গাইতে পারে?" সেবিকারা তাকে বললো, "যোগীকে উঠাও, কি করে মূর্ছিত হয়ে পড়লো? এতো রোগীও নয়?" সখীরা সকলে মিলে যোগীকে উঠালো, পানি দিয়ে তার শরীর সিক্ত করলো। তখন সে যেন জীবন ফিরে পেল। মনে হচ্ছিলো তাকে যেন সাপে কামড়িয়েছে কিন্তু সে বুঝতে পারেনি। সে এক প্রকার বেকরারী বা অচেতনতার তরঙ্গে দুলছিলো। এক মুহূর্তে সে অচেতন হচ্ছিলো, পরের মুহূর্তে চেতনায় আসছিলো এবং সে এমন অসংবৃত হয়ে পড়েছিলো যে, কেউ তাকে সংযত করতে পারছিলোনা।[১৭৪]

সখীরা বলছিলো, "এর সন্নিপাত বা অপস্মার রোগ হয়েছে, এ ত্রিদোষে পীড়িত হয়েছে অথবা আপন দুর্দশার কারণে উন্মাদ হয়েছে। অথবা কোনও দেবতা বা দানব একে ছলনা করেছে, অথবা কোনও যোগিনীর চক্রে এ পড়েছে। অথবা এ হয়তো কোনও রাক্ষস বা প্রেতকে ক্ষুব্ধ করেছে যে তার সঙ্গে এখানে এসেছে তাই তার ভ্রম দূর হচ্ছেনা। অথবা দেবী কালিকাকে এ তপ্ত করেছে এবং সুরাপান ছাড়া এর চেতনা হবেনা।" সেখানে যত বৈদ্য এবং গুণী ছিলো, ভ্রম-দোষ হয়েছে বলে তার ঔষধির কথা বললো। তারকারা অর্থাৎ সখীরা যোগীকে বললো। তারকারা অর্থাৎ সখীরা যোগীকে জিজ্ঞেস করলো, "কি কারণে তোমার মূর্ছা এলো? তোমার কি জ্বর হয়েছে না মাথা ঘুরেছে যে মূর্ছিত হয়ে পড়লে?"[১৭৫]

যোগী বললো, "মূর্ছার কথা আমি বলতে পারবোনা, কিন্তু আমি তাই দেখেছি যা দেখে আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। ভুরুর ধনুকের উপর বিষ সিক্ত এমন নেত্র-শর ছিলো যা আমার বক্ষ বিদ্ধ করেছে। প্রত্যঞ্চা বা সূতো ছাড়া কি করে সে যে তীর সাজালো বুঝে উঠতে পারছিনা। ব্যাধ যেভাবে মৃগকে হত্যা করে আমাকেও সে সে-ভাবে হত্যা করেছে। যখন হনুমান লঙ্কার গড়কে দগ্ধ করছিলো তখন রাঘবের নিকট এ-ধনুক ছিলো, যখন পাণ্ডবগণ কৌরবদের উপর বিজয়ী হয়, তখন অর্জুনের হাতে এ-ধনুকই ছিলো। পরশুরামের হাতে একই ধনুক ছিলো। পারধী বা শিকারী একই আছে, বাণও সেই একই। তোমাদের একথা বলতে আমার যন্ত্রণা হচ্ছে যে, তোমাদের স্বামী আমার প্রাণকে হত্যা করেছে।"[১৭৬]

তারকারা অর্থাৎ সখীরা বললো, "হে মতিহীন যোগী, এমন কথা বলা তোমার শোভা পায়না। গণ, গন্ধর্ব, সুর, নর এবং নাগ আমাদের স্বামিনীর দ্বার-প্রান্তে দিনরাত জাগ্রত বসে থাকে। যার ললাটে ভাগ্য এবং কর্মসাধন লিপিবদ্ধ থাকে সেই মাত্র ক্ষণকালের

জন্য তার দর্শন পায়। তুমি অত্যন্ত নীচ, তাই তুমি নিকটে এসেও এ-রকম কথা বলছো। তুমিতো ঊর্ধলোক আকাশের কথা বলছো। তুমি রয়েছ ভূমিতে আর কথা বলছো আকাশের অর্থাৎ অহমিকার। তুমি আগুনে পুড়ছো, পল্লবকে আশ্রয় করে তোমার রক্ষা হবেনা। মান এবং প্রেম ছাড়া শুধু রূপে অনুরক্ত হলে হয়না। যারা শুধু রূপে অনুরক্ত হয়, তারা দীপকে যে পতঙ্গ দগ্ধ হয় তার মতো।" ১৭৭

মৃদু হেসে কুমার বললো, "তোমরা প্রেমের খেলা খেলতে জাননা এবং না বুঝে জুয়ার চাল দাও। যে প্রেম-জ্যোতিকে দেখে আপনাকে ভুলতে জানেনা তার মাংস কাকেও খাবেনা। যে দগ্ধ হয় সেই দগ্ধীভূত হওয়ার পীড়ার সংবাদ জানে। দীপক তাকে জানে, যার শরীরে দাহণের চিহ্ন আছে। যে পানির পিপাসায় মৃত্যুকে কাম্য করে আবার মৃত্যুপথ থেকে জীবন্ত হয় সেই প্রেম-সুরা পান করতে শিখেছে। পৃথিবীতে সে ব্যক্তি বিরল যে এ-সুরার সন্ধান জানে। যে এ-রসের সন্ধান পায় সে অমর হয়; সে সমুদ্র সন্তরণ করে, পাহাড় অতিক্রম করে এবং অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যে প্রেম-সুরার আচমন করেছে সে কি না করতে পারে?" ১৭৮

যোগী যখন সিদ্ধির এত সমস্ত কথা বললো, তখন বিষাক্ত লাড়ু খেলে যেমন হয় তেমন বিহ্বল হয়ে রইলো। তদনন্তর নিজেদের মধ্যে বলতে লাগলো, "যোগী এবং ভোগীর মধ্যে কি এমন সখ্যতা অর্থাৎ আমরা ভোগী, আমরা এ-যোগীর কথা বুঝবোনা। হয়তো যার কথা রাণী প্রতিদিন বলছে, এ-ব্যক্তি সেই কুমার।" তারা মৃগাবতীর কাছে এসে বললো, "ভিক্ষুক এমন সব কথা বলছে যাতে আমরা বিস্মিত হচ্ছি। আমরা তোমাকে আমাদের বক্তব্য বলছি তুমি নিশ্চয়ই আমাদের কথা বিবেচনা করবে। যে অমৃতকুণ্ডর অর্থাৎ তোমার যৌবন পরিপূর্ণ হয়ে রয়েছে একটি কাক তার রস আস্বাদন করতে চায়। পর্বতের শিখরের মতো উঁচু বৃক্ষের শাখায় যে-ফল ঝুলছে সে-ফল পারতে চায় এমন লোক যার হাত একটি ছোটো গাছের ফলও ছিঁড়তে পারেনা অর্থাৎ যার হাত বেশী উঁচুতে পৌঁছায়না। সে সব চেয়ে উঁচু গাছের ফল ছিঁড়তে চায়।" ১৭৯

মৃগাবতী তখন নিশ্চিন্ত হল যে, এ সেই কুমার যে মৃগাবতী-রূপিনী যামিনীর ভানু। সে মনে মনে হর্ষিত হল যে কুমার এখানে এসেছে। সে বললো, "যদি এ ব্যক্তি সিদ্ধকাম হয়ে থাকে তবে তাকে ভুক্তি বা ভোজন ভোগ দাও।" তখন মৃগাবতী তাকে নিকটে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোন দেশ থেকে এসেছ?" যোগী উত্তরে বললো, "আমার জীবন অপহৃত হয়েছে, যে আমার জীবন অপহরণ করেছে তার সন্ধানে আম বেরিয়েছি। আমি সন্ধান করতে করতে এখানে এসেছি, অপহরণকারী এখানেই আছে। সে অনেকেরই ধন অপহরণ করেছে, তার নাম এখন আমার ওষ্ঠে। মৃগের নয়ন সে অপহরণ করেছে, আরও অপহরণ করেছে কোকিলের পঞ্চম স্বর। সিংহের কটি সে অপহরণ করেছে এবং এ-নগরে এলে সকলেই তা জানবে। গজেন্দ্র এবং মরালের গতিকে সে অপহরণ করেছে। এ-নগরে এসে তাও আম জানতে পেরেছি। তার সে বিশিষ্ট চীর

আমার প্রাণকে অপহরণ করেছে। এ-নগরে আমি তার চিহ্ন এবং তার নিদারুণ চীরবস্ত্রের সন্ধান পেয়েছি। সে একবার যা গ্রহণ করে তা আর ফিরিয়ে দেয়না।"১৮০

যখন স্বজন-সূর্য প্রকাশ পেল, মৃগাবতীর মন-কমল বিকশিত হল। অধরে অল্প হাসি উদ্ভাসিত করে সখীদের সে বললো, "দেখ এই সেই কুমার। আমি প্রতি দিন তোমাদের কাছে যে একটি বার্তা বলতাম, সে-বার্তার কুমার আজ এখানে আমার স্নেহ-মদিরায় মত্ত। এ-ই আমার চীর অপহরণ করেছিলো এবং এ-ই আমার জন্য অগণিত দুঃখ সহ্য করেছে। যার জন্য আমি গন্ধর্ব এবং দেবতার সেবা করেছি সে এখন এসেছে, এখন আমি তার সেবা করবো।" সখীরা বললো, এতো তাহলে তোমার জন্যই যোগী হয়েছে। আমরা তাই নিজেদের মধ্যে বলছিলাম, এর ললাটে ভাগ্য দীপ্ত হয়ে রয়েছে। আমরা যখন একে উঠিয়ে আনছিলাম, তখন বলছিলাম, এতো যোগী নয়, কোনও রাজকুমার হবে এবং বত্রিশ লক্ষণযুক্ত উত্তম রাজকুমার।" তারা আরও বললো, "আমরা এর যথার্থ মর্ম উদ্‌ঘাটন করবো। একবার একে নিরাশ করবো, তদনন্তর একে আশা দেব। একে কিছু এখন বলবো, দেখি এ তার কেমন উত্তর দেয়।" মৃগাবতী কথা বলবার জন্য মুখ খুললো এবং তাকে বললো, "হে যোগী, তুমি যে-সব কথা বলেছ তা বিচার করে বলনি। তুমি স্বয়ং যেমন অর্থাৎ যে স্তরের সে-রকম কথাই তোমার বলতে হবে। তা বাদ দিয়ে তুমি আকাশে উঠবার চেষ্টা করছ। কাউকে হত্যার অপবাদ যদি আমার উপর না পড়তো তাহলে আমি তোমার প্রাণ নাশ করতাম।" ১৮১

কুমার বললো, "যদি প্রাণ নাশেরই ভয় থাকতো, আমি অরণ্য এবং বনখণ্ডের মধ্যে যেতামনা। যদি কেউ আমাকে হত্যা করে, তবেতো আমি মোক্ষ পাব এবং প্রেম-প্রীতিকে অঙ্গীকার করে শিরে ধারণ করবো। যদি জীবন থাকে তবেইনা জীবনের প্রতি মমতা, আমার নিজের জীবনের প্রতি আমার কোনও মোহ নেই। আমি আমার জীবনকে সেদিনই অস্বীকার করেছি যেদিন থেকে আমার মনে প্রেম-প্রীতির রস সঞ্চারিত হয়েছে। আমি প্রেমের কারণে জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি। ভ্রমর মরে যাবে কিন্তু কেতকীকে পরিত্যাগ করবেনা ; সে কেতকী-কন্টকে বিদ্ধ হয়ে মরে যাবে অথবা কেতকীর সুবাস এবং রস নিতে থাকবে। কেতকীকে ভ্রমর কখনও ছাড়েনা, সে তার সুগন্ধে লুব্ধ হয়ে প্রাণ বিলিয়ে দেয়।" ১৮২

মৃগাবতী বললো, "এখন তুমি এ-রীতিকে দেখ। দীপক আর পতঙ্গের মধ্যে প্রীতি বা সম্বন্ধ কোথায় ? যদি নীচ ব্যক্তি উচচ ব্যক্তির সঙ্গ সাধনা করে, তাহলে সূর্যের প্রেমে যেমন কমল মরে যায় সে-রকমই সেও মারা পড়বে। তোমার মরণের আকাঙ্ক্ষা হয়েছে তাই তুমি আপনাকে সে-ভাবে দগ্ধ করছো যে-ভাবে পতঙ্গ দীপকের শিখায় নিজেকে দগ্ধ করে। তোমার সঙ্গে আমার স্নেহের অবসর কোথায় ? তোমার মত যোগী এখানে দশ লক্ষের মতো এসেছে। তুমি ভিক্ষা চাওতো আমি কিছু ভিক্ষা দিতে পারি যাতে আমার পুণ্য হবে এবং আমি পরকালে তার ফল পাব। হে মূর্খ, তুমি এমন সব

কথা বলছো যাতে আমার ক্রোধ হচ্ছে। আমার পাপ হবে এবং পুণ্য চলে যাবে, এ-জন্যই আমি তোমাকে হত্যার নির্দেশ দিচ্ছিনা।" ১৮৩

যোগী বললো, "হে রাজন, মৃতকে কখনও হত্যা করতে নেই কেননা মৃতকে আবার মারলে হত্যার স্বাদ পাওয়া যায়না। আমি সেদিনই মরে গিয়েছি যেদিন আমি প্রেমের খেলা খেলেছি এবং সাপের মুখে আঙ্গুল দিয়েছি। জীবন যদি থাকে এবং শ্বাস-প্রশ্বাস থাকে তবেই না মৃত্যুকে ভয় পাব। আমার নেত্র যে প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ তোমাকে দেখবার জন্য সে-প্রয়োজন সাধনের জন্য এখনও আমার শ্বাস আছে।" তার এ-বিনম্রতায় মৃগাবতীর মমতা হল এবং সে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কোন দেশের লোক এবং তোমার নাম কি? তোমাকে আমি অনেক ভুবি দিচ্ছি, এ-সব নিয়ে তুমি চলে যাও।" ১৮৪

যোগী বললো, "যদি তুমি যথার্থই ভুক্তি এবং ভিক্ষা দাও তবে এ-জীবনভর আমি আর কারও কাছে কোন কিছু চাইবোনা। আমিতো এ-ভিক্ষার জন্যই এখানে এসেছি। অনেক লোক আমাকে ভুক্তি দিয়েছে কিন্তু কারো ভুক্তিই আমি গ্রহণ করিনি। ভ্রমর করোলা খায়না, সে মালতীর সুবাস কামনা করে। চাতক অন্য কোনও জল গ্রহণ করেনা কিন্তু স্বাতী-বিন্দু গ্রহণ করেই সে বেঁচে থাকে। ক্ষুধা লাগলে কেশরী ঘাস খায়না। গজেন্দ্র পেলেই সে ভোজন করে। আমাকে যে-কথা সে দিয়েছিলো সে-কথা আমি পূর্ণ করেছি। সে তার দেশের নামটুকু মাত্র বলেছিলো, আমি বহু কষ্ট ভোগ করে যোগীর বেশ ধারণ করে এখানে এসেছি এবং কর্তব্য সম্পাদন করেছি।" ১৮৫

মৃগাবতী বললো, "এখনও হে ধৃষ্ট, তুমি কথা বলছো এবং উচ্চরোল বন্ধ করে নীরব থাকছোনা? আমি তোমার মতো ধৃষ্ট ভিক্ষুক আর কোথাও দেখিনি যে মার খেলেও যায়না, গালী খেলেও সরেনা। এতো যোগী নয়, এতো মনচলা বা অত্যধিক সাহসী কোনও ব্যক্তি যে জীবন খুইয়ে নিহত হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। আমারই দোষ যে আমি তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি, উঠে চলে যাও, পথ তোমাকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে।" যোগী বললো, "যাবতো নিশ্চয়ই, কিন্তু যদি শরীরে জীবন থাকে তবেইতো যাব। এখন শরীরতো শুধুই মাটির পিণ্ড, কেউ একে তুলে ফেলে দিলেইতো পারে।" মৃগাবতী মনে মনে বললো, "আমি একে অনেক নিরাশ করেছি, যদি সত্যিই এ মরে যায় তবে একে কি আশা আমি দেব?" ১৮৬

মৃগবাতী বললো, "হে কুমার, আমি তোমাকে তখনই জেনেছি যখন তুমি মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলে এবং ভ্রমিত বা বিহ্বল হয়েছিলে। তোমার মর্ম গ্রহণ করবার জন্য তোমাকে আমি নিরাশ করেছি। এখন তুমি যোগের বেশ পরিত্যাগ কর, তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে।" সে তার চেড়ী বা সেবিকাদের আদেশ দিল, তারা যোগীর বেশ খুলতে লাগলো। বললো, "স্নান করিয়ে একে অঙ্গরাখা পরাও।" সেবিকারা আদেশ পেয়ে ভাগ্যবানকে নিয়ে চললো। মৃগাবতীর মনভাবত বা প্রিয়জনকে তারা যোগীর বেশ খুলে স্নান করাতে

লাগলো। তারা বলতে লাগলো, "যে বল্লভ অতি উত্তম হয়, অপ্রসন্ন করেই তাকে পরীক্ষা করতে হয়। প্রসন্ন করে তার পরিচয় যতটা পাওয়া যায়, অপ্রসন্ন করলে তার চেয়েও অধিক পাওয়া যায়।" ১৮৭

শঙ্কর-সদৃশ সূর্য বা কুমার যখন দেবালয়ে তপস্যার জন্য এলো তখন পার্বতী-সদৃশ চাঁদ বা মৃগাবতী রতি কামনায় এলো। মৃগাবতীর যে শৃঙ্গার হল তাতে দ্বাদশ আভরণের প্রসন্নতা দেখা গেল। ধবলগৃহ অলঙ্কৃত হল, সেখানে রত্ন এবং মণি-মাণিক্যের দীপক প্রকাশ পেল। অগর, চন্দন, খস, কস্তুরী এবং মলয়াগিরি কৌটোয় ভরা ছিলো। কেসর ঢেলে অবগ প্রস্তুত করা ছিলো এবং স্থানে স্থানে সুগন্ধ তেল রাখা হয়েছিলো যেমন চোবা, মেদ, শিলারস, ফুলেল, ভীমসেনী কর্পূর। সকল প্রকার সুবাসিত রস, পরিমল ফুল এবং তাম্বুল সেখানে ছিলো। ১৮৮

দাসীরা চন্দ্র-দীপক জালিয়ে রেখেছিলো, মোমবতিকাও জলছিলো অনেক। দিবস এবং রাত্রির মধ্যে অন্তর করা যাচ্ছিলোনা। কেউ যাকে দিবস বলছিলো, অন্যে তাকে রাত বলছিলো। যে-স্থানে পর্যঙ্ক সাজানো হয়েছিলো সেখানে মৃগাবতী বসেছিলো, যে ছিলো ধন্যা। সে সখীদের ডেকে বললো, "কুমারকে বড়াঙ্গ বা সম্মানপূর্বক ডেকে আন"। সকলে উঠে দৌড়ে কুমারের কাছে গেল এবং তার সামনে দাঁড়ালো। বললো, "হে রাজা, মমতা কর এবং অগ্রসর হও। পদ্মিনী তোমাকে আহ্বান জানিয়েছে।" হাতে তাম্বুল নিয়ে কুমার উঠলো এবং হর্ষিত হয়ে মন্দিরের মধ্যে এলো। ১৮৯

রানী দেখলো যে কুমার এসেছে। সে শয্যা থেকে নেমে শোভমানা হয়ে দাঁড়ালো। চার পা এগিয়ে এসে সে কুমারকে অভ্যর্থনা করে বললো, "হে স্বামী, তুমি এস এবং ভুক্তি বা ভোজন গ্রহণ কর। সে-সময় আমি তোমাকে ভোজন-ভোগ দিইনি। এখন শয্যায় বসে আমার বিলাস কর। আমার জন্য তুমি মরণ এবং গঞ্জন সহ্য করেছ। অতঃপর তোমার আদেশ কেন আমি মান্য করবোনা ? যদি কেউ কারও জন্য দুঃখ সহ্য করে তাহলে প্রাপ্তির পর অগণিত সুখের দর্শন হয়। হে স্বামী, যতদূর পর্যন্ত আমার রাজ্যপাট বিস্তৃত, তুমি তার স্বামী এবং আমি তোমার দাসী। চল, শয্যার উপর উপবেশন কর। তুমি পুরুষ এবং আমি তোমার নারী।" ১৯০

দু'জনে শয্যার উপর বসলো এবং মৃগাবতী বাক্যালাপ প্রারম্ভ করলো, "আমি তোমার কাছে আমার বিবরণ দিচ্ছি। আমি এখানে চলে এসেছিলাম কেননা আমার চিত্তে অভিমান এবং অহঙ্কার জেগেছিলো। এলাম তো বটে কিন্তু পশ্চাত্তাপ হল, আমার চিত্তে কোনও প্রকার শান্তি ছিলোনা। রাত-দিন তোমার কথা স্মরণ করেছি, ক্ষণকালের জন্যও তোমাকে বিস্মৃত হইনি। বিশ্বাস কর, আমি সত্য কথা বলছি। তোমার গুণ আমার হৃদয়ে এমন ভাবে বিস্তৃত হয়েছিলো যেন পটে অঙ্কিত চিত্র, যে-চিত্রকে কোন ক্রমেই তুলে ফেলা যায়না। ভেবোনা, তোমার গুণ আমি ভুলে গিয়েছি, তোমার গুণের মালা গেঁথে আমি গলায় পরেছি এবং তোমার নাম জপ করেছি সর্বক্ষণ।" ১৯১

কুমার তখন বললো, "এখন আমার দুঃখের কথা বলছি, শোন এবং আপন চিত্তে তা' গণনা বা মূল্যায়নের চেষ্টা কর। তুমি যে-দিন আমাকে ছেড়ে চলে এলে, সে-দিন থেকেই আমি ভোজন গ্রহণ করিনি। যোগ-মার্গে আরূঢ় হয়ে আমি বেশ বদল করেছি এবং অরণ্য ও বণখণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করেছি, তারপর বর্ণনার অতীত তরঙ্গিত সমুদ্রে প্রবেশ করেছি। ভীত-সন্ত্রস্তভাবে মাস-দিন অতিক্রম করে তরঙ্গ থেকে মুক্ত হয়েছি কিন্তু এমন এক প্রান্তে নেমেছি যেখানে ঘাট ছিলোনা। উঁচু শিখর ছিলো, চলবার পথ ছিলোনা। তখন এক বিষম সর্প এলো, মনে মনে ভাবলাম এ-নিশ্চয়ই আমাকে আহার করবে। কিন্তু তখন আরও এক ভয়ঙ্কর সর্প এলো এবং উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হল। উভয়ে সমুদ্রে গড়িয়ে পড়লো এবং বিধাতার কৃপায় আমার প্রাণ রক্ষা পেল। এরপর আমি সুবুধ্যায় এলাম, সেখানে এক কুমারী অপ্সরাকে দেখলাম যাকে এক রাক্ষস অপহরণ করে ছিলো। রাক্ষস অত্যধিক বলবান ছিলো, আমি তাকে চক্রের সাহায্যে দশখণ্ড করলাম। এ-খবর শুনে সেখানকার রাজা দেখতে এলেন। তিনি কুমারীর সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চাইলেন এবং অর্ধেক রাজ্যপাট দেবেন বললেন। মনে মনে ভাবলাম বলপ্রয়োগ এখানে সমীচীন হবেনা, তাই বিনয় প্রকাশ করে কৌশলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। তারপর কজ্জলী বনে প্রবেশ করলাম যেখানে সিংহ এবং শার্দূল চীৎকার করছিলো। বন অন্ধকারপূর্ণ ছিলো, মার্গ দৃষ্টিপথে ছিলোনা, আমার দিকভ্রম হল। তখনকার বিষম কষ্টের সময়েও আমি তোমাকে বিস্মৃত হইনি। তোমার নাম কণ্ঠে নিতেই একটি মার্গ দেখলাম, বন সমাপ্ত হল এবং আমি বাইরে এলাম। তদনন্তর এক মেষ-চারকের দেখা মিললো, সে আতিথ্য দেবে এবং পথ দেখাবে বলে আমাকে তার গুহায় বন্দী করলো, আহার দেবে বলে সে আমাকেই আহার করতে চাইলো। তার গুহার মধ্যে অনেক মনুষ্য ছিলো, তারা আমাকে বুদ্ধি দিলো। এমন সময় মেষ-চারকবেশী দুর্বৃত্ত গুহার ভিতরে এসে একজন মানুষকে ধরে অল্পক্ষণের মধ্যেই আহার করলো। আহার করে ঘুমিয়ে পড়লো, আমি তখন লৌহশলাকা তপ্ত করে তার চোখে বিদ্ধ করালাম এবং গুহা থেকে পলায়ন করলাম। সেই দুঃখের মুহূর্তেও তোমার কথা আমার স্মরণ ছিলো। পদ্মপত্রের মতো বিশাল নেত্র-যুক্ত এবং গজকুম্ভের মতো পয়োধর সম্পন্না হে নৃপকন্যা, তুমি আমার হৃদয়ে সে-রকম নিবাস করছো যে-রকম বৈরোচনের হৃদয়ে শাখা।" ১৯২

এতটা দুঃখের কথা শুনে মৃগাবতীর হৃদয় ভাবাতিরেকে পরিপূর্ণ হল। তদনন্তর মৃগাবতী তাকে আলিঙ্গন করলো এবং বললো, "আমার জন্য হে নাথ, তুমি অনেক দুঃখ ভোগ করেছ। তোমার উপভোগের জন্য আমার ফলগুচ্ছ ছায়ায় ঢেকে রেখেছি। পবনের স্পর্শ তারা পায়নি, সূর্য থেকে তাদের বাঁচিয়েছি এবং কোনও ভ্রমর তাদের সুবাস পায়নি। দাড়িম্বরূপ দন্ত, নারঙ্গিরূপ কপোল, দ্রাক্ষাসদৃশ অধর এবং জম্বীর লেবুসদৃশ কুচ তোমার জন্যই ব্যক্ত করছি। তুমি তাদের বিলাস ভোগ কর।" আলিঙ্গন অর্পিত করে কুমার কুচ গ্রহণ করলো, বক্ষে ধারণ করে মর্দিত করলো এবং নিশা-শয্যায় রসের সম্প্রীতি হল। বালা সীৎকার করছিলো, হাসছিলো, কখনও অভিমান করছিলো, আবার আলিঙ্গন অর্পণ করছিলো। ভ্রমরতুল্য প্রেমী সমস্ত বাসনা এবং পরিমলকে গ্রহণ করলো

এবং অমৃতের মহারস পান করলো। তার মনে তৃষ্ণা এবং কামের শান্তি এলো এবং তার হৃদয়ের দুঃখ এবং বেদনা সব দূরীভূত হল। কায়ায় যে চঞ্চলতা ছিলো তারা মাথা নোয়ালো এবং মৌন হয়ে রইলো। কমলের সুগন্ধ গ্রহণ করে ভ্রমররূপী কুমার রাত্রিভর শয্যায় রইলো, প্রেম-রস গৃহীত হবার কারণে সে ক্লান্তিতে শয্যাত্যাগ করতে পারছিলোনা। তার উদ্ধত চিত্ত রমণের তৃপ্তি থেকে সরে যেতে পারছিলো না, যেমন করে গজেন্দ্র পঙ্কে নিমজ্জিত হলে তা থেকে মুক্তি পায় না। প্রিয়ার হৃদয়-সরোবরের মন-কমলের উপর স্বজন ভ্রমর বসেছে, এবং প্রেমের সুবাসে এতই লুব্ধ হয়েছে যে পুনরায় সে উড়ে যাচ্ছে না। ১৯৩

সমস্ত রজনী যখন বিগ্রহ বা রতি-রণে ব্যতীত হল, তখন উভয়ের মধ্যে অর্থাৎ উভয়কে বিচ্ছিন্ন করার জন্য সূর্য উদিত হল। সূর্যের এ-রীতি তারা মেনে নিল এবং সকাল হতেই বিগ্রহে ক্ষান্ত দিল। যামিনীতে অপার বিগ্রহ হয়েছিলো। কুঞ্জর অর্থাৎ কুচ এবং অশ্ব অর্থাৎ গ্রীবা সজ্জিত হয়েছিলো। সঘন কেশ হয়েছিলো শিরোস্ত্রাণ এবং কবচ রূপে কঞ্চুকী পরিধান করেছিলো। তার অস্ত্র ছিলো বলয় পহাচি এবং কঙ্কন-কলাই এবং কোমরে বেষ্টিত শাড়ী। শনিবাহনের রূপ ছিলো তার নেত্রের এবং ভুরু ছিলো তার ধনুক। পয়োধরকে সে করেছিলো চক্র যার বলে সে স্বামীকে জয় করেছিলো।১৯৪

নায়কের তিলক খড়্গ নায়িকার কপালে লেগে তার কেশ বিশৃংখল হল এবং সিঁথি এলোমেলো হল। নায়কের তীক্ষ্ণ নখশরে নায়িকার কঞ্চুকী ছিন্নভিন্ন হল। স্বামী যখন তার হস্ত ধারণ করলো তার বলয় ভেঙে গেল এবং পহাচি খুলে গেল। যে-শাড়ী তার কোমরে ছিল মদমত্ত কুমারের আক্রমণে তা' ছিন্নভিন্ন হল। নায়ক এবং নায়িকা এ-ভাবে রণমধ্যে যখন ছিলো, তখন সূর্য এসে তাদের বিচ্ছিন্ন করলো। যদি সূর্য না আসতো তাহলে কি না হতে পারতো। দু'জন মদমত্তের বিগ্রহে দলিত-মদিত হবার কারণে ধরিত্রীর একটি প্রোত তৈরী হত।১৯৫

কাঞ্চনপুর রাজ্যারোহণ খণ্ড

প্রভাতে যখন সূর্যের উদয় হল, দাসী সজ্জিত তাম্বুল নিয়ে শয়নকক্ষের দ্বারে এলো। কুমার মুখ ধুয়ে পান চিবুতে লাগলো এবং হাসতে হাসতে শয্যায় গিয়ে কেলি করতে লাগলো। এ-সংবাদ শুনে অমাত্য ও ভৃত্যগণ বলতে লাগলো, "এ সেই ব্যক্তি যাকে রাণীর উপর অনুরক্ত শুনেছিলাম। একেই বন্দী করে রাজকুমারী এনেছিলেন এবং শুনেছি যে তিনি তাকে কামনা করেন। এ-ব্যক্তি উত্তম রাজপুত্র এবং সূর্যবংশোদ্ভূত। মৃগাবতী একে রাজ্য দিয়েছেন এবং আপন জীবনকে এর প্রতি উৎসর্গ করেছেন। চল, আমরা উপঢৌকন নিয়ে মৃগাবতীর প্রিয়পাত্রকে স্বাগত জানাই।" ১৯৬

মৃগাবতী বললো, "হে রাজা, শ্রবণ কর। নগরে যত প্রজা আছে মমতাপূর্বক তাদের ডেকে আন। সভায় বসে প্রধান অমাত্যকে ডেকে এনে প্রজাদের জন্য বস্ত্র

দান কর। ভৃত্য এবং সেবক সবাইকে ডেকে পাঠাও। সমস্ত দেশে এ আজ্ঞা প্রচারিত হোক যে তুমি রাজা এবং আমি তোমার পত্নী।" সুজন রাজকুমার সভায় বসলো। তখন খবর ছড়িয়ে গেল সর্বত্র। মহৎ ব্যক্তিরা ভেট নিয়ে এলো ঘোড়ায় চড়ে, ভৃত্য এবং সেবকরাও এলো। প্রথমে সকলে দণ্ডবত হলো, পরে সকলে তার পদস্পর্শ করলো।[১৯৭]

মমতার শব্দ উচ্চারণ করে কুমার সবাইকে উঠালো এবং ভৃত্যগণ উপহার পুরস্কারের বস্ত্র পেল। কুমার তাদের বহুবিধ প্রসাদ দিলো এবং তারা কুমারকে তাদের মাথায় তুলে নিল অর্থাৎ কুমারকে সম্মান করলো। যেখানে যত রায় এবং রাজসেবক ছিলো, তাদের ডেকে আনবার আদেশ হল। প্রতিহারের প্রতি আজ্ঞা হল, "যেই আসুক তাকেই স্বাগত জানাতে দাও। নিম্নশ্রেণীর লোক এলেও তাকে বাধা দিওনা, তাদের আমার সাজ-সজ্জা দেখতে দাও।" কুমারের কানে কুণ্ডল এবং মাথায় মুকুট শোভিত ছিলো, তার হাতে স্বর্ণদণ্ড ছিলো। লোকেরা তাকে দেখে বলছিলো, "এর প্রীতিই যথার্থ অন্য সমস্ত প্রীতিই মিথ্যা।"[১৯৮]

রাণা এবং রায় যারা ছিলো কুমার তাদের ডেকে আনলো। সাজ-সজ্জা করে সকলে এসে কুমারকে সম্বর্ধনা জানালো। সভায় সকলে গ্রাম, মণ্ডল এবং ভুবনের নামের ক্রম অনুসারে বসলো। কুমার তাম্বুল পাত্র-বাহকদের সঙ্কেত করলো এবং তারা সকলকে সজ্জিত তাম্বুল অর্পণ করতে লাগলো। তারা ত্রিশটি পানের এক একটি বীড়া অর্পণ করতে লাগলো। কর্পূর মেশানো পানে পানিতে ভেজা সুপারী ছিলো। খয়ের ছিলো কস্তুরী মেশানো, চূনা ছিলো মুক্তার। সভার সকলে পান খেতে লাগলো—রায়, রাণা এবং সেবক সবাই। এরা সবাই ক্ষণ-প্রতিক্ষণ কুমারের আজ্ঞার অপেক্ষায় ছিলো এবং তার আজ্ঞা ছাড়া নড়ছিলোনা।[১৯৯]

সভাকে মনে হচ্ছিলো প্রস্ফুটিত পুষ্পবাটিকা, সেখানে অধিষ্ঠিত ছিলো রণকুশলী কুমার। সুন্দর ক্ষত্রিয় ছিলো, যারা ছিলো অপার বীর, গজপতি বসে কুমারের ভ্রূ-নিক্ষেপ দেখছিলো, অশ্বপতিও ছিলো অনেক, অনেক নৃপতি ছিলো যাদের সংখ্যা গণনা করা যায়না। ভূপতি যারা ছিলো তারা নিজেদের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদে লিপ্ত ছিলো। সৈনিকরা কথা বলছিলো দর্পভরে। কুমার ছিলো চক্রবর্তী এবং যোদ্ধা, শৌর্যে ছিলো সকলের অধিক। প্রসাদের দ্বারমুখে দিবারাত্র দান এবং যুদ্ধের তূর্য বাজছিলো।[২০০]

কুমার সকলকে পান প্রদান করে সভা ভঙ্গ করলো। কেবল আপন সমবয়স্কদের বেছে বেছে রাখলো। কুমার তাদের বললো, "আজ নৃত্যোৎসব হবে, তোমরা নৃত্য দেখবে।" নাট্যশালা থেকে সাজ-সজ্জা এলো। বেশ-ভূষা করে নর্তক এবং বেশ্যারা এলো, পখাওজ যারা বাজায় তারা এলো। উপাঙ্গী এলো নাদ ধ্বনিত করে, যন্ত্রকার এলো সুস্বর বাজিয়ে, তারা ব্রহ্মবীণা তথা শরবীণা বাজাচ্ছিলো। সুরমণ্ডল, অবধূতী, রুদ্রবীণা, ঢুক্কারী, গাহখী, বংশী, পিণাক, সারঙ্গী এ-সমস্ত বাদ্যের সুরলহরী উঠছিলো।[২০১]

যতদূর পর্যন্ত শব্দ বাদিত হচ্ছিলো, ছয় রাগের সম্পূর্ণ আলাপ প্রবাহিত হচ্ছিলো, সঙ্গে ছিলো তাদের ত্রিশ ভার্কা। এক এক রাগের ছিলো পাঁচ পাঁচটি করে ভার্কা। সর্বপ্রথম একটি নাদ উচ্চারিত হল, তদনন্তর ভৈরবের আলাপ চললো। মধুমাধব এবং সৈন্ধবের আলাপ হল, বঙ্গালা এবং বৈরাটী ধ্বনিত হল, গুণকারী গীত হল। এ-পাঁচটি হল ভৈরবের ভার্কা। ভৈরব রাগ পাঁচ বর্গে গীত হল এবং সবকটিই সম্পূর্ণ রূপে। তদনন্তর মালকোপের আলাপ হল যার নাম বহুদূর পর্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলো। [২০২]

বহুবিধ আলাপের সঙ্গে মালকোপের ভার্যাদের আলাপ হল, এবং পাঁচ ভার্যা শুদ্ধির সাথে ধ্বনিত হল। গৌরী, দেবকলী, টোড়ী এবং ককুভ ছিলো এবং সুরের গুণ প্রদর্শনের জন্য খণ্ডাবতীও ছিলো। তদনন্তর হিন্দোল এলো। পাঁচ ভার্যার সঙ্গে সেও উচ্চারিত হল। বৈরারী দেশাখ নাটা, সহজ কথা এবং দেসী ধ্বনিত হল। পাঁচ ভার্যার সঙ্গে হিন্দোল তরঙ্গিত হল। দীপক রাগ তাদের জানা ছিলো কিন্তু গাইলোনা কেননা গাইলে দোষ হত। শুধুমাত্র তার পাঁচ ভার্যা সুরলহরীতে এলো কেননা তাদের উচ্চারণে মোক্ষ হয়। [২০৩]

বর শ্রীচন্দ্র, কামোদক, দেসী, পটমত্তহরী এবং গৌরী এরা হচ্ছে দীপকের ভার্যা। মেঘরাগের সঙ্গে এদের আবির্ভাব মালশ্রী, সারঙ্গ, বরারী, ধনাশ্রী এবং গান্ধারী। মেঘ-রাগের সঙ্গে এ-পাঁচটি রাগিনী একই সঙ্গে গৃহীত হয়। শ্রীরাগেরও আলাপ হল দীপ্ত স্বরে শুদ্ধির সঙ্গে। হেমকরী, মলার, গুজরী তথা ভীমপলাশী গীত হল। শ্রীরাগের লক্ষণ বিবেচনা করে আমি তার ভার্যাদের নাম করলাম। [২০৪]

এভাবে ছয়টি রাগকে তাদের ভার্যাদের সঙ্গে ত্রিশ রাগিণীর মধ্যে উপস্থিত করা হল। যে-সমস্ত শব্দ বা বাদ্যের নাম করা হল সবই বাদিত হল এবং সে-গুলোর এমন ঝঙ্কার হল যে তাতে সকলেই মোহিত হল। এরপর বেশ্যা রমণীরা বেশ-ভূষা করে বিধিব ভঙ্গীর সঙ্গে নৃত্য প্রদর্শন করতে লাগলো। এরা ছিলো কমলমুখী এবং মৃগনয়না। এদের কটিদেশ ছিলো ভ্রমরের কটির মতো ক্ষীণ। তাদের উরোজ ছিলো এতটা শুভ্র যে মনে হচ্ছিলো যেন তা ভাস্করের হাতে নিখুঁত ভাবে তৈরী। তাদের জঙ্ঘা ছিল কদলীস্তম্ভের মতো, তাদের নিতম্ব ছিলো পরিপূর্ণ। চম্পকবর্ণের এ-সব তরুণী ছিলো অপূর্ব সুন্দরী। যেই তাদের দেখছিলো সেই মোহিত হচ্ছিলো। তাদের প্রত্যেকেরই ছিলো ভিন্ন ভিন্ন ভঙ্গী এবং তারা মায়ার সঙ্গে তা প্রদর্শন করছিলো। [২০৫]

তারা কছনী এবং দক্ষিণী বস্ত্র পরিধান করেছিলো এবং চন্দন বর্ণের চোলী উরোজের উপর ধারণ করেছিলো। কেলের আভরণে কর্পূরের সুগন্ধ ছিলো এবং যাঘরা পরে তারা পা রাখলো। শিরোদেশের কেশগুচ্ছ এমন করে বেণীবদ্ধ করলো যাতে মনে হল যেন চন্দনের বৃক্ষে বিষধর শোভা পাচ্ছে। এদের দেখে সমস্ত সভা মোহিত হল এবং সকলের তনুমন কামোদ্দীপনায় গৃহীত হল। কুমারকে অভিনন্দন জানাতেই তারা আদেশ প্রাপ্ত হল এবং নৃত্য প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুত হল। গায়িকারা প্রগাঢ় রূপে এবং

শুদ্ধ অঙ্গে গান গাইতে লাগলো এবং সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য হতে লাগলো। মায়া, ধৌরা, ভুমরা এবং পরিবর্ত্ত নৃত্যের এ-সমস্ত ভঙ্গী প্রদর্শিত হতে লাগলো। ২০৬

সরব নীল, রূপক, চন্দ, চালী, দেশী, নিত পবর, ইকতালী এ-সমস্ত নৃত্যের তালে নৃত্য হতে লাগলো। পখাওজ এবং মৃদঙ্গের অটতাল এবং পটতালেও নৃত্য হচ্ছিলো। এত সঙ্গতভাবে তালে তালে নৃত্য হচ্ছিলো যে মনে হচ্ছিলো নৃত্যরতাদের পা যেন ধরিত্রীর সঙ্গে আলগ্ন রয়েছে। তদনন্তর তারা ধ্রূপদী নাচ আরম্ভ করলো। তখন গীত হচ্ছিলো এবং সুরঝঙ্কার উঠছিলো। তারা মাথার উপরে পানিভরা পাত্র নিয়ে নাচছিলো এবং চক্র হাতে নিয়ে ঘুরছিলো। আবার কখনও মাটির পাত্রের উপর, কখনও কাচখণ্ডের উপর, কখনও ধারালো খড়্গের উপর তাল ফেলে নাচছিলো। তাল, মার্গ, গীত এবং রাগ যতপ্রকার আছে সবই তারা প্রদর্শন করছিলো এবং ইন্দ্র প্রমুখ দেবতারা কুমারের সঙ্গীত-নৃত্য সভা কৌতুকপূর্বক দেখছিলেন। ২০৭

উত্তম নৃত্য কুমারের ভালো লাগছিলো। অতঃপর মাহেন্দ্র নর্তকবৃন্দের নৃত্য আরম্ভ হল। কুমার প্রসন্ন হল এবং তার মনে মমতা জাগলো। নর্তকবৃন্দ অনেক প্রসাদ পেল। অশ্বশালা থেকে ঘোড়া পেল, অঙ্গুটি পেল, রেশমী বস্ত্র পেল, সূতী বস্ত্র পেল, এবং ক্রোড় টাকা পেল। কুমার আপন হাতে তার শরীরের নবগ্রহী আভরণ খুলে দিল, মস্তকের মুকুট দিল এবং গ্রীবা থেকে কণ্ঠমালা দিল। যত সব রাজকুমার সেখানে ছিলো তারাও তাদের অঙ্গের আভরণ খুলে দিল। বেশ্যারাও পা থেকে মস্তক পর্যন্ত আভরণ পেল। ২০৮

যখন কুমার রাজসভায় গেল, মৃগাবতী তার এক দাসীকে ডেকে বললো, "সখীদের ডেকে আন, তাদের বলবে মৃগাবতী একাকিনী রয়েছে।" দাসী সখীদের বললো, "চলো, মৃগাবতী তোমাদের ডেকেছে।" ইন্দ্রসভার অপ্সরীদের চেয়েও সুন্দরী সখীরা দৌড়ে এলো। পান চিবুতে চিবুতে তারা এসে দেখলো মৃগাবতী হাসছে। সখীরা বসে বিগত রাত্রির বার্তা জিজ্ঞেস করলো। তারা জিজ্ঞেস করলো, স্বামী কেমন রমণ করেছিলো? তুমি কি মিলনের সময় মান করেছিলে?" ২০৯

প্রশ্ন শুনে মৃগাবতী হেসে চুপ করে রইলো। সে লজ্জা পাচ্ছিলো তাই সব বার্তা বলতে পারছিলোনা। তখন সখীরা শপথ দিয়ে বার্তা জিজ্ঞেস করলো। তারা বললো, তোমার শপথ যদি তুমি সব কথা সত্য না বল। কেন তুমি বলছোনা তুমি তোমার প্রিয়কে কেমন ভোগ দিলে? তোমার শপথ লাগে যদি তুমি সত্য কথা না বল। সে কি সৌখীন পুরুষ না গোয়ার? সে শয্যার নিয়মকানুন জানে না জড়ের মতো?" হেসে মৃগাবতী বললো, "সে বুদ্ধিমান, মূর্খ নয়, সে চতুর, সুজন, সৌখীন এবং রসিক তথা অপার ভাবের ভাবুক। রতিরহস্য বা কোকশাস্ত্রে যে-সব ভাব আছে, সেতো তা জানেই তার চেয়েও অধিক জানে। কোকশাস্ত্রের জ্ঞান আমারও আছে, তাই বুঝতে পারি সে কখন কোন ভাব আমার উপর প্রয়োগ করে। শরীরের কোন কোন স্থানে মদনের রহস্য

আছে তা সে জানে এবং সে-প্রসংগে এক এক অক্ষর করে সমস্ত ব্যাখ্যা সে দিতে পারে। সে সৌখীন নাগর তথা সুভাগ্যে পরিপূর্ণ এবং সে ভোগের কথাশাস্ত্রে অনেক গুণবান। আমি যে-রকম চেয়েছিলাম দৈব আমাকে তাই দিয়েছে। আমি সম্পূর্ণ অমৃত-কুণ্ড প্রাপ্ত হয়েছি। আমার মনে যত কামনা ছিলো সবই পূর্ণ হয়েছে কেননা তাকে আমি আমার যোগ্য প্রিয় হিসেবে পেয়েছি। যোগ্য থেকে যোগ্যতরকে বিধাতা আমার প্রাপ্ত করেছে। এখন অনেক বিচ্ছেদের অনন্তর তার কাছ থেকে রসভোগ পাচ্ছি।" ২১০

এ-সব শুনে সখীরা আনন্দ পেল। ঘর ঘর থেকে নিছাবর বা উপহার আসতে লাগলো। মৃগাবতী উপহার গ্রহণ করতে লাগলো এবং সখীদের পরাতে লাগলো। নিজে স্নান করে চীর পরিধান করলো এবং অনেক উত্তম আভরণ ধারণ করলো। আভরণে অলঙ্কৃত হয়ে চতুরা, বুদ্ধিমতী এবং বিচক্ষণা নারী উপবেশন করলো। নৃত্য সমাপ্ত হলে কুমার গৃহে এলো এবং মৃগাবতী তাকে তখন পেল অমৃত-সদৃশ্য তাৎপর্যে। তদনন্তর সখীরা আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো এবং দম্পতি রস-কেলিতে নিমগ্ন হল। তারা পঞ্চামৃত ভোগ করলো এবং মধুর খাদ্য গ্রহণ করলো। ২১১

দেব তথা পবন খণ্ড

মৃগাবতীর এক সখীর গৃহে একটি হর্ষোৎসব ছিল। সে মৃগাবতীর কাছে এসে বললো, "আমার ঘরে মঙ্গলাচার হচ্ছে, তুমি এলে সে-অনুষ্ঠান সম্ভবপর হবে। তোমাকে ছাড়া কে আমাকে আদর সম্মান দেবে আর কেই বা আমার কথা শুনবে। তুমি এলে আমার গর্ব হবে এবং আমার শাশুড়ী বা ননদের কাছে প্রত্যয় বা গৌরব পাবো।" মৃগাবতী বললো, "হে সখী, শ্রবণ করো, আমি এবং তুমি, তুমি এবং আমি সর্বদাই একসঙ্গে আছি। তোমার এবং আমার মধ্যে কোনো অন্তর নেই। দুটি শরীরের মধ্যে একটিই জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। রাজকুমারকে জিজ্ঞেস করে আমি তোমার সঙ্গে চলবো।" ২১২

মৃগাবতী কুমারের নিকটে এসে পাশে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো, "হে রাজা, তুমি আমার একটি কথা শুনবে। আমার এক সখী তার গৃহে একটি উৎসবের আয়োজন করেছে। সে আমাকে ডাকতে এসেছে। যদি তুমি আদেশ করো তবে আমি যেতে পারি।" কুমার বললো, "হে প্রেম-প্রিয়া, তুমি আমার জীবনের স্বামিনী এবং প্রাণাধার। যদি নিষেধ করি তাহলে অপমঙ্গল হবে আর যদি যেতে বলি তাহলে প্রীতি থাকবেনা। তোমার যা ভালো লাগে তুমি তাই করো। এখানে আমাকে জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই। তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আমি বিরহ সহ্য করতে পারবোনা, আমি একথা সত্য বলছি।" ২১৩

মৃগাবতী বললো, "আমার এক মিনতি শোনো, পুরুষ জাতি এমন যে সে নিষিদ্ধ কাজ করতে এগিয়ে আসে। এ-জন্যই হে স্বামী, আমি সখীর গৃহে যাবার আগে বিশেষ-ভাবে একটি নিষেধ তোমাকে জানাচ্ছি। গৃহের সপ্তখণ্ডের উপর একটি রুদ্ধ দ্বারকক্ষ

আছে। তুমি এ-কক্ষের দ্বার উন্মোচন করবেনা। এর মর্ম কেউ জানেনা, সম্ভবতঃ এতে ভালো-মন্দ কিছু আছে।" এভাবে নিষেধ করে রমণী সখীগৃহে যাত্রা করলো। পালকীতে চড়ে সে যাত্রা করলো। সখীরা পান খেয়ে আনন্দে খেলা করছিলো এবং তাদের হাস্যকৌতুকে গৃহ পরিপূর্ণ হচ্ছিল। ২১৪

মৃগাবতী সখীগৃহে যখন এলো তখন চতুর্দশীর চন্দ্র উদিত হয়েছে বলে ভ্রম হলো। ঘর এবং আঙ্গিনা তার প্রকাশে উজ্জ্বল হলো যেন রাত্রি দিবসে পরিণত হলো। শশী এবং তারাগণ যেভাবে প্রকাশ পায় মৃগাবতীর প্রকাশ তার চেয়ে উজ্জ্বল ছিলো। তার বচন ছিল মনোমুগ্ধকর এবং সে সখীদের সঙ্গে হেসে খেলে সময় কাটাতে লাগলো। এদিকে মৃগাবতী সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুকে যখন মগ্ন, তখন কুমার একা একা ভাবছিলো। সে মনে মনে বলছিল, "জানিনা রুদ্ধগৃহে কি আছে। খুলে দেখি কি আছে বোঝা যাবে।" ২১৫

সে কক্ষের দ্বার উন্মোচন করে দেখলো যে সেখানে একটি বন্ধমুখ পাত্র আছে, এবং তার মধ্য থেকে একটি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। "কে সে পুণ্যবান যে আমাকে নিস্তার দেবে? যে আমার বন্ধন উন্মোচন করবে আমি আজীবন তার সেবা করবো। যে আমাকে আশ্রয় দেবে আমি দু'হাত জড়ো করে তার সেবা করবো। যেভাবে হনুমান স্বামীর অর্থাৎ রামচন্দ্রের ভজনা করেছিলো আমিও তাই করবো। হে রাজা, আমাকে ছেড়ে দাও। যে-রকম সেবা বেতাল বিক্রমাদিত্যের করেছিল আমিও সে-ভাবেই তার সেবা করবো যে আমাকে মোক্ষ দেবে।" ২১৬

কুমার প্রশ্ন করলো, "তুই কে এবং কোন অপরাধের জন্য তোকে বন্দী করে রাখা হয়েছে? স্পষ্ট করে বল, তাহলে তোকে আমি মুক্তি দেবো।" সে বললো, "আমি মৃগাবতীর পিতার ভৃত্য ছিলাম, কোষাগার এবং অর্থভাণ্ডার এ-গুলোর দায়িত্ব ছিল আমার উপর। কিন্তু স্বামীর অর্থাৎ প্রভুর কার্য প্রসঙ্গে সকলেই আমার বিরোধী হয়ে পড়লো এবং আমিও কারো মুখাপেক্ষী ছিলামনা, প্রভু যাকে মমতা করেন প্রভুর অন্যান্য মিত্ররা তার শত্রু হয়ে যায়; ফলতঃ রূপমুরারির মৃত্যুর পর আমাকে এভাবে বন্দী করে রেখেছে। আমার অপরাধ আমি প্রভুর আজ্ঞা সর্বদা পালন করেছি।" আরো অনেক মধুর কথা সে বললো যার ফলে কুমারের মনে মোহ-মমতা জাগলো। সে মনে মনে বললো, "একে খুলে মুক্তি দেই। স্বামীর কার্যে কোনো দোষ হয়না।" কিন্তু যখন কুমার ভাণ্ডের মুখ খুললো তখন এক অত্যধিক বিপরীত বা বিষম ব্যক্তি বেরিয়ে এলো। তার পা মাটিতে ছিল কিন্তু মস্তক যেন আকাশ ছুঁতে চাচ্ছিল। তার বিষম রূপের কি বিবরণ দেবো? তার শরীর ছিল কালো এবং দাঁত অত্যধিক নিরল এবং বৃহৎ। কুমারকে সে কাঁধে তুলে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলো। কুমার অনুতাপ করতে লাগলো, "এটা আমার খুবই অনুচিত কর্ম হয়েছে, যে-কাজ করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছিল আমি তাই করেছি। যে-ভাবে জনমেজয় নিষিদ্ধ কাজ করে পরিণামে অনুতপ্ত হয়েছিল সে-প্রকাশ পশ্চাত্তাপ দৈব আমাকে দিল। সুখকে হত্যা করে রাজা বিক্রমাদিত্য অনুতাপ করেছিল আমিও

সেই রকম অনুতাপ করছি। আমি যেখানে যেখানে যাব এই অনুতাপ আমাকে অনুসরণ করবে। কান্তার বচন আমার বুকে বিদ্ধ হচ্ছে যেন শেল প্রবেশ করছে। একবার বিদ্ধ হয়, একবার অঙ্কুরিত হয় এবং সঘন দুঃখে আমি নিমজ্জিত হই।" ২১৭

সে বললো, "হে দৈববিধাতা এবং সৃষ্টিকর্তা, অনেক কঠিন অবস্থা থেকে তুমি আমাকে নিস্তার করেছো। এখন এক ভয়ানক কঠিন স্থিতি আমার উপর এসে পড়েছে। আমি হাত জোড় করে তোমাকে বিনয় করছি। তোমাকে ছাড়া আমি আর কাকে ডাকবো? আমি এই কঠিনতা থেকে নিস্তার চাই।" ইতিমধ্যে দৈত্য শতযোজন দূরে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। সে কুমারকে বলছিল, "সে প্রিয়তমা আমার, যাকে তুমি সুখপূর্বক রমণ করেছো, তুমি যখন তাকে ভোগ করছিলে আমি তখন দগ্ধ হচ্ছিলাম। আমি তার প্রতি লুব্ধ ছিলাম কিন্তু সে তোমার প্রতি লুব্ধ হয়েছিল। এখন বল তোমাকে কোথায় নিক্ষেপ করবো, যাতে আমার হৃদয়ে কোনো অনুশোচনা না থাকে।" ২১৮

"তুমি পাণ্ডব নও কিন্তু তুমি মাহেন্দ্রীর সাথে রমণ করেছ। এখন তুমি জীবিত অবস্থায় তাকে আর দেখতে পাবেনা। তুমি মাধবানল নও কিন্তু কামকন্দলার সঙ্গে রমণ করেছ, যেভাবে ভর্তৃহরি পিঙ্গলার সঙ্গে রমণ করেছে। তার অঙ্গে অনেক প্রকার সুগন্ধি প্রবাহিত তাই ভ্রমরলুব্ধ হয়ে তাকে ছেড়ে কোথাও যায়না। বাতাস প্রবাহিত হলে তার শরীরের সুগন্ধ বিশ ক্রোশ পর্যন্ত পরিমল সহকারে ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে তুমি রমণ করছো আর ওদিকে আমি হাত কচলাচ্ছি। এভাবে এতো তাপ জেগেছে যে আমার শিরোদেশ থেকে পা পর্যন্ত জ্বলছে। এভাবে তাপদগ্ধতায় বর্ষ ব্যতীত হয়েছে কিন্তু অমৃত আমার হাতে আসেনি। তুমি সেই কুমারীকে পেয়েছ এবং তার সঙ্গে তুমি সুখ ভোগ করেছো।" ২১৯

সে আবার বললো, "কুমার মুখ দিয়ে কথা বলছোনা কেন, মৃত্যুর সময় তোমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছেনা কেন? আমি কোনো ভূত বা রাক্ষস নই এবং ছদ্মবেশী গড্ডরিকও নই। তুমি জীবনের আশা ছেড়ে দাও এবং যতোক্ষণ শরীরে শ্বাস আছে ততোক্ষণ বাক্য উচ্চারণ করো।" কুমার বললো, "তোমাকে আমি কিইবা বলবো। যেখানে আমি দেখছি তুমি নানাবিধ যুক্তি তৈরী করে রেখেছো। আমি তোমার সঙ্গে কোনো দুর্ব্যবহার করিনি, আমি তোমার ভালোই করেছি আর তার পরিবর্তে তুমি এই আচরণ করছো।" সে উত্তর দিল, "যে আমার ভালো করে আমি বলপূর্বক তার অনিষ্ট করি। আমার পূর্বপুরুষদের যা স্বভাব আছে, আমি সে-স্বভাব দূর করতে পারিনা। ২২০

তুমি কি শোননি যে বর্ষাকালে স্বাতীর বিন্দু বিন্দু জল অমৃতসদৃশ হয়? কিন্তু এই জল যেখানে পড়ে সেখানকার স্বভাব অনুসারে এর রূপ তৈরী হয়। সাপের মুখে পড়লে এই জলবিন্দু বিষ হয়, ঝিনুকের মুখে পড়লে উজ্জ্বল নির্মল জ্যোতিষ্পন্ন মুক্তো হয়। আবার কোনো কোনো বনখণ্ডে কর্পূর বৃক্ষ উদ্গত হয়। তুমি আমার ভালো করেছো এটা সত্য, কিন্তু মঙ্গলের স্থানে অমঙ্গল করা হলো আমার স্বভাব। এখন তুমি বলো আমি

তোমায় কোথায় নিক্ষেপ করে হত্যা করবো—শিখরের উপরে, সাগরে না পৃথ্বীর উপরে —যেখানে তোমার মন চায় আমাকে বলো।" ২২১

কুমার ভেবে দেখলো যে, একে যা বলা হয় তার বিপরীতটা করে। সুতরাং সে বললো, "তুমি আমাকে পাথরের উপরে ফেলে হত্যা করো যাতে আমি শীঘ্র মরতে পারি ; পানিতে দুঃখপূর্বক মৃত্যু হোক এ আমি চাইনা। এ-কথা শুনে দৈত্য হাসতে লাগলো এবং বললো, "বেশ বলেছো। তোমাকে পাথরের উপর মারলে তুমি যা চেয়েছো তাই পাবে কিন্তু তোমাকে পানিতে ফেলবো। সেখানে মৎস্য, নক্র এবং ঘড়িয়াল তোমাকে খাবে এবং তোমার অপার দুঃখ হবে।" এ-কথা বলে সে বলপূর্বক কুমারকে স্কন্ধদেশ থেকে নামালো, দু'হাতে তার পা ধরে প্রচণ্ডবেগে ঘুরিয়ে সমুদ্রের স্রোতের মধ্যে নিক্ষেপ করলো।২২২

এভাবে কুমারকে নিক্ষেপ করে সে চলে গেলো এবং পুনরায় ফিরে এসে তাকে আর দেখলোনা। যে-সময় কুমার নিক্ষিপ্ত হচ্ছে সে-সময় কুমার মনে মনে প্রার্থনা করছিলো "হে অলখ কর্তা, যে প্রকারে তুমি বিক্রমরাজকে রক্ষা করেছিলে, যে-প্রকারে কূপে নিক্ষিপ্ত জলন্ধরকে পবন দিয়ে তুমি বাঁচিয়েছিলে সে-ভাবেই তুমি আমাকে রক্ষা করো। কিন্তু আমি তো বিক্রমের সমান নই, জলন্ধরের সমানও নই ; তাই তোমার যে-রকম ইচ্ছা সে-ভাবেই আমাকে রক্ষা করো।" একথা শুনতেই বিধাতার মনে মমতা উপস্থিত হলো এবং কুমার সমুদ্রের এমন স্থানে নিপতিত হলো যেখানে পানি বেশী ছিলনা। যখন পূর্বার্জিত কর্মের ফলে তার প্রাণ বেঁচে গেলো তখন প্রিয়তমার সঙ্গে বিমুক্ত হওয়ায় তার দুঃখ হলো। তার পশ্চাত্তাপ হলো যে, কেন সে মৃগাবতীর নিষেধ অমান্য করেছিলো। ২২৩

চতুর্দিকে শুধু পানি ছিল। মার্গ-অমার্গ কোনো কিছুই তার বুঝবার সাধ্য ছিলো-না। একবার সূর্যকিরণে সে তপ্ত হচ্ছিল, অনন্তর রজনীতে শশীর কিরণ তার শরীরকে স্পর্শ করছিলো। অন্ধকার রজনীতে তার মনে ভয় জাগছিলো, সমুদ্রের তরঙ্গ দেখে তার রসনা শুকিয়ে যাচ্ছিলো। তার দুঃখের অবধি ছিলনা কিন্তু তার প্রাণ ছিলো অত্যধিক কঠিন, তাই সে প্রাণ নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলনা। বিধাতার লেখন কেউ জানেনা তা সে দুঃখেরই হোক, সুখেরই হোক। দুটো অনুভূতি একই সঙ্গে থাকে। কথা বলতে বলতে বিধাতা বিরহ এনে দেন। এখন তো স্বপ্নই তার অবলম্বন, যদি দৈবের অভিরুচি হয় তবেই কুমারের সঙ্গে মৃগাবতীর সাক্ষাৎ হতে পারবে। ২২৪

এদিকে কুমার যখন সমুদ্রের আবর্তে রয়েছে ওদিকে তখন মৃগাবতীর চিত্তে অকস্মাৎ উদ্বেগ উপস্থিত হয়েছে। সে তার সখীকে বললো, "হঠাৎ এখন সুখের প্রসঙ্গে যেন আমার মনে দুঃখের ভাব উপস্থিত হচ্ছে। তোমার অনুমতি নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যেতে চাই। আমার মনে হচ্ছে কুমার হয়তো তার স্থানে নেই। পুরুষ জাতি এমন যে তাকে যা নিষেধ করবে তাই সে করবে। এমনতো হতে পারে, আমার নিষেধ অমান্য করে সে বন্ধ দরোজা উন্মুক্ত করেছে। আমাকে যেতে দাও, আমার মন ভ্রমিত হয়েছে যদি এখন না যাই

পরিণামে তাহলে আমাকে অনুতাপ করতে হবে।" ঠিক সেই মুহূর্তে একটি দাসী চিৎকার করতে করতে এসে পৌঁছলো। [২২৫]

দাসী বললো, "তুমি বসে রয়েছো কেন? কুমারকে নিয়ে দৈত্য তো উড়ে গেছে।" এ-কথা শুনতেই রানী আকুল হলো। সে তখন কিছুই চোখে দেখছিল না, এবং তার মুখ থেকে শব্দ নির্গত হচ্ছিলনা। এক দণ্ডের উপরান্তে তার চেতনা এলো। তখন সে দাসীকে জিজ্ঞেস করলো, "হে দাসী, তুমি এখানে এসে কি সংবাদ দিলে?" দাসী উত্তর করলো, "যুধিষ্ঠির-রূপ কুমার পরাজিত হয়েছে এবং দানব সুযোগ পেয়ে তার অপকার করেছে।" এ-কথা শুনতেই ভর্তৃহরির প্রেমিকা পিঙ্গলার মতো মৃগাবতীর ইচ্ছা হলো প্রাণত্যাগ করতে। সে বললো, "যখন আমার প্রিয় চলে গেছে তখন আমি শূন্য ঘট নিয়ে পড়ে থাকবো কেন? কঠিন বিরহাগ্নি জ্বলছে, মনে হচ্ছে সমস্ত শরীর পুড়ে যাবে। [২২৬]

তার প্রাণ দেহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হচ্ছিলনা। সে ক্রন্দন করছিলো এবং সখীকে বলছিলো, "হে সখী, আমি কি করবো। আমাকে বিষ দাও আমি বিষ পান করি।" মাথার চুল ছিঁড়ে সে হাতে জড়াচ্ছিল এবং বলছিলো, "আমার জীবনে এ ঘটনা কেন ঘটলো?" সে বারবার মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ছিল এবং মরতে চাচ্ছিল কিন্তু দৈব তাকে বাঁচিয়ে রাখছিলো। সখীরা হাত ধরে বলছিলো, "হে রানী, বিশ্বাস করো বিধাতা নিশ্চয়ই তোমাকে পুনরায় কুমারের সঙ্গে মিলন ঘটাবেন। যেভাবে দাপর যুগে অর্জুন যেমন দশদিন পর্যন্ত স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন এভাবেই কলিযুগে তোমার ঘটেছে। কুমারের সঙ্গে তোমার মিলন অবশ্যই হবে। [২২৭]

সে ক্রন্দন করছিল, হাত মলছিল এবং অনুতাপ করছিলো। অশ্রুপ্লাবিত নেত্র তার রক্তিম হয়েছিলো। তার অস্থিরতা দেখে মনে হচ্ছিল জগতে প্রলয় ঘটেছে। তার অশ্রুর স্রোতে মনে হচ্ছে গঙ্গা তরঙ্গিত হয়েছে, যেন বর্ষা নেমেছে। সূর্য উঠলে বর্ষার পানি শুকিয়ে যায় কিন্তু তার লোচন কিছুতেই শুষ্ক হচ্ছিলনা। কুতবন বলেন, হ্রদওতো শুকিয়ে যায় কিন্তু ভরপুর নেত্র শুকায়না। সেখানে পানি সব সময় ভরা থাকে। [২২৮]

এ-বার্তা সকল দেশে ছড়িয়ে গেলো এবং দেশবাসী সকলে অননুমেয়রূপে আকুল হলো। কেউ নিজেকে সংবরণ করতে পারছিলোনা এবং সকলের মনেই ক্ষোভ এবং দুঃখ জাগছিলো। নগরের সকলে অন্ন-পানি ত্যাগ করলো এবং মৃগাবতী কেঁদে কেঁদে রাত্রি ব্যতীত করলো। দিন হলো এবং অন্ধকার রাত্রি গভীর দুঃখের সঙ্গে অতীত হলো। মৃগাবতী বললো, "স্বামীর সন্ধান আমি কোথায় পাবো? এখন স্বামীর অনুপস্থিতিতে কে আমাকে ছায়া দেবে। আমার শরীরে বিষবাণ লেগেছে কিন্তু এখানে কোন বীর হনুমান আছে যে আমার জন্য সঞ্জীবনী মূল নিয়ে আসবে? [২২৯]

কাঁদতে কাঁদতে তার নেত্রের দৃষ্টি প্রায় রুদ্ধ হলো। সে তখন বললো, "সীতার কাছে রামকে কে আবার এনে দেবে? কে নলকে দময়ন্তীর কাছে আনবে? আমি বিয়োগ ব্যথায়

বিভোর রয়েছি এবং দীর্ঘশ্বাসে আমার সময় কাটছে।" সখীরা বললো, "আমরা চতুর্দিকে অনুসন্ধান করতে যাব, দানব তোমার প্রিয়তমকে কোথায় লুকোবে?" এ-কথা শুনে মৃগাবতী ওঠে বসলো এবং সেনাদের ডেকে আজ্ঞা দিল যেন চতুর্দিকে সন্ধানে তারা ছড়িয়ে পড়ে।[২৩০]

সকলেই অনুসন্ধানে লিপ্ত হল, রানীতো অনুসন্ধান করতে করতে বিফল হয়ে গেল। পর্বত এবং পাহাড়ী এলাকায় অনুসন্ধান চললো; জল, স্থল, পৃথ্বী এবং অপার বনখণ্ডে অনুসন্ধান চললো। রানী যোগিনী বেশে দণ্ডকারণ্য এবং বিন্ধ্যবনে স্বামীর অনুসন্ধান করলো। যেমনভাবে পক্ষী ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে, রানীও তেমনি 'প্রিয় কোথায়' একথা বলতে বলতে ছুটতে লাগলো। বিফল মনে সে ছুটছিলো এবং তার চিকুর বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছিলো। তার মুখ পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করেছিলো এবং সে তার হাত-পা স্থির রাখতে পারছিলনা। সে বললো, "হে বিধাতা, এ-দিবসকে কেন তুমি নির্মাণ করলে যে-দিবসে প্রিয়তমের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ ঘটলো। এখন তুমি আমার বিপক্ষ সঙ্কট মোচন কর, তা না হলে আমি প্রাণ ত্যাগ করবো।[২৩১]

সে আরও বললো, "প্রাণতো চলেই যাচ্ছে, তাকে আটকাতে পারছিনা। আমার সোহাগ চলে গেছে এখন আমি বিধবা হয়েছি।" এ-কথা বলে সে তার জিহ্বাকে খণ্ডিত করে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্তুত হল। ততক্ষণ দৌড়ে এক ব্যক্তি এলো এবং বললো রাক্ষস ধরা পড়েছে। মৃগাবতী থমকে দাঁড়ালো, ভাবলো, "একে জিজ্ঞেস করে প্রিয়তমের সংবাদ নিই। যদি তার কিছু হয়ে থাকে তাহলে চিতা সাজিয়ে আগুনে জ্বলে মরবো।" ইতিমধ্যে দু'শর অধিক লোক দানবকে ধরে নিয়ে এলো। সে এত বিরাট ছিলো যে তাকে উঁচু করে নিয়ে আসা সম্ভবপর ছিলোনা। লোকজন তাকে প্রশ্ন করছিলো কিন্তু সে কোনও উত্তর দিচ্ছিলোনা, তপ্ত তেল তার শরীরে ঢেলে দেওয়া হচ্ছিলো কিন্তু সে মুনির মতো মৌনতা ধারণ করে ছিলো। কেউ বলছিলো, একে হত্যা করে ফেলে দাও, আবার কেউ বলছিলো, "একে অগ্নিদগ্ধ করোনা কেননা তাহলে ত্রিকূট জ্বলে যাবে। যেভাবে বলি বামন কর্তৃক বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পাতালে অবস্থান করছে, একেও তেমনি বন্ধন-দশায় রাখা দরকার।" মৃগাবতী বললো, "আমি একে দগ্ধ করবো যেভাবে পরীক্ষিতের শ্রাদ্ধে জন্মেজয় চিতা রচনা করে সর্প দগ্ধ করেছিলো।" পুনরায় সে বললো, "একে একেবারে হত্যা করা হবেনা, দুঃখ দিয়ে ধীরে ধীরে হত্যা করতে হবে। যতপ্রকার বন্ধন তোমরা জান ততভাবে একে বন্ধন কর, বজ্রগ্রন্থিতে একে বন্ধন কর যাতে সে মুক্ত না হতে পারে।"[২৩২]

তার হাতে হাতকড়ি দেওয়া হল এবং পায়ে লৌহশৃঙ্খল বাঁধা হল। লৌহশৃঙ্খলকে কাঁধের উপর টেনে নিয়ে ক্রমান্বয়ে সমস্ত শরীর বেষ্টন করা হল। তখন দানব কিছুটা শিথিল হল এবং বললো, "যদি তোমরা আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সকল ঘটনা ব্যক্ত করবো।" লোকেরা বললো, "তুমি যদি সব ঘটনা বল তাহলেই তোমাকে ছাড়বো।"

তাদের মধ্যে একজন বললো, "এ আর কোথায় যাবে? কিছুক্ষণের জন্য ছেড়ে দাও, দেখ কিছু বলে কিনা।" দানবের পায়ের বাঁধন খুলে তারা তাকে বসালো এবং বললো, "যদি তুমি সত্য সত্য সব স্পষ্ট করে বল তাহলে আমরা তোমাকে মুক্ত করবো।" ২৩৩

সে বললো, "কুমারকে তো আমি এখানেই রেখে গিয়েছিলাম, এবং পালাতে গিয়ে আমি এক গর্তে পড়ে গিয়েছিলাম। কেন, কুমারের কি কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে? আমি তাকে কেন উড়িয়ে নিয়ে যাব?" লোকেরা বহু চেষ্টা করলো কিন্তু সে কিছুতেই দোষ স্বীকার করলো না। কঠিন পাথর কি পানিতে গলে? পাথরের উপর যতই বৃষ্টি বর্ষিত হোক না কেন, সেখানেতো কোনও গাছ জন্মাবেনা। লোকেরা তখন বললো, "একে বেঁধে যন্ত্রণা দিতে থাকলেই কথা বলবে কিন্তু ছেড়ে দিলে নির্বাক হয়ে থাকবে। উৎপীড়ক কখনও রোষকে পরিত্যাগ করেনা, এও তেমনি। মহাজ্ঞানী ভোজ চতুর্দশ বিদ্যার নিদান জানতো এবং বররুচি তার চেয়েও একটি বিদ্যা অধিক জানতেন। রাজা তাকে একটি হার রাখতে দিয়েছিলেন, তিনি হারটিকে এমন ভাবে লুকিয়েছিলেন যে তার চিহ্ন বা সঙ্কেত কোথাও দেখা যাচ্ছিলোনা। বররুচি উত্তর দেননি। এও তেমনি। এ কখনই দোষ স্বীকার করবে না, সুতরাং একে বাঁচিয়ে রাখার অর্থ হয়না।" একথা বলে তাকে বেঁধে যখন উৎপীড়ন করা হল তখন সে শূকরের মতো চীৎকার করতে লাগলো। অষ্ট ধাতু দিয়ে তৈরী সিন্দুকে তাকে বন্দী করে রাখা হল। প্রলয়কাল পর্যন্ত সে সেখানেই থাকবে। ২৩৪

এদিকে দানবকে বেঁধে যখন নগরে পাঠানো হল তখন কুমার অবর্ণনীয় স্থানে অসহায় অবস্থায় ঘুরছিলো। মৃগাবতী বলতে লাগলো, "আমি কি করবো? যদি কেউ সংবাদ দেয় যে সে আকাশে আছে, তাহলে আমি আকাশে আরোহণ করবো। যদি কেউ বলে সে পাতালে আছে, তাহলে আমি হনুমানের মতো তাকে উদ্ধার করবো, অর্থাৎ যেমন করে পাতালে মহিরাবণ কর্তৃক বন্ধন দশায় আবদ্ধ রাম-লক্ষ্মণকে হনুমান মুক্ত করেছিলো তেমনি করে আমিও তাকে উদ্ধার করবো।" সে একটি বৃক্ষের ডালে হেলান দিয়ে কাঁদছিলো এবং বলছিলো, আমি কি করবো। প্রাণতো নিষ্ক্রান্ত হচ্ছেনা। সুস্বর কণ্ঠে সে উচ্চরোলে ক্রন্দন করছিলো এবং মৃগীর মতো নেত্রের রুধিরাশ্রুতে তার মুখ ভেসে যাচ্ছিলো। প্রিয়-বিয়োগে সে এমন ব্যাকুল হয়েছিলো যে তার শিরোদেশের আবরণ বিশৃঙ্খল দেখাচ্ছিলো। তার বেণীকে মনে হচ্ছিলো কৃষ্ণ উরগ যাকে ধরে ময়ূর বা কণ্ঠ চীৎকার করছিলো। ২৩৫

তার আর্তরোলকে মনে হচ্ছিলো কোকিলের পঞ্চম স্বর এবং সে-শব্দ শুনে বর্ষা ঋতু এগিয়ে আসছিলো। শব্দ করার সময় ওষ্ঠদ্বয় বিবৃত হচ্ছিলো যার ফলে মুখের সুগন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছিলো এবং ভ্রমর তখন পদ্ম-গন্ধ মনে করে রস-লোভে উড়ে আসছিলো। মধুকরের দংশনে বিরহিণী আকুল হল এবং এভাবে অবস্থার বিপাকে তরুণী আপন অস্তিত্বই ভুলে গেলো। বর্ষা উদিত হয়েছে দেখে আকাশ ঘনান্ধকারে ছেয়ে গেলো এবং পবন প্রবাহিত হতে লাগলো। মৃগাবতী পবনকে বললো, "হে পবন, তুমি আমার

সন্দেশ নিয়ে কেন যাচ্ছোনা ? সন্দেশ নিয়ে ভ্রমর বা প্রিয়কে বলবে তোমাকে ছাড়া মালতীর এমন অবস্থা হয়েছে যে তার হৃৎপিণ্ড শুধু তোমার নামের জপমালায় শব্দ করছে। প্রিয়তমের বত্রিশ গুণাবলী স্মরণে জেগে রাত-দিন তার হৃদয়কে দগ্ধ করছে।[২৩৬]

পবন সন্দেশ নিয়ে উড়লো এবং ভ্রমরা বা প্রেমীকে খুঁজতে লাগলো। সে দেখলো যে ভ্রমরের উপর বিপুল বিপত্তি পড়েছে, সে দেখলো যে ভ্রমর কমলের কলিকার মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে অর্থাৎ সংকটে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। লুব্ধ ভ্রমর তো কমলের কাছে আসেই কিন্তু এমন অসহায় অবস্থায় বসে থাকেনা। পবন ভ্রমরের কাছে মালতীর সন্দেশ প্রেরণ করলো। মালতীর নাম শুনে ভ্রমরের চৈতন্য হলো এবং সে ক্রন্দন করতে লাগলো। পবন ভাবলো দুটি প্রাণীর পরস্পরের প্রতি অনুরাগ আমরা কি করে জানি? তখনই জানি যখন অনুভব করি উভয় চিত্তের মধ্যে একই রতি আছে—যখন মালতীর মনে মধুকর নিবাস করে এবং মধুকরের মনে মালতী নিবাস করে। [২৩৭]

পবন বললো, "তোমার বিচ্ছেদে আকুল মালতীর মধ্যে আমি জীবনের সত্তার দেখিনি, তার সিঁথির সিঁদুরকে শ্বেত বর্ণের পেয়েছি। বিরহ-দাহের কারণে তার চোখের কজ্জল লাল হয়েছে এবং কপালের চন্দন তপ্ত হয়েছে। সে বিয়োগে অত্যধিক ব্যাকুল এবং অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে। ভ্রমর ছাড়া মালতী বনের মধ্যে শুকিয়ে যাচ্ছে। তোমার সন্ধান কেউতো তাকে বলছেনা, সেজন্য সে অনবরত দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।" কুমার বললো, "দৈব আমাকে এমন একটি স্থানে ফেলেছে যেখানে যেমন সাগর আছে তেমনি আকাশ আছে। আমার সন্দেশ নিয়ে যাবার লোক কোথায় এবং আমার বিপত্তির কথা কেইবা বলবে? এই সাগর অগম্য এবং অগোচর এবং এস্থানে একটি পক্ষীও নেই। আমার আজ সুদিন এসেছে কেননা দৈব তোমাকে আমার সান্নিধ্যে এনেছে। তুমি আমাকে যে অবস্থায় দেখলে সে-সংবাদ তাকে দেবে। তাকে আমি কি করে সন্দেশ দেবো যখন আমি তার নির্দেশ অমান্য করেছি এবং আপনাকে সংবরণ করতে পারিনি। তুমি তাকে গিয়ে সে-কথাই বলবে যা তোমার মনে হয়, আমি কিছুই বলতে পারবোনা।" একথা শুনে পবন মালতীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। মালতী তখন পবনের পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো। [২৩৮]

পবন মালতীকে বললো, "তোমার ভ্রমর সংকটে আবদ্ধ হয়ে রয়েছে। সুজন সূর্য উদয় হলে দুর্জন রজনী দূর হবে এবং যে-দুঃখে ভ্রমর পতিত হয়েছে সে-দুঃখও দূর হবে।" প্রিয়তমের খবর শুনে মালতীর বিপত্তিবোধ দূর হলো এবং সম্পত্তি সুখ তার শরীরে শিহরণ আনলো। সুরপতির অমৃত সিঞ্চনে যেন তার গাত্র শান্ত হলো এবং তার সিঁথির সিঁদুর যা এতোদিন শ্বেত ছিল তা আবার লাল হলো। সে বললো, "হে সহারণ পবন, তুমি বেগপূর্বক চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো এবং প্রিয়কে দেখবো এবং দেখে আমার নেত্র শীতল হবে। প্রিয়ের সমাচার আমার কাছে সঞ্জীবনী মূলের মতো যে সমাচার পেয়ে আমি আবার প্রাণ পেয়েছি।" [২৩৯]

পবন মালতীকে সঙ্গে নিয়ে কুমার যেখানে ছিল সেখানে এসে উপস্থিত হলো। মালতীরূপী সূর্যের প্রকাশ ঘটলো এবং কমল বিকশিত হলো অর্থাৎ সংকট সমাপ্ত হলো। মালতীর প্রভু ভ্রমর মুক্ত হলো। চার চক্ষুতে মিলন হলো যেমন পানির মধ্যে বুদ্বুদ্ মিলিত হয়। এখন এরা দু'জন রইলোনা, এক হয়ে গেলো। জীব এবং জীবের মধ্যে একই প্রাণগতি। প্রীতির কমলিনী লতা উভয়ের গাত্রকে একত্রিত করেছিল। ২৪০

তদনন্তর কুমার আপন বিপত্তির কথা মালতীকে বলতে লাগলো। সমস্ত সংবাদ শুনে মালতী বললো, "চলো আমরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করি এবং পুনরায় রসকেলিতে প্রবৃত্ত হই।" হর্ষিত হয়ে উভয়ে পবনের সঙ্গে গৃহে ফিরে এলো। প্রত্যাবর্তনের পর যে নগরে শুধু অন্ধকার রাত ছিলো সে-রাত প্রকাশ-পূর্ণ হলো। ২৪১

নগরের জনসাধারণ দৌড়ে এলো এবং অভ্যর্থনা-বাদ্য বাজালো। হর্ষিত যুগল আনন্দিত চরণে সিংহাসনে গিয়ে বসলো। সিংহাসনে বসে দরিদ্রকে বৈভব দান করলো, পরে উভয়ে শৃংগার এবং সজ্জন-সজ্জিত হয়ে এমনভাবে বিভূষিত হলো যে তার বর্ণনা দেওয়া যায়না। সন্ধ্যার পর পর নিশার আভরণ আসলো। শশীর সারথি অনঙ্গ জাগলো এবং তাদের উভয়ের মধ্যে অনুরাগ বৃদ্ধি পেলো। ২৪২

মৃগাবতী প্রশ্ন করলো, "অনঙ্গ কেন তোমার শরীরে বিকশিত হলো, তাকে দমন করবার কৌশল আমি জানি।" কুমার বললো, "হে বালা, যে তোমাকে সর্বস্ব দিয়ে আপনাকে বিস্মৃত হয়েছিল তাকে জানবার চেষ্টা করো। কাজের সম্মোহন বাণে আহত হয়ে প্রেমিক তখনই আবার জাগতে পারে যখন বশীকরণ ঔষধি সে পায়। শিরোদেশ থেকে পদ-নখ পর্যন্ত তুমিই সেই বশীকরণ। এই বশীকরণে দেবতা পর্যন্ত মুগ্ধ হয়, মানুষ তো কোন ছাড়। তুমি হচ্ছো গণ-গন্ধর্বের চক্রবর্তী এবং চিত্রভুবনের মদিরার সারাৎসার।" ২৪৩

একথা শুনে মৃগাবতী হাসলো এবং বললো "হে দীপক, যে মদমত্ত হয় তাকে কি করে চৈতন্যে আনা যায়? রমণী তার প্রিয়কে কি করে আপ্যায়ন করবে যখন প্রিয়তম তার অভিমানের ভঙ্গি বুঝতে পারেনা?" এ-সময় সরস্বতী এলো এবং দীপক রাগিণী গেয়ে শোনালো। দীপক এবং অগ্নির স্বরে সমস্ত শরীর কামনায় উদ্দীপ্ত হলো। সর্বশেষে সরস্বতী দীপকের স্তুতি যখন করলো তখন কুমার বললো, "হে মুগ্ধা, তুমি ধন্য, তুমি ধন্য।" ২৪৪

কুমার তখন অগ্রসর হয়ে যখন মালতীর দিকে হাত প্রসারণ করেছে তখন মালতী ভান করে চলে যাবার ভঙ্গি করলো। কুমার তখন দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরলো। কুমার প্রশ্ন করলো, "তুমি কেন অপ্রসন্ন হয়ে চলে যাচ্ছো? তোমার উপেক্ষার কারণ আমাকে বলতেই হবে? তোমাকে দেখে আমি বিকল হয়ে গিয়েছি। আমি একটি কঠিন দুঃখের মধ্যে পড়েছিলাম। হে শুভগা রমণী, তুমি তোমার পয়োধর অর্পণ করো। বহু যত্ন করে আমি দুঃখ থেকে মুক্ত হয়েছি। তুমি আমার সমস্ত নিরুক্তি শোনো।" ২৪৫

কুমার তার হাত ধরে রেখেছিল এবং রমণী তার চোখে চোখ ফেলছিলনা। কুমার বললো, "হে মৃগাবতী, আমার মন তোমার মনের সঙ্গে মিশে গেছে এবং আজীবন তা বিচ্ছিন্ন হবেনা। আমাদের প্রেমের বৎ সারাজীবনেও কখনো মলিন হবেনা, সাত সমুদ্র দিয়ে ধৌত করলেও।" তারা তখন শয্যায় গিয়ে মিলিত হলো। উভয়ে একে অন্যের অনুরক্ত হয়ে জগতের চিন্তা ভুলে গিয়ে প্রেম-সুরায় মত্ত হলো। শয্যায় মিলিত হয়ে তারা রসকেলিতে মগ্ন হলো। কুমার মালতীর অমৃত ফলতুল্য পয়োধর দলিত-মর্দিত করলো এবং অধর চুম্বন করে তার রস গ্রহণ করলো। ষোড়শ কলাযুক্ত চন্দ্রমাতুল্য যার মুখকান্তি সেই অবলা রমণী প্রেম-রসের তাৎপর্য উপভোগ করলো। [২৪৬]

রূপমিনী-বিরহ নিবেদন খণ্ড

এরা এদিকে দু'জনে রসভোগ করছিলো, ওদিকে রূপমিনীর দিন দুঃখে অতিক্রান্ত হচ্ছিলো। বরঞ্চ বলা যায় এক এক নিমেষ শত শত বর্ষের সমান ব্যতীত হচ্ছিলো এবং দিন ও রাত্রির অন্ত পাওয়া যাচ্ছিলোনা। বালা দিন-রাত্রি পথের দিকে তাকিয়ে থাকতো এ-আশায় যে সম্ভবতঃ প্রিয়তমের কুশল সমাচার কেউ পৌঁছে দেবে। করপল্লব দেখতে দেখতে শীঘ্রতার সঙ্গে দিন অতিক্রান্ত হল। বিরহ-সন্তাপ তার কায়া এবং তনুকে দগ্ধ করছিলো। পথ দেখিয়ে সে কাক উড়িয়ে দিতো অর্থাৎ যে-পথ দিয়ে উড়ে গেলে প্রিয়তমের দর্শন পাবার সম্ভাবনা সে-পথে কাক উড়িয়ে দিতো, এবং পথিক দেখলে তাদের হাতে সমাচার প্রেরণ করতো। সে বলছিলো, "সমাচারে আপন কথা নিবেদন করতে গিয়ে আমার বর্তমান অবস্থার বিবরণ অবশ্যই দেবে। বলবে একটি আঙ্গুলে পরবার জন্য যে-আংটি তৈরী হয়েছিলো বিরহে শরীর শীর্ণ হওয়ায় এখন এক সঙ্গে দুটি আঙ্গুলে সে-আংটি প্রবেশ করছে। আমি শুকিয়ে সুপারীর মতো হয়েছি, কেননা প্রিয়তম অপর স্ত্রীকে তাম্বুল-রাগ দিয়েছেন অর্থাৎ অনুরাগ দিয়েছেন। আমি প্রিয় বিনা পর্ণ বা তাম্বুলের মতো কাঁপছি। আমি চূর্ণ হয়েছি অর্থাৎ চুনার মতো হয়েছি এবং আমার চিত্তে অন্য কেউ উদিত হয়নি। বরয়া বলয় পরে আমি কাকে দেখাবো? দেখাতে পারতামতো একজনকে যে আমার চোলী এবং কসনী খুলতে পারতো। আমি পান খেয়ে স্বাদ পাচ্ছিনা। আমার প্রিয়তম উড়ে চলে গিয়েছে। বিরহের সরৌতা কায়াকে খণ্ড খণ্ড করে কাটছে, কিছুই আর অবশিষ্ট থাকছেনা। আমার গ্রহ বক্র বা কুটিল। যদিও দিনগুলো আপন আপন রাশির সময়ানুসারে চলাফেরা করে কিন্তু তারা আমার মধ্যে জড়তা প্রদান করে—সে জড়তা গ্রীষ্মের হোক বা শীতের হোক। এখন একা বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করছেনা, আপন হাতে জীবন নষ্ট করতে ইচ্ছা হচ্ছে। [২৪৭]

কান্ত আমার পেঁড়ী (পিণ্ড বা শরীর) ছেড়ে চলে গেছে (পানের লতার নিম্নভাগকেও পেঁড়ী বলে)। এজন্য আমার কায়া যা সবুজ লতা ছিলো এখন কুশের মতো হরিদ্রাভ হয়েছে। (এখানে একটি অর্থদ্বৈত আছে: 'হরীবেল বা সবুজ লতার অন্য অর্থ হচ্ছে 'বেলহরী' বা পান রাখবার পাত্র এবং সরপত বা কুশ বলতে সরৌতও বুঝায় যা দিয়ে সুপারী কাটা

হয়)। কান্তের অনুপস্থিতিতে কায়া কামের কর্পূর হয়ে জ্বলছে। (কপূরী এক ধরনের পানের নাম)। কিন্তু যেহেতু শরীর এক সময় স্বামীকে ভোগ করেছিলো তাই তা মরছেনা। আমার মতো নবোঢ়া স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করেছে; আমি শরীরকে হত্যা করছি এবং হৃদয়কে তার মধ্যে সমাহিত করেছি। জীবনবিহীন শরীর দিয়ে আমি কি করবো যখন কান্ত জীবন অপহরণ করে মমতা বিস্মৃত হয়েছে? সে মুখে মুখে মমতার কথা অনেক বলেছে তাতে আমি ভেবেছিলাম সে হৃদয় দিয়ে আমাকে গ্রহণ করেছে। আমি বুঝেছিলাম, সে স্নেহের দ্রবে সিক্ত হয়ে ডুবে রয়েছে, কিন্তু সে আমার কুবচনের ডোঙ্গা নিয়ে স্নেহ-দ্রব পার হয়ে চলে গেল।

আমার কায়া-বৃক্ষ বিরহের দাবাগ্নিতে জ্বলেছে, তার ছায়া বিনষ্ট হয়েছে এবং জ্বলে জ্বলে তা কালো হয়েছে। যে পক্ষী ছায়ার আশায় সে-বৃক্ষে অবস্থান করছিলো সে উড়ে পলায়িত হয়েছে। ময়ূরের বেশে যে-আনন্দ ছিলো তা চলে গিয়েছে, হর্ষের শুক চলে গিয়েছে। চিত্তের 'চিতরোখ' উড়ে গিয়েছে এবং হর্ষের পারাবত পলায়ন করেছে। যেহেতু শরীর-বৃক্ষ বিরহের অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, তাই সে-শরীরে ক্রীড়া এবং কৌতুক নেই। সকল প্রকার আনন্দ, হর্ষ, কামনা, উৎসাহ এবং কৌতুক যা চিত্তে ছিলো, এখন তার কিছুই নেই। শুধু রয়েছে সন্তাপ, দুঃখ, বিরহ এবং বিয়োগ—এরা আমাকে ছেড়ে যাচ্ছেনা। ২৪৮

উক্ত কায়া-বৃক্ষে দুঃখ ভুজঙ্গ হয়ে রয়েছে এবং সন্তাপ কোয়েল হয়ে আমার প্রাণ হরণ করছে। বিরহ রুদ্রকাক হয়ে রয়েছে এবং বিয়োগ ভুঙ্গরাজ হয়ে প্রাণ দগ্ধ করছে। আমার কায়া-বৃক্ষের প্রতি কৃতঘ্ন দাবাগ্নিতে জ্বলে সে উড়ে গেছে এবং সেই রয়ে গেছে যে কৃতঘ্ন। হে পক্ষীকুল, আমার মমতা ছেড়োনা, মুরারির রূপে আমার প্রতি মমতা কর। কোনও দিন যদি ভাগ্য অনুকূল হয়ে বায়ু প্রবাহিত হয়, তখন তরুবর সবুজ হয়ে ঘন ছায়া দেবে। তরুবর দাবাগ্নিতে দগ্ধ হয়েছে, এ-কারণে হে পক্ষীকুল, আমার মমতা বিস্মৃত হয়োনা। যদি কখনও বিধাতা পবন প্রবাহিত করে তখন বৃক্ষ সবুজ হয়ে ছায়া দেবে। ২৪৯

যদি এ-তরুবরে পুনঃ ছায়া হয় তখন নব কিশলয় উদ্‌গত হবে এবং তা ফলবান হবে। তখন একে ফলবান দেখে যে কাম্য করবে, তার মুখ দেখতে কেমন হবে? যে সঙ্কটের সময় পালিয়ে যায় সে আবার মুখ দেখায় কি করে? সে কি করে এখন তরুবরের ফল খাবে এবং তার ছায়ায় বসে বিশ্রাম করবে? সে-সব পক্ষীকুলের লজ্জা নেই যারা এক সময় উড়ে গিয়েছিলো, এখন আবার ছায়ায় এসে বসেছে এবং ফল খাচ্ছে। যে-পক্ষী দাবাগ্নির ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিলো সে কি করে এখন আবার তরুবরকে মুখ দেখায়? যার চলে যাবার সে চলে যাক। এখন আমি বিপত্তির মধ্যে আছি, ক্ষণকালের জন্যও আমার দুঃখ যাচ্ছেনা। ২৫০

বালা অর্থাৎ বালিকা ব্রাহ্মণ-পুরোহিত এবং পণ্ডিতগণের কাছে প্রিয়তমের আগমন সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগলো এবং রাত্রিতে 'কনসুঈ' বা গোপন বার্তা প্রেরণ করতে

লাগলো। তার নেত্র-পথ দেখতে দেখতে রক্তিম বর্ণ ধারণ করছিলো এবং এক এক নিঃশ্বাসে সে শত শত দুঃখকে প্রকাশ করছিলো। হৃদয়কে শাসন করে সে কোনো-রকমে প্রাণ ধারণ করছিলো কিন্তু তার কায়া অবিচল থাকতে পারছিলোনা কেননা তা প্রিয়কে কামনা করছিলো। পথে দাঁড়িয়ে সে তার প্রিয়তমের পথ দেখছিলো, বিরহ-সন্তাপের দাবাগ্নিতে তার চিত্ত দগ্ধ হচ্ছিলো। দণ্ডায়মান থেকে বালা মার্গ-পথ দেখছিলো এবং ক্ষণে ক্ষণে বাহু প্রসারিত করছিলো। সে ক্রন্দন করছিলো যেমন করে কূপের পানি উচ্ছলিত হয়ে প্রবাহিত হয়। ২৫১

সে বললো, "আমার চিত্তে অমর বেলী-সদৃশ বিয়োগ উৎপন্ন হয়েছে এবং ভোগের বা আকাঙ্ক্ষার তরুবর শুকিয়ে গেছে। চিত্ত মালী আম্রনিকুঞ্জ ছেড়ে গিয়েছে তার ফলে দিন দিন অমর বেলী বারবার সুযোগ পেয়েছে। বেলী প্রসারিত হয়েছে এবং বৃক্ষে তার ফল ধরেছে এবং বৃক্ষ শুকিয়ে গেছে আর তার একটি পাতাও থাকেনি। আমি সেই বৃক্ষের মতো, আমার ওপর বিপত্তি পড়েছে। যেদিন থেকে বিচ্ছেদ ঘটেছে প্রিয়তমের সঙ্গে, সেদিন থেকেই মোহহীন অবস্থায় আমি দুর্ভর জীবন যাপন করছি। কান্তই আমার সম্পত্তি, তাকেই আমি চাই অথবা কেউ যদি তার খবর এনে দেয় তাহলেই আমার মুক্তি। হে সখী, সম্পত্তি হচ্ছে প্রিয়ের সঙ্গে মিলন আর বিপত্তি হচ্ছে তার সঙ্গে বিযুক্তি। আমি এভাবেই সম্পত্তি এবং বিপত্তির ব্যাখ্যা করি--কিন্তু লোকেরা কি ব্যাখ্যা করবে আমি তা জানিনা।" ২৫২

সখীরা বললো, "তুমি যা ব্যাখ্যা করেছো তা ছাড়া অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই। যদি আর কেউ নতুন কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে, তা সে দিক। আমাদের মনে হয় তুমি যা বলেছো তার অতিরিক্ত আর কিছুই হতে পারেনা। প্রিয়তম যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জীবন নিঃশেষ হয়। সে কি করে জীবিত থাকবে যার প্রিয়তম কাছে নেই অথচ বাসনা নিবৃত্ত হচ্ছেনা? আকাশে মেঘের ধারার মতো তোমার মানসিক অবস্থা, হে বালিকা-বয়সী স্ত্রী, তোমার জীবনে শীত এসে নেমেছে।" সে তখন বললো, "হে সখী, শীত দশগুণ হয়ে নেমেছে এবং আমার প্রিয়তম আত্মগোপন করেছে। আমি আমার দুঃখের কথা কাকে বলবো। আমার শরীরে বাণ বিদ্ধ হয়েছে, যা আমার অঙ্গে প্রবেশ করে আমার শরীরকে ছিন্নভিন্ন করেছে। বসন্তের আগমনে জগতে বৃক্ষ এবং প্রাণী দশ-অঙ্গে যৌবন-প্রাপ্ত হয়েছে। এই সময় কাম এবং যৌবন নিয়ে সে-ই জীবিত থাকতে পারে ভাগ্য যাকে জীবিত রাখে।" ২৫৩

"আমি প্রিয়কে প্রাপ্ত হবার জন্য যোগ-জপ করেছি। শীত অত্যধিক ছিলো তাই আমি প্রিয়তমকে হৃদয়-পিঞ্জরে আবদ্ধ করবার চেষ্টা করেছি কিন্তু প্রিয়তো পিঞ্জরকে শূন্য করে চলে গেছে। জানিনা সেই মিথ্যাবাদী কোথায় যে চলে গেলো, কিন্তু আমি কাম এবং যৌবন নিয়ে বেদনার মধ্যে কোনোমতে বেঁচে আছি।" সখীরা বললো, "সূর্য যখন তপ্ত হয় তখন কমলিনী দিবসেই জ্বলে যায় এবং এ-ভাবেই পতি যখন অনুরাগ ত্যাগ করে চলে

যায়, তখন দিবস রাত্রির সমতুল্য হয়, সূর্য কমলিনীকে নষ্ট করে। যৌবন যদি চলে যায় যাক কিন্তু তুমি আপন মর্যাদা নষ্ট করোনা।" ২৫৪

সে তখন বললো, "হে স্বামী, তুমি বৃষ্টি হয়ে আমার কাছে আসো, কেননা সূর্য আমাকে এখন দগ্ধ করছে এবং নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, আমার প্রাণবায়ু অধরোষ্ঠে এসে উপস্থিত হয়েছে। সূর্য আমাকে বিনষ্ট করছে এবং তার দিবস দীপ্ত ক্ষমতায় সকল কিছু বিনষ্ট করছে, তুমি তোমার বাহু দিয়ে আমার গ্রীবাকে বেষ্টন করো। হে স্বামী, আমি তোমার কমলিনী লতা কিন্তু তোমার স্নেহ-রূপ বারি সিঞ্চন না হলে আমি তো শুকিয়ে যাবো। তুমি এখনই চলে আসো এবং মেঘ হয়ে বৃষ্টি বর্ষণ করো। যদি কমলিনী লতা উৎপীড়িত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় তখন বর্ষণ হলে লাভ কি ?" ২৫৫

রূপমিনী-সন্দেশ নিবেদন খণ্ড

একটি উঁচু এবং উত্তুঙ্গ ভবন ছিলো, রূপমিনী তার ওপর ওঠে প্রিয়তমের পথের দিকে তাকিয়ে ছিলো। সে ছাদের ওপর বসে ঘাড় উঁচু করে পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিলো। সামনে এক মান-সরোবর ছিলো, সে মান-সরোবরের দিকে দৃষ্টি ফেলছিলো। সরোবরে অনেক কমল এবং কুমুদ প্রস্ফুটিত হয়েছিলো এবং সেখানে অনেক শঙ্খ ছিলো। কমল এবং কুমুদ পরস্পরকে বলছিলো, "মনে হচ্ছে রাত্রি এসেছে এবং শশী স্থির হয়ে আকাশে জেগেছে, যেখানে বিচ্ছেদ ছিলো সেখানে মিলনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে কিন্তু মনে হয় আমরা ভ্রমিত হয়েছি।" তারা বলছিলো "এক শশী তো অস্তমিত হয়েছে এখন দ্বিতীয় শশী কোত্থেকে এলো ? যদি শশী এসেই থাকে তবে সম্ভবতঃ নক্ষত্রও তো থাকবে।" ২৫৬

রূপমিনীর ছায়া সরোবরে পড়েছিলো, তার গলার মুক্তার হার তারকারাজির মতো মনে হচ্ছিলো। তাই কমল এবং কুমুদ পরস্পর বলছিলো, "এ-নিশ্চয়ই শশী। রূপমিনীর ছায়া দেখে বিকশিত কমল পাপড়ি বন্ধ করলো।" কুমুদিনী বললো, "এ-রকম রূপ তো আমি কখনও দেখিনি ! এতো অপ্সরার রূপকে অতিক্রম করেছে।" রূপমিনী এদিকে বারবার বাহু উত্তোলন করে প্রিয়তমের পথের দিকে দৃষ্টিপাত করছিলো। ২৫৭

তখন সে-সময় এক বণিজারা অথবা বাণিজ্যকারী দল সেখানে এসে উপস্থিত হল। তারা সরোবরের তটপ্রান্তে আশ্রয় নিল। রূপমিনী তার এক কিঙ্করকে ব্যবসায়ীদের কাছে প্রেরণ করলো একথা বলে—"তুমি যাও এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করো, তারা কোন দেশ থেকে এসেছে।" কিঙ্কর বেপারীদলের কাছে এলো এবং তাদের নেতার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "নায়ক তোমার নাম কি, তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছো এবং কোন দেশের দিকে যাচ্ছো ?" দলনেতা উত্তর করলো, "আমরা চন্দ্রাগিরি থেকে এসেছি এবং কাঞ্চন দেশে যাবো।" আমি গণপতিদেবের পুরোহিত, আমি তার সন্দেশ নিয়ে এসেছি। ২৫৮

কিঙ্কর যখন কাঞ্চনপুরের নাম শুনলো, তখন সে বললো, "তুমি রূপমিনীর স্থানে চলো। রূপমিনী রাজার দুহিতা, সে হয়তো তোমার মাধ্যমে কিছু সন্দেশ দিতে পারে।" ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্যবসায়ীদলের নায়ক রূপমিনীর ভেট পেয়ে তার কাছে এসে নমস্কার করে আশীর্বাদ দিলো। রূপমিনী তাকে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার মাতা কি নামে তোমাকে ডাকে, আমার ভৃত্য আমাকে জানিয়েছে যে তুমি ভাগ্যশালী কাঞ্চনপুরে যাচ্ছো।" নায়ক উত্তর করলো, "রানী আমার নাম দুর্লভ, আমি বাণিজ্যের জন্যে যাচ্ছি, রাজকুমার যে দেশে আছে আমি সে-দেশেই যাবো।" ২৫৯

কুমারের নাম শুনে রূপমিনী ক্রন্দন করতে লাগলো, তার অশ্রুবিন্দুকে মনে হলো গজমুক্তার মতো। অথবা মনে হলো কূপ থেকে উচ্ছ্বাসিত হয়ে পানি ঝরে পড়ছে। সে বললো, "নায়ক, তুমি বসে আমার দুঃখের কথা শুনো, যে-দুঃখ কুমার আমাকে দিয়ে গেছে। পিতা আমাকে তার সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলো, কিন্তু সে আমাকে ছেড়ে কোথায় যে গিয়েছে, জানিনা। এবার দ্বিতীয় বছর হলো সে-ভাগ্যশালী আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। বর্ষা গর্জন করছে, সে-জন্য আমার শরীরে কামের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। হে দুর্লভ, তুমি কান্তকে প্রশ্ন করবে, সে কেনো এ-সময় আমার স্নেহ বিস্মৃত হয়েছে? ২৬০

তদনন্তর শ্রাবণ এলো, পৃথিবী সবুজে ভরে গেলো কিন্তু আমার মধ্যে বিরহের জ্বালা ছিলো। ধরিত্রী হর্ষিত হয়ে সবুজ কাপড় ধারণ করেছে কিন্তু আমি শয্যায় গভীর দুঃখ নিয়ে অবস্থান করি। রাত্রিতে প্রিয়বিহীন অবস্থায় আমি দুর্ভর সময় যাপন করি এবং আমার জীবন নেত্রে এসে জলবিন্দুতে পরিণত হয়। তরুণীর জীবন বিরহে আন্দোলিত হচ্ছে। জগতের জলাশয়গুলো যখন ভরিত-পূরিত হচ্ছে, তখন হে দুর্লভ, প্রিয় মিলনের আশা নিয়ে আমি সন্তপ্ত অবস্থায় মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি। বর্ষার সময় প্রিয় বিদেশে এবং আমি একাকী কুলীনা তরুণী। তুমি প্রিয়তমকে বলবে যে মুগ্ধা আমি কোকিল এবং শিখীর শব্দ শুনে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছি। ২৬১

ভাদ্র মাসে সঘন ধারে বর্ষণ হয়। বিজলী চমকায়, চতুর্দিক অন্ধকার হয়। রাত্রি অন্ধকারে তখন চিত্তে ভয় জাগে এবং আমার হৃদয় ফেটে যেতে চায়, কেননা কান্ত আমাকে বিস্মৃত হয়েছে। প্রিয়তম নিকটে নেই, তাই শয্যা ভুজঙ্গ হয়ে আক্রমণ করছে, দাদুর ডাকছে এবং ময়ুর কেকাধ্বনি করছে এবং আমার প্রাণ নিঃশেষ হচ্ছে। আমার জীবন পাপিয়া হয়েছে এবং আমার নেত্র মধু শ্লেষা হয়েছে। দুর্লভ, তুমি আমার অবস্থা যে-রকম দেখলে সে-রকমই তাকে বলবে। আমার নেত্র গঙ্গার তরঙ্গের মতো হয়েছে এবং শয্যা হয়েছে নৌকোর মতো। আমি ডুবে যাচ্ছি এবং আমার আয়ু নিঃশেষ হচ্ছে, কেননা আমি কান্তর দ্বারা পরিত্যক্ত। ২৬২

আশ্বিন দেখা গেল, বনভূমিতে কাশফুল ফুটলো, খঞ্জন এলো এবং সারস ডাকলো। অগস্ত তারার উদয়ের পর জল কমে এলো কিন্তু আমি ছিলাম পরিপূর্ণ গঙ্গার মধ্যে এবং তটপ্রাপ্ত খুঁজে পাচ্ছিলাম না। এর উপর বিরহের ভার ছিলো হাতির মতো, যে গর্জন

করে আমাকে জর্জরিত করছিলো। আমি তখন বলছিলাম, "হে আমার প্রিয়তম সঙ্গী, তুমি কোথায়?" মত্ত হস্তী গর্জন করে, হে প্রিয়, আমি আপন হৃদয়ের মধ্যে আত্মগোপন করি এবং শূন্য শয্যায় ভ্রমিত হয়ে ভীতত্রস্ত হই। যখন আমি ভয়ে ভীত হই মদমত্ত গজ তখন নির্যাসিত হয়ে উঠে এবং আমার কায়াবনকে বিধ্বস্ত করে। বিরহের কুঞ্জর আমার কায়াবনকে দলিত করছে, বিধ্বস্ত করছে। আমি তখন বলি, "হে প্রিয়, তুমি সিংহ হয়ে গলগর্জনা কর যেন বিরহের কুঞ্জর পলায়িত হয়।" ২৬৩

কার্তিক মাসে শরতের রজনী উজ্জ্বল ছিলো, শশী শীতল ছিলো কিন্তু আমি বিরহে জ্বলছিলাম। শ্বেত চাদরের শয্যা আমার ভালো লাগছিলোনা এবং অমৃতের তেজ বিকিরণকারী শশী বিষ নিক্ষেপ করছিলো। তাকে আমার কাছে দুর্জন বলে মনে হচ্ছিলো। আমার হৃদয়ে প্রীতি দ্বিতীয়ার চন্দ্র হয়ে অবস্থান করছিলো এবং প্রিয়-তমের প্রীতি পূর্ণিমার শশী হয়ে ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিলো। আমি বললাম, "হে প্রিয়, আমার ধারণা ছিলো তোমার প্রীতি একবার নিমগ্ন হয়ে পুনরায় দ্বিতীয়ার শশী হয়ে জাগবে কিন্তু হে দুর্লভ, তুমি কান্তকে বলবে আমার নিকট সে পূর্ণিমার শশী হয়ে উত্তরোত্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে।" ২৬৪

জগতে অগ্রহায়ণে শীতের সূত্রপাত ঘটায়। হেমন্ত এসেছে কিন্তু প্রিয় আসছেনা। রাত্রি ক্রমশঃ দীর্ঘ হচ্ছে। এ-দীর্ঘ রাত্রিকে সঙ্গিনী রূপে পেয়ে আমার দুঃখ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আমার সুখ দিবসের মতো ক্ষীণ হয়ে চলেছে। আমি বলি, "যৌবনের ছায়া নিমেষমাত্র থেকে চলে যায় এবং চলে গিয়ে আর ফিরে আসেনা। বিরহে আমার তনু পাণ্ডুর হয়ে আছে আমি যোগিনীর বেশ ধারণ করে আছি। হে স্বামী, আমার জীবন নিষ্ফল যাচ্ছে, আমার ভরা যৌবনে তুমি এসে বিলাস করো।" হে দুর্লভ, যে প্রকারে অঞ্জলি ভরা পানি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায় যৌবনও সে-ভাবে নিঃশেষ হয়ে যায়, যৌবনের সময় দ্রুত ক্ষীণ হতে থাকে, এই কারণে ক্ষণমাত্র প্রেমকে ছাড়তে নেই। ২৬৫

হে দুর্লভ, পৌষ এসেছে এখন আমি প্রিয়-বিয়োগ এবং শিশিরে সন্তপ্ত হচ্ছি। তুষার পড়ছে, বরফ জমাট বাঁধছে, শয্যা হিম-শীতল হচ্ছে এবং আমি রমণী গলিত হচ্ছি। শয্যায় আমি একাকিনী, প্রিয়তম আমার কাছে নেই, আমি আমার বুকে এবং স্তনের ওপর আমার বাহু রাখছি। বিরহ শ্বেতচাদর হয়েছে এবং শীত প্রচণ্ডভাবে এসেছে, এই দুই দুর্জনের মধ্যে আমি অচেতন হয়ে পড়ছি। চিত্ত অচেতন হয়েছে, সে-অবস্থার কথা আমি বলতেও পারিনা। হে দুর্লভ, তুমি অবস্থার কথা বুঝে প্রিয়তমকে সবকিছু বলবে। বলবে, "প্রিয়তম এবং আমার মধ্যে হাড়ের সঞ্চরণ নেই, কাপড়েরও ব্যবধান নেই অথচ সে অন্তর সৃষ্টি করেছে এবং ব্যবধান হিসেবে পর্বত এবং সাগর তৈরী করেছে। ২৬৬

এরপর এলো মাঘ এবং সঙ্গে সঙ্গে এলো প্রচণ্ড দুঃখ। এই দুঃখের মধ্যে আমি কি করতে পারি। একেতো আমি সংবরণও করতে পারছিনা। প্রচণ্ড শীতের পবন প্রবা-হিত হচ্ছে অথচ আমি বিরহে জ্বলে-পুড়ে মরছি। আমার দাঁত কাঁপছে এবং প্রচণ্ড

শীতে আমি নির্যাতিত হচ্ছি। হে প্রিয়, তুমি সূর্য হয়ে যদি তাপ বিকিরণ করো তবেই আমার শীত যাবে। হে স্বামী, তুমি আমার ওপর তাপ বর্ষণ করো যার ফলে দুঃখের ছায়া সপ্ত-পাতালে চলে যাবে। কতো সুন্দর ঋতু এলো এবং চলেও গেলো, কিন্তু হে প্রিয়, তুমি ফিরে এলেনা। তুমি আমার শয্যায় বিরহের সন্তাপ ভরে দিয়েছো। তোমার বিরহে আমার সুখ হারিয়ে গেছে, যেভাবে রাবণ সীতাকে অপহরণ করেছিলো সে-ভাবেই তোমার বিরহ আমার সুখকে হরণ করেছে। তুমি এসে বিরহরূপ নিশাচর রাজাকে সংহার করো, যেভাবে রঘুনন্দরাম রাবণকে হত্যা করেছিলো।[২৬৭]

ফাল্গুনে সমস্ত জগতে ফাগ খেলা চলছে এবং আমি তখন আমার জীবনকে হোলীর মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছি। আমি মনে মনে বলেছি, আমি তার আশায় জলে ভস্ম হয়ে যাব কেননা তাহলে আমার ভস্মীভূত শরীর উড়ে তার কাছে উপস্থিত হতে পারবে। বিরহের স্পর্শে আমার অশ্রু রক্তিম হয়েছে এবং সিঁথির সিঁদুর লোহিত বর্ণ হয়েছে। পবন আমাকে সন্তপ্ত করে রেখেছে এবং গৃহের অঙ্গন, শয্যা এবং মন্দির আমার অবস্থানের জন্য অসম্ভব হয়েছে।[২৬৮]

বসন্ত এভাবেই আমার জন্য নিস্ফল গেলো এবং আমার প্রিয় বিদেশে অন্যের হয়ে বিচরণ করছে। এখন তো ফাগের পর্ব, সুহাবনা বসন্তকাল এবং মদমত্ত যৌবন-বৃক্ষের পূর্ণপত্র ঝরে পড়ছে কিন্তু হে কান্ত, তুমি এখনও এলেনা।[২৬৯]

চৈত্র মাসে চতুর্দিকে নবপল্লবের সৃষ্টি হয়েছে তখনও বিরহ আমার শরীরকে দগ্ধ করছে। বনস্পতি মুকুলিত হয়েছে এবং জগৎ প্রফুল্লিত হয়েছে কিন্তু আমার প্রিয় অন্য কারো মকরন্দ নিয়ে আমাকে ভুলে রয়েছে। কাননে পিক পুনরায় পঞ্চমস্বরে গান করছে, যার ফলে যৌবনের কলিকা বিকশিত হচ্ছে। কিন্তু যখন আমার জীবনে পরিমল দেখা গেলো তখনও প্রিয়তম আমাকে বিস্মৃত হয়ে রইলো। যখন আমার বাগান প্রফুল্লিত এবং সুন্দর তখনই সে আমার কাছে নেই। আমার জন্ম অর্থহীন, গভীর অরণ্যের মালতীর মতো। হে ভ্রমর, তুমি মালতীকে বিস্মৃত হয়োনা কেননা সে কোনো অপরাধ করেনি। হে প্রিয়, তুমি বন্ধুরীর বচন কান পেতে শুনো এবং তাকে চিত্তে ধারণ করো।[২৭০]

বৈশাখে বৃক্ষে ফল ধরেছে। আমি মনে মনে বলছি, হে ভাগ্যশালী প্রিয় এবং কান্ত, তুমি এসে এ-ফলগুলি ভোগ করো। আমি তোমার যোগ্য অমৃত রেখেছি তুমি বেগপূর্বক এসে তার রস ভোগ করো। আমি আম্ররাজিকে এখন পর্যন্ত রক্ষা করেছি কিন্তু এখন দুর্জনরূপ দুঃখের কারণে তাকে আর রক্ষা করা যাচ্ছেনা, বিরহরূপ সুক ফলগুলো খেয়ে যেতে চাচ্ছে এবং আমি তাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছি। হে স্বামী, আমি এই বিরহ-সুককে কতোদিন পর্যন্ত দূরে সরাবার চেষ্টা করবো। কেননা আমি তো একে অল্প-বয়সী, দ্বিতীয়তঃ নির্বল। পারাবত তার নারীর জন্য রোষযুক্ত হয় যখন সে দেখে তার নারী অন্যের হাতে পড়েছে। কিন্তু তুমি আমাকে হর্ষের মধ্যে স্থাপিত করে তদনন্তর বিরহের মধ্যে নিক্ষেপ করেছো।[২৭১]

জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য দাবাগ্নি জ্বেলেছে, লু হাওয়া প্রবাহিত হচ্ছে, মনে হচ্ছে চতুর্দিকে অগ্নিদাহন হচ্ছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের তাপ যেন অঙ্গার বর্ষণ করছে এবং এর ফলে কাম-ঋতুও তপ্ত হচ্ছে। আমার কঞ্চুক এবং চীর তপ্ত হয়েছে এবং শরীর অতি বিকল হয়েছে। এ-মুহূর্তে হে শীতল প্রিয়, তুমি আমার নিকটে আসো এবং শর্করা সহযোগে দধি পান করো তাহলেই আমার পিপাসা চলে যাবে। হে প্রিয়, তুমি মলয়াগিরির চন্দন হয়ে আসো, গ্রীষ্মে আমার উত্তপ্ত শরীরকে শীতল করো। হে দুর্লভ, তুমি কান্তকে বলবে সে যেন অবনমিত হয়ে আসে, নাহলে বিরহসূত্র আমাকে জ্বালিয়ে দিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। ২৭২

এরপর গগনে গর্জন করতে করতে আষাঢ় এসে পড়লো এবং কুঞ্জরযূথ হয়ে মেঘ-দল আকাশে ছড়িয়ে গেলো। চতুর্দিকে বিজলী চমকাচ্ছে; হে প্রিয়, স্মরণ করো বর্ষা ঋতু এসে গিয়েছে। এখনতো কেউ বাইরে ঘোরাফেরা করছে না, সবাই গৃহে প্রত্যাগত হচ্ছে কিন্তু তুমি এখনও বিদেশেই রয়ে গেলে। এ-বর্ষায় তো পথ চলা যাচ্ছেনা কেননা বর্ষণে পথের কোনো চিহ্নই নেই। এখন আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারছিনা। পথ দেখা যাচ্ছেনা, তুমিও আসছোনা, জগৎ জলভারে অভিষিক্ত। হে দুর্লভ, শ্রাবণ এলো এবং জগৎ জলভারে প্রপীড়িত হলো। ২৭৩

আমি তোমার কাছে আমার সমস্ত দুঃখের বার্তা বলেছি, আমি দুঃখের ভরা-গঙ্গার মধ্যে ডুবে রয়েছি। কেউ আমাকে তটে নিয়ে আসছেনা। হে দুর্লভ, তুমি আমার প্রিয়তমকে বলবে, হে গুণবান প্রিয়, তোমার গুণ-রশির টানে আমার নৌকো মধ্য গঙ্গায় এসে পড়েছে। এখন সে জলাবর্তের মধ্যে। তুমি বেগপূর্বক আসো তা নাহলে সে ডুবে যাবে। বিনা কর্ণধার নৌকো তো তীরে পৌঁছুতে পারছেনা। স্নেহের সাগর অত্যধিক গভীর, সেই গভীরে বহিত্র ডুবে যাচ্ছে। এই দুঃখের মধ্যে হে প্রেমী, তুমি তো নিকটে নেই, প্রতি-ক্ষণেই সুখের হানি ঘটছে। অমোঘ স্নেহ-সাগরের মধ্যে ডুবে আমি যে হারিয়ে যাচ্ছি, সে-দুঃখের কথা কাকেই বা বলবো। ২৭৪

এ-দৃশ্য দেখে এবং সন্দেশ শুনে ব্যবসায়ীদলের নায়ক বাণিজ্যের পথে চললো, রূপমিনী যে-বিরহ-বিয়োগের সন্তাপ তাকে জানালো তাতে সেও সন্তপ্ত হলো। মৃগাবতীকে বলবার জন্য রূপমিনী ব্যবসায়ীদলের নায়ককে এ-কথা বলেছিলো, আমি তোমার চরণে স্মরণ নিচ্ছি, তুমি আমার প্রিয়তমকে মুক্ত করে দাও। হে শ্যামা, তুমি হৃদয়ে বিচার করে দেখো যে প্রিয়বিহীন শয্যায় কি করে জীবন যাপন করা যায়, তুমি আমাকে যে-পীড়া দিয়েছো তা আমি সহ্য করতে পারছিনা। কামের দাহনে আমি জ্বলছি। করপত্র বা করাত দিয়ে মস্তকে আঘাত করলে যে-দুঃখ হয় আমার এই বিরহ-দুঃখ তার চেয়ে অনেক অধিক। কোনো স্ত্রী সহ্য করতে পারেনা যে তার স্বামী অন্যকে কামনা করুক। ২৭৫

আমার সিংহাসন দুর্ভর হয়েছে, শয্যায় শয়ন অসম্ভব হয়েছে এবং নয়নে নিদ্রা নেই। প্রিয়তমের জন্য আমার এক এক নিমেষ এক এক যুগের মতো মনে হচ্ছে, এভাবে দুঃখের মধ্যে আমি এক বর্ষ পাড় করেছি, এখন আমার প্রাণ সংশয় এবং সে-প্রাণ

আমার শরীরের মধ্যে থাকতে চাচ্ছেনা। হে তরুণী, তুমি তো আমাকে খেয়ে ফেলছো, তোমার ওপর আমি হত্যার দোষারোপ করে মৃত্যুতে গত হবো। চিত্তে বিচার করে দৈবের ভয় করো। নারী-হত্যা ব্রাহ্মণ এবং গো হত্যার চেয়ে অধিক। আমার উন্মাদ হৃদয় বুঝতে চাচ্ছেনা, সে প্রিয়কে কামনা করছে এবং নিত্যই রোদন করছে। ২৭৬

দশ সহস্র প্রাণীর ভাররূপ সন্দেশ নিয়ে নায়ক সে-দেশে উপস্থিত হলো যে-দেশে রাজকুমার ছিলো। যে-পথ দিয়ে কুমার গিয়েছে নায়ক সে-পথ খুঁজে বের করলো। রাজ-কুমারের গমন পথে ব্যবসায়ীদল রূপমিনীর বিরহের গাথা চিৎকার করে বলতে লাগলো, মনে হচ্ছিল যেন আগে আগে বিরহ চলছে এবং তার পিছনে ব্যবসায়ীদল। পথ দীর্ঘ ছিল, সে-দীর্ঘ পথ ব্যবসায়ীদল অতিক্রম করছিলো। ২৭৭

বিরহাগ্নিতে ঘর বন তৃণ সবই জ্বলে যাচ্ছিলো। পথ চলতে চলতে তারা এক সমুদ্রের সামনে এলো। বিরহাগ্নিতে সে-সমুদ্রের পানিও শুকিয়ে গেলো। তদনন্তর কজ্জলীবন এলো, কামাগ্নিতে সে-বনও জ্বলে গেলো, সেখানে ব্যবসায়ীদলের সঙ্গে গডরিয়ার দেখা হলো। তাকে তারা জিজ্ঞেস করলো "তুই কে? এখানে কোনো গ্রাম নেই, তুই একা এখানে কি করছিস? তুই আমাদের কাঞ্চনপুরের পথ দেখিয়ে দে। এখান থেকে কাঞ্চনপুর কতো যোজন দূর তুই আমাদের সত্য করে বল?" ২৭৮

গডরিয়া বললো, কাঞ্চনপুর এখান থেকে একশ যোজন দূরের পথ। এক যোগীও সে-পথে গিয়েছে। সে দু'তিনদিন আমার গৃহে আতিথ্য নিয়েছিলো। তাকে আমি খুবই আপ্যায়ন করেছিলাম। কিন্তু একদিন আমাকে ঘুমন্ত পেয়ে সে আমার চোখ উৎপাটন করে সমস্ত পুঁজি নিয়ে পালিয়ে গেছে। যোগীর জাতি কৃতঘ্ন হয়। ২৭৯

সে এ-কথা বলে পথ দেখিয়ে দিলো এবং বললো, "পথ তো এটাই, সকলেই এ-পথে যায়।" এরা দু'মাসের মধ্যে কাঞ্চনপুর নগরে এসে পৌঁছলো। তারা এক আম্ররাজির মধ্যে উপস্থিত হলো, সেখানে পুষ্করিণী ছিলো এবং অবস্থানগৃহ ছিলো। নগর ছিলো সুন্দর এবং নগরের মানুষের কথাবার্তাও ছিলো সুন্দর। ব্যবসায়ীদলের নায়ক স্থানীয় লোকদের জিজ্ঞেস করলো, "এখানকার রাজা কে?" তারা উত্তর দিল, "এখানকার রাজার নাম রাজকুমার এবং মৃগাবতী তার স্ত্রী।" ২৮০

তারা যখন রাজকুমারের নাম শুনলো এবং মৃগাবতীর। তারা বললো, "হে দৈব, তুমি কৃপা করে উভয়কেই মিলিয়ে দিয়েছো। আমরা যার সন্ধানে এসেছি তাকে পেয়েছি কিন্তু তার সঙ্গে পরিচয় কি করে হবে? যে বিধাতা পথ দেখিয়েছেন তিনিই আমাদের পরিচায়ক হবেন। এ রাজকুমার সুলক্ষণ সম্পন্ন।" ২৮১

সন্দেশ প্রাপ্তি খণ্ড

কাঞ্চনপুরের ব্যবসায়ীরা শুনলো যে বিদেশ থেকে বাণিজ্যের জন্য একটি দল এসেছে। তারা নিজেদের মধ্যে বললো, "চল, আমরা এদের কাছ থেকে বাণিজ্যের পদার্থ ক্রয়

করি। এবং আরও যদি কিছু পাওয়া যায় তাও নেব।" তারা এলো এবং সম্ভাষণ করে বসলো। ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চললো এবং তারা বললো, "আমরা মধ্যবর্তী ব্যক্তি হয়ে তোমাদের সকল বাণিজ্য পদার্থ ক্রয় করতে চাই।" "নায়ক হেসে বললো, "আমরা তখনই বাণিজ্য করবো যখন তোমাদের রাজা এখানে আসবেন।" ২৮২

কাঞ্চনপুরের ব্যবসায়ীরা বললো, "এরা কি উন্মাদ না মদমত্ত ? এরা কি করে ভাবতে পারলো রাজা এখানে আসবেন ? রাজা যা কিনবেন সে-সব সামগ্রী কি এদের কাছে আছে ?" কাঞ্চনপুরের ব্যবসায়ীরা চলে গেল, কিন্তু রাজার কানে সংবাদ পৌঁছলো যে বিদেশীরা রাজার সঙ্গে বাণিজ্য করতে চায়। রাজা তখন প্রশ্ন করলেন, "এরা এমন কি সামগ্রী এনেছে যার প্রতি আমার আকর্ষণ হবে ?"

তখন রাজার পক্ষ থেকে লোক দৌড়ে এসে নায়ককে বললো, "হে নায়ক, চল, রাজা তোমাকে ডেকেছেন। নায়ক বললো, একটু অপেক্ষা কর, আমি কিছু উপঢৌকন নিয়ে নি। লোকেরা দরজায় দাঁড়িয়ে রইলো এবং নায়ক দ্বাদশ তিলক নিলো। ধুতি পরলো, গায়ে জামা দিল এবং পুস্তকের পুটুলি বগলে নিলো। তার মনে রূপমিনীর বারমাস্যার কথাগুলো জাগছিলো। দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, উচাটন এবং বিরহ-দুঃখের ভেট নিয়ে সে চললো যেখানে রাজা বসেছিলেন। ২৮৩

সে ব্রাহ্মণ হিসেবে অল্প কিছু যা জানতো তাই বলে রাজাকে আশীর্বাদ করলো। কুমার তাকে নিরীক্ষণ করে পণ্ডিত বলে চিনলো। তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি তোমার নাম বল এবং স্থানের পরিচয় দাও। সে বললো, "রাজা, আমার নাম দুর্লভ এবং চন্দ্রা-গিরি হচ্ছে আমার বাসস্থান। আমি গণপতিদেবের পুরোহিত, তিনিই আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছেন। পথে অনেক দুঃখ দেখে আমি এখানে এসেছি কিন্তু তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে আমার আশা পূর্ণ হয়েছে।" ২৮৪

পিতার নাম শুনে কুমারের চিত্ত ভাবপূরিত হল। সে বললো, "দুর্লভ, সত্য বল, পিতাই কি তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন ?" দুর্লভ বললো, "তাছাড়া আমার এমন কি কাজ থাকবে যে আমি এখানে আসবো ?" কুমার বললো, "তুমি আমার পিতা-মাতা এবং কুটুম্বদের কুশল বিবরণ দাও।" দুর্লভ বললো "সকলেই কুশলে আছেন। শুধু তোমার মাতার মন তোমার বিরহে তাপিত রয়েছে। তিনি অনেক সন্দেশ প্রেরণ করেছেন।" কুমার বললো, "তাঁর সন্দেশের বিস্তারিত বিবরণ দাও।" ২৮৫

দুর্লভ বললো, "প্রথমে তোমার পিতার সন্দেশ শ্রবণ কর। যে-দিন তুমি পরদেশে গেলে সে-দিন থেকেই তিনি রাজ্যত্যাগী। ভৃত্যরাই এখন রাজকার্য পরিচালনা করে। কাঁদতে কাঁদতে তার চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। তিনি অন্ন-পানি কিছুই গ্রহণ করেন না। তোমাকে ছাড়া তাঁর অবস্থা হয়েছে সূর্যবিহীন দিনের মতো। তোমার মাতার অবস্থাও তোমার পিতার মতো। কিন্তু যে বালিকাকে তুমি বিয়ে করে রেখে এসেছ, তার

বৃত্তান্ত শুনে আমার বুক দুঃখে ফেটে গেছে। সে আমাকে বলেছে, সে যোগিনীর বেশ ধারণ করে তোমার কাছে আসবে। তার শরীর এখন তোমাবিহীন অবস্থায় রক্তশূন্য এবং রিক্ত। তার সকল সখী তাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করে কিন্তু সব প্রযত্নই অর্থহীন হয়। সে রাতদিন শুধু বিলাপ করে। সে তার গৃহে কখনও দীপক জ্বালায়না। সে বলে, পতি-বিহীন গৃহে প্রদীপের কি প্রয়োজন ? অন্ধকারেই আমার সুখ। গৃহ উজালা করে আমি কার মুখ দেখবো ?" ২৮৬

কুমার বললো, "দুর্লভ, আমি পাঁচ সাতদিনের মধ্যেই প্রত্যাগমন করবো। এখানকার কিছু ব্যবস্থা করেই আমি যাত্রা করবো। অগস্ত্য তারকা উদিত হোক এবং পানি শুকিয়ে যাক, তখনই আমি ঘোড়ার পিঠে চাবুক দেব।" কুমার রাজভবনে এসে মৃগাবতীর সঙ্গে চর্চা করলো, "আজ পিতার ব্রাহ্মণ এসেছেন, তার কাছে পিতা-মাতার সংবাদ পেলাম। তাদের আয়ু মৃত্যুর নিকটে, তাঁরা বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের কেশ পাণ্ডুর হয়েছে, লোচনে দৃষ্টি নেই। এখন তুমি বল, আমি কি করি।" মৃগাবতী বললো, "স্বামী, তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার দাসী। তুমি যা বলবে তাই আমার শিরোধার্য। রায়ভানের উপর রাজ্য অর্পণ করে আজই চল আমরা যাই। সকল ভৃত্যকে ডেকে বলে দাও, "যতদিন পর্যন্ত আমি না ফিরি, বালক রায়ভানের পক্ষে তোমরা রাজ্য পরিচালনা করবে।"২৮৭

কাঞ্চনপুরে কুমার চার বৎসর পর্যন্ত ছিলো। এ-সময়ে মৃগাবতীর দু'পুত্রের জন্ম হয়, এক পুত্রের নাম রায়ভান, অন্যটির নাম কর্ণরায়। রায়ভানকে রাজা তিলক দিলো।২৮৮

অগস্ত্য উদিত হল, পানি সরে গেল, রাজা তুরঙ্গের উপর বসলো। জনসাধারণ বললো, 'রাজকুমার পুত্রকে কাঞ্চনপুরের গদীতে বসিয়ে চন্দ্রাগিরি যাচ্ছে। অর্ধেক রাজ্য-পাট সে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে এবং অর্ধেক রায়ভানকে দিয়ে যাচ্ছে।' মৃগাবতী সকল সখীকে ডেকে উপঢৌকন দিলো, বললো, "দৈব যদি আবার সুযোগ দেয় তবেই হয়তো আবার আমাদের দেখা হবে। আমি দূরদেশের জন্য চিত্তকে প্রস্তুত করেছি।" কাঞ্চনপুর থেকে তারা তখন প্রস্থান করলো, রায়ভান পিতা-মাতার কাছ থেকে বিদায় নিলো। রাজকুমার ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলো, মৃগাবতী উঠলো চৌডোলায়। পথে যেতে যেতে রাজ-কুমার দেখলো অন্ধ গডরিয়া বসে আছে। তাকে ফেলে রেখে তারা আবার চললো। সুবুধ্যানগর যখন নিকটে এলো, কুমার দুর্লভকে বললো, "তুমি রূপমিনীর কাছে যাও।" ২৮৯

এদিকে সুবুধ্যায় প্রচার হল যে কোনও এক বিদেশী রাজা নগর আক্রমণ করেছে। জনসাধারণ বিভিন্ন স্থানে মন্ত্রণায় বসে গেল। দেবরাজ সবাইকে আহ্বান করলেন এবং মন্ত্রণা চাইলেন। কিন্তু কেউ কোনও উপায়ের কথা বললোনা। নগরে হৈ-হুল্লা হতে লাগলো, কিন্তু রূপমিনীর চিত্ত কেন যেন ভাবাভিভূত হল। তার এক সখী জিজ্ঞেস করলো, "এতদিন তোমার স্বামীর অদর্শনে তোমাকে বিকল দেখেছি কিন্তু আজ তোমাকে পুলকিত দেখাচ্ছে, এর কারণ কি ?" রূপমিনী এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বললো, "হে সখী, যে-দিন প্রিয়তমের কুশল সমাচার পাব, সে-দিনের আনন্দ কেমন হবে ? আমার বহুদিন চিন্তায়

কেটেছে। কিন্তু সেদিন দুটি নেত্র যখন সুখনিদ্রায় নিমগ্ন, তখন স্বপ্ন দেখলাম চতুর্দিকে মেঘ জমেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে এবং আষাঢ়ের সূচনা হয়েছে, কোকিল ডাকছে, দাদুর শব্দ করছে, পাপিয়া পিউ পিউ করছে। যখন অন্য এক ঋতু তখনই আমি আষাঢ়ের স্বপ্ন দেখলাম। আষাঢ়ের বর্ষণ হচ্ছে দেখলাম, ধরিত্রী সিক্ত ও স্নিগ্ধ হল, সাগর ভরে গেল, আমার হৃদয় হর্ষিত হল। কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গে শয্যা শূন্য দেখলাম। এক সখী স্বপ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বললো, "মনে হচ্ছে তোমার স্বামী আসবেন। এ-স্বপ্নে সজীবতার নির্দেশ আছে।" এ-সময় দুর্লভ তার দ্বারপ্রান্তে এলো। সে প্রতিহারকে বললো, 'তুমি যাও এবং কুমারীকে বলো, কুমার প্রত্যাবর্তন করেছে।" কুমারী তখন কাক উড়াচ্ছিলো একথা বলে, "হে কাক, যদি স্বামী আসবেন বলে মনে হয়, তুমি উড়ে যাও।" কুমারী দু'বাহু উঠিয়ে কাক উড়াতে যাচ্ছে এমন সময় সংবাদ এলো কুমার এসেছে। এ-সংবাদ শুনে তার বুকের কাঁচুলি ফেটে গেল, তার শ্যামল বর্ণ রক্তিম হল, এবং তার শরীরে সুখের আগমন হল। কুমারী বললো, "দুর্লভকে আমার কাছে আন, আমি তার পদস্পর্শ করবো।" দুর্লভ এলে কুমারী তাকে বললো, "তুমি আমার পিতাকে সংবাদ দাও। বিদেশী কেউ আসেনি, কুমার এসেছে।" দুর্লভ গিয়ে রাজাকে এই সংবাদ দিল। রাজা তখন লোক-জন নিয়ে রাজসভায় বসেছিলেন। রাজা সংবাদ শুনে উল্লসিত হলেন এবং বললেন, "তোমরা সবাই এগিয়ে গিয়ে কুমারকে অভ্যর্থনা কর।" এদিকে কুমার মৃগাবতীকে বললো, "বিবাহিতা স্ত্রীকে কেউ পরিত্যাগ করতে পারেনা।" মৃগাবতী বললো, "যা তোমার হৃদয়ে রচিত হবে তাই আমার শিরোধার্য।" সকলেই বলতে লাগলো, 'রূপমিনীর ভাগ্য ধন্য। রূপমিনীর কামনা পূর্ণ হয়েছে, কেননা কুমার গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছেন।' ২৯০

বিরহ-সূর্য ক্ষীণ হতে হতে অস্তমিত হল। উজ্জ্বল চন্দ্র আকাশে উদিত হলো। শয়নমন্দির সুসজ্জিত করা হল। রূপমিনী শৃংগার করে সেখানে এলো এবং নানাভাবে মান করতে লাগলো। কুমার জিজ্ঞেস করলো, "কেন তুমি নিকটে আসছোনা।" রূপমিনী উত্তর দিলো, "কৃতঘ্ন কি করে তুমি আমার দিকে দৃষ্টি ফেলো ? একথা বলতে তোমার লজ্জা হয়না ?"২৯১

কুমার হেসে তার আঁচল ধরলো, রূপমিনী অভিমান করে সরে যাবার চেষ্টা করলো। রূপমিনী বললো, "তোমার পিতার শপথ, তুমি আমার আঁচল ছেড়ে দাও এবং ফিরে গিয়ে মৃগাবতীর স্তন স্পর্শ করো। তোমার সঙ্গে আমি মিলিত হতে চাইনা। কিন্তু কি করবো, সখীরা আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে।" কুমার চতুর ছিলো এবং চতুর্দশ যুক্তি সে জানতো। রূপমিনী মান করছিলো এবং কুমার মান ভাঙ্গাবার চেষ্টা করছিলো। তার প্রতিবাদের মধ্যে কুমার আলিঙ্গন করে তাকে শয্যায় বসালো। ২৯২

রূপমিনী বললো, "আমার শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়ার রাত্রি পুনরায় এসেছে। কিন্তু তুমি আমার বিগত বার্তাগুলো শোনো। তোমাকে শুনতে হবে কি করে আমি প্রীতিসূত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। দৈব আমাকে রক্ষা করেছে, যখন বামাচার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলো। হে প্রিয়, তুমি তোমার পাণ্ডিত্য ছেড়ে দাও, তোমার ছলনা আমি বুঝতে

পারি। তুমি আমার সঙ্গে খেলা করেছিলে, তখন আমি নিজেকে সংবরণ করতে পারিনি। এখন তুমি আমার খেলা দেখো। এখন আমি পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করে তোমাকে বিচলিত করবো। আমার দুটি বাহুবন্ধনে তোমাকে আবদ্ধ করে আমার কুচদেশে তোমাকে স্থাপন করবো।"[২৯৩]

"তুমি আমার দু'বাহুর মধ্যে এসেছো, এখন আমি তোমাকে ছাড়বোনা, আমার শপথ, আমি তোমাকে চলে যেতে দেবোনা।" কুমার বললো, "তুমি শুধু শুধুই সময় নষ্ট করছো। প্রেম-রস ভোগের জন্য চলো আমরা শয্যায় যাই। হে রূপমিনী, যখন সূর্য উদিত হবে তখন রঙ্গ-রসের সময় চলে যাবে।" একথা বলে কুমার তার হাত রূপমিনীর উরজের ওপর রাখলো। রূপমিনী অভিমান ভরে বললো, "তুমি আমার উরজের ওপর থেকে হাত সরাও, তুমি তার উরজ স্পর্শ করো যাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে এসেছো।" কুমার তখন রূপমিনীর অধরোষ্ঠ চুম্বন করলো এবং তার নখের শাসনে রূপমিনীর কুচকুম্ভ চিহ্নিত হলো। কামিনীর তখন বিবশতা এলো।[২৯৪]

এরা উভয়ে রমণ-রঙ্গের মধ্যে সারারাত লিপ্ত রইলো। সে মধুকর পদ্মিনীকে বিস্মৃত হয়ে মালতীর পরিমল আহার করতে লাগলো। রূপমিনীর মনের আশা পূর্ণ হলো এবং তার দুঃখ নিবৃত্ত হলো। সেই উত্তম স্বজন যার কারণে দুঃখকে সহ্য করা যায়।[২৯৫]

সম্পূর্ণ রাত্রি সুখে ব্যতীত হলো। তরুবর সঘন ছায়া বিস্তার করলো অর্থাৎ নায়িকার শরীর পরিপূর্ণ হল। যে-সমস্ত পাখী তরু ছেড়ে চলে গিয়েছিলো, তারা পুনরায় এলো। তরু তাদের গ্রহণ করলো, কিছু বললোনা। উত্তম সেই, যে অভিযোগের কথা মুখে আনেনা। রূপমিনী বললো, কুটিল দিন এসেছিলো আমার জন্য, স্বজনও শত্রু হয়েছিলো, সে-দিন অন্তর্ধান হয়েছে। এখন সস্তা দামেও সে-দিন কিনবোনা। সে-দিনের কোনও মূল্য নেই। বিরহের কুঞ্জর পলায়িত হয়েছে এবং প্রিয়তম কেশরী হয়েছে; গর্জন করছে।[২৯৬]

এদিকে দ্বন্দ্ব, উদ্বেগ, ব্যাকুলতা এবং বিয়োগ মন্ত্রণা করতে লাগলো, "এখন কি করা যায়, আমরা রূপমিনীর অনেক সেবা করেছি তাতে আমাদের কোনো লাভ হয়নি, চলো আমরা মৃগাবতীর কাছে যাই।" তারা মন্ত্রণা করে তাদের সম্বল সঙ্গে নিয়ে মৃগাবতীর কাছে এসে উপস্থিত হলো এবং বললো, "তুমি আদেশ দাও তোমার গ্রামে আমরা নিবাস করি।" মৃগাবতীর আদেশ পেয়ে তারা বসবাস করবার নামে সমস্ত গ্রাম অধিকার করে নিলো এবং গ্রাম হতে সুখ এবং আনন্দ তিরোহিত হলো। তারা গ্রামের মধ্যে উৎপাত করতে লাগলো। সুখ এবং আনন্দ নামক দুটি ভদ্ররস ফরিয়াদ করে কুমারের কাছে এলো। কুমার তাদের ফরিয়াদ শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা কোনো ফরিয়াদ করছো?" তারা বললো, "বিরহ এবং বিয়োগ আমাদের দরোজায় এসে উপস্থিত হয়েছে।" কুমার বললো, "আমার সঙ্গে আসো, আমি তাদের নিঃশেষ করবো।" রাত্রে রূপমিনীর সঙ্গে কাটিয়ে যখন সকাল হলো, তখন ভোগ, আনন্দ এবং হর্ষের সঙ্গে কুমার অগ্রসর হলো।[২৯৭]

যেখানে মৃগাবতী বসেছিলো সেখানে কুমার উপস্থিত হতেই মৃগাবতী পাশ ফিরে ঘুরে বসলো। মনে মনে এর কারণ বুঝে কুমার ভাবলো, মৃগাবতী ক্রুদ্ধ হয়েছে, সুতরাং তার সঙ্গে এমন রসের কথা বলবো যাতে তার দুঃখ চলে যায়।" সে বললো, "যে রমণী মৃগনয়না এবং কোকিলকণ্ঠী তার এমন পরিবর্তন কি করে হলো? আমাকে দেখে তুমি কেনো ঘুরে বসলে? তুমি আমার কায়ার মধ্যে প্রাণ এবং আমার নিকট মাণিক্য-সদৃশ। তুমি এবং আমিতো অভিন্ন। এই জগতে দ্বিতীয় কে আছে যে তোমার কাছে আমার সদৃশ্য হতে পারে। আমি তো এখানে এই কারণে এসেছি যে দেশের কোলাহল দূর করতে পারি। এখানে রূপমিনী নামে এক চেড়ী তোমার সেবা করবে, তোমার পা ধৌত করবে এবং তোমাকে পানি পান করাবে।" একথা শুনে মৃগাবতী হেসে ফেললো। বললো, "কুমার এতো তোমার বাল্যাবস্থার বধূ, এ-জন্যেই তো তুমি এর কাছে এসেছো।" কুমার বললো, "হে রমণী, তুমি ভাব দেখাচ্ছো যে তুমি আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছো কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমার মন আমার প্রতি বিরূপ হয়নি। তুমি আমার দিকে তাকিয়ে দেখো আমার নয়ন এ-ব্যাপারে সাক্ষ্য দেবে।" তদনন্তর, কুমার মৃগাবতীর বাহু ধরে শয্যায় তাকে বসালো। মৃগাবতী বুঝলো যে কুমার তাকেই কামনা করে, ওদিকে আবার রূপমিনী বিশ্বাস করেছে যে সে কুমারকে প্রেমে আবদ্ধ করেছে। এ-ভাবেই কুমার দু'জনকে তুষ্ট রাখলো। একদিন দুর্লভকে ডেকে রাজার কাছে বার্তা প্রেরণ করলো যে সে পিতার নিকট যাবে এবং পিতাকে সম্ভাষণ করবে। দুর্লভ রাজাকে গিয়ে এ-কথা বললো। রাজা বললো, "কুমার যা চায় তাই হবে। তার পিতৃগৃহে যাত্রার ব্যবস্থা করবো।" রাজা কুমারকে প্রচুর যৌতুক দিল এবং তার বিদায়ের ব্যবস্থা করলো। [২৯৮]

রূপমিনীর মাতা দুর্লভকে বললো, "আমার একটি মাত্র দুহিতা। কুমারের মাতাকে গিয়ে বলবে আমার কন্যা যেনো কখনও দুঃখিনী না হয়। কুমার উভয় স্ত্রীকে নিয়ে চৌডোলায় চড়ে পিতৃগৃহে রওনা হলো। [২৯৯]

চন্দ্রাগিরির নিকটে এরা এসে পৌঁছলো। রাজা নিরন্তর পথ দেখছিলেন এবং পুত্রের জন্যে ব্যাকুল হচ্ছিলেন। এমন সময় রাজকুমার সেখানে এসে উপস্থিত হলো। রাজা এগিয়ে গিয়ে কুমারকে সম্ভাষণ করলেন। দুই রানীকে নিয়ে রাজকুমার রাজভবনে প্রবেশ করলো। নানাভাবে তাদের সম্ভাষণ হলো। সমস্ত কুটুম্ব এসে তাদের আপ্যায়ন করতে লাগলো। দুঃখকে বিস্মৃত হয়ে কুমার আনন্দে সময় কাটাতে লাগলো। [৩০০]

সপত্নী কলহ খণ্ড

এদিকে কুমার একদিন আখেট বা শিকারে গিয়েছে, তখন মৃগাবতীর কাছে তার ননদ এলো। সে বললো, "গতকাল রূপমিনীর কাছে তোমার কথা হচ্ছিলো।" মৃগাবতী প্রশ্ন করলো, "কি কথা হচ্ছিলো?" সে বললো, "ভাবী, সে-কথা শুনলে তোমার গাত্র-দাহ হবে।" রূপমিনী তার সখীদের বলছিলো, "মৃগাবতী আমার সমকক্ষ নয়, কেননা আমি

বিবাহিতা পত্নী এবং কুলবন্তী।" একথা শুনে মৃগাবতীর ক্রোধ হল। সে বললো, 'রূপ-মিনীতো আমার উপর জবরদস্তী এসে পড়েছে। তারতো জাতি, স্বভাব এবং স্বাদ কিছুই নেই। দূরে একজন চেড়ী একথা শুনে দৌড়ে গিয়ে রূপমিনীকে জানালো, রূপমিনী এ-সংবাদে রোষযুক্তা হল। সে বললো, "মৃগাবতীতো অনবরত নিজের বেশ বদলায় কিন্তু আমাকে বলে নর্তকী। সে পুরুষের মতিভ্রম ঘটায়, আমার প্রিয়তমকে সে এ-ভাবেই বিভ্রান্ত করেছিলো। আমি দেখেছি সে পুরুষকে ভুলাবার ছত্রিশ কলা জানে, তার স্ত্রী-চরিত্রের অন্ত নেই। তার চরিত্রে নারী জাতি লজ্জিত হয়। সে আমার সদৃশ কখনও হতে পারবেনা।" রূপমিনীর কথা শুনে মৃগাবতী উত্তর দিতে এগিয়ে এলো। বললো, "তুমি এক সময় রাক্ষসের কাছে ছিলে, এখন এসেছ কুমারের কাছে। তুমিতো কুলহীনা। শ্বশুর-শাশুড়ী তোমাকে গ্রহণ করেনি, তুমিতো উপেক্ষিতা।" রূপমিনী বললো, "তোমার ভৎর্সনায় আমার মূল্য কমবেনা, আমি রাঘব বংশের রমণী এবং শুদ্ধ কুলবতী।" মৃগাবতী বললো, "আমার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। আমার কথায় কুমার তোমাকে গ্রহণ করেছে। সেতো তোমাকে ভুলে গিয়েছিলো, কিন্তু আমাকে পাবার জন্য সাতশ যোজন পথ অতিক্রম করেছিলো।" বধূদের কলহ দেখে শাশুড়ী ছুটে এলেন। উভয়কে কলহ থেকে নিবৃত্ত করলেন কিন্তু তারা ক্রুদ্ধ অবস্থায় নিজ নিজ কক্ষে অবস্থান করতে লাগলো।[৩০১]

কুমার আখেট থেকে ফিরে এসে দেখে চুলায় আগুন নেই, গাগরিতে পানি নেই। কুমার তখন বুঝলো এরা নিজেদের মধ্যে কলহ করেছে। কুমার তার মাতাকে বললো, "এদের মধ্যে মিল করিয়ে দাও।" অতঃপর শাশুড়ী, ননদ তথা সকল কুটুম্ব এসে উভয়ের মধ্যে মিলনের চেষ্টা করতে লাগলো। শাশুড়ী বললো, রুষ্ট হয়ে থাকা ঠিক নয়, সম্পূর্ণ চিত্ত দিয়ে স্বামীর সেবা করবে। সে প্রসন্ন হলেই সব ঠিক হবে, তোমরা উভয়ে মিলিত হও তাহলেই আমার শান্তি হবে। শাশুড়ী একজনের হাত অন্যজনের হাতের সঙ্গে মিলিয়ে দিল। অতঃপর তারা আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করলো। রাজকুমার উভয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে রস-আনন্দে কালাতিপাত করতে লাগলো এবং রমণীরাও কুমারের সঙ্গে ভোগ-বিলাসে মিলিত হল।[৩০২]

অন্ত খণ্ড

কুমার দিন-রাত মৃগয়াসক্ত হয়ে সময় কাটাচ্ছিলো, তার নিদ্রা ছিলোনা। যার যা ব্যসন সে তার মধ্যেই আপনাকে হারিয়ে ফেলে, কুমার রাত্রিতেও মৃগয়ার স্বপ্ন দেখতো। এক দিন প্রত্যূষে সংবাদ এলো, বনখণ্ডে প্রকাণ্ড এক জন্তু এসেছে যার ভয়ে গজ এবং ব্যাঘ্র পালিয়ে যাচ্ছে। কুমার আবশ্যকতার অনুরূপ এক শ্রেষ্ঠ ঘোড়ার পিঠে আরোহণ করলো এবং হাতে তরবারি ধারণ করলো। বহেলিয়া বৃক্ষে আরোহণ করলো এবং দূরে লক্ষ্য রাখতে লাগলো। কুমার তখন ভীমকায় জন্তুকে ঘুমন্ত দেখতে পেল। নিদ্রিত অবস্থায় তাকে হত্যা করা কাপুরুষতা বিবেচনা করে, কুমার শব্দ করে তাকে জাগ্রত

করলো। উভয়ে উভয়ের মুখোমুখী দাঁড়ালো। বন্য শার্দূল বিদ্যুৎ-সদৃশ দৌড়ে কুমারকে আক্রমণ করলো। কুমার শার্দূলের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করলো। উভয়েরই প্রাণান্ত হল। এ-সংবাদ শুনে বৃদ্ধ রাজা দৌড়ে এলেন কিন্তু পথিমধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। কুমারের পুত্র কর্ণরায় ব্যাকুলতা ও হতাশায় জর্জরিত হল। রাজ্যের লোক এসে তাকে শান্ত করলো। মৃগাবতী ও রূপসিনী সহমরণে চিতারোহণ করলো। রাজকর্মচারীরা বললো, "যা হবার তাতো হবেই, বিধাতার লিখন মিটবার নয়। আমাদের ক্রন্দনে মৃত জীবন্ত হবে না, এখন তা-ই করতে হবে যাতে রাজ্য থাকে।" কর্ণরায়কে তারা সিংহাসনে বসালো ; বললো, "তুমি এখন রাজা, আমরা তোমাকে সম্ভাষণ করবো, আমরা সকলেই তোমার ভৃত্য। তুমি যুগ-যুগান্তর রাজ্য ভোগ করো। তুমি আমাদের ছত্রছায়া-সদৃশ রাজা।"[৩০৩]

উপসংহার খণ্ড

এ-কাহিনী প্রথম হিন্দুঈ বা হিন্দাবী ভাষায় ছিলো, পরে তুর্কী ভাষায় এ-কাহিনী রূপান্তরিত হয়। অতঃপর আমি এর সমস্ত অর্থ স্পষ্ট করে বর্তমান-রূপে উপস্থিত করেছি। এর মধ্যে ভোগ, শৃঙ্গার এবং বীর রস ছিলো। যখন পনেরোশো ষাট সংবৎ, তখনই আমি এ-কাহিনীকে চৌপাইবন্ধে গ্রথিত করেছি। এর মধ্যে ষড়ভাষা আছে, পণ্ডিতজনের সাহায্য ছাড়া এ-কাব্যের অর্থ নির্ণয় করা অসম্ভব। বহিলে পক্ষের ভাদ্র পদের চতুর্দশী, সিংহ রাশিতে সিংহিণী রমণী করছে। এর মধ্যে অনেক প্রকার অর্থ আছে, যদি কেউ কুশল চেষ্টা করে বুঝতে পারবে। যতদূর পর্যন্ত আমার সামর্থ্য ছিলো, এবং যত কিছু আমি হৃদয়ে অনুভব করেছি, বলেছি।[৩০৪]

যতক্ষণ পর্যন্ত শরীরে শ্বাস আছে, একমাত্র তিনিই অর্থাৎ পরমেশ্বর আমার সহায়, তাঁকেই আমার প্রত্যাশা। তিনিই নিত্য অবস্থানকারী এবং নিত্য তিনিই থাকবেন। আমি নিত্য তাঁর পরিসেবা করি যেন তিনি আমার প্রতি স্নেহ রাখেন। সমস্ত কার্য ছেড়ে তাঁরই জপ করবে কেননা অন্তে তাঁরই রাজ্য থাকবে। যত জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা থাকুক সব কিছু পরিহার করে একমাত্র তাঁরই জপ কর। অন্য কোনও ভাবে মুক্তি সম্ভব নয়। তাঁরই আশায় সর্বক্ষণ থাকবে। যে তাঁর আদেশ অনুসরণ করবে উভয় জগতে সে-ই সুখকে প্রাপ্ত হবে। তাঁর আদেশ পালনের মধ্যে অনেক স্বাদ ও আনন্দ আছে।[৩০৫]

তথ্যনির্দেশ

১ এ-স্তবকের মূলের কয়েকটি চরণ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ। অর্থবোধ্যতার জন্য অনুবাদে সে-গুলো সম্পূর্ণ করা হয়েছে প্রাচীন কাব্যের রীতি অনুসারে। যেমন মূলে খণ্ডিত ভাবে আছে 'অলখ করতারু', অনুবাদে আমি 'স্মরণ করছি' কথাটি সেখানে যোগ করেছি।

২ এ-স্তবকটি অসম্পূর্ণ যে ক'টি চরণ পাওয়া গিয়েছে তারই অনুবাদ দেওয়া হল।

৩ মূলের প্রথম চরণ দ্বৈত হচ্ছে–''য়হ রচি কৈ চরিত পসারা। সো কহত মহঁ জো ''' সন্তারা।'' অর্থ হচ্ছে : 'এটি রচনা করে চরিত প্রসারিত করেছেন। সেই বলে যে সন্তার করেছে।' দ্বিতীয় চরণের অসম্পূর্ণতার জন্য ঠিক অর্থ ধরা পড়ছেনা। তাই আমি ভাবানুবাদ করেছি। এ-স্তবকে পাঠের অসম্পূর্ণতা আরো আছে। ডক্টর হাসান আসকরী পাঠ-পরীক্ষা করে তা' দূর করবার চেষ্টা করে-ছেন' 'কুতুবন্‌স মৃগাবত' নামক প্রবন্ধে (বিহার রিসার্চ সোসাইটি জর্নল, ভাগ ৪১, অঙ্ক ৪ : ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত : মৃগাবতী : প্রামাণিক প্রকাশন, আগরা, জানুয়ারী ১৯৬৮, পৃ. ২)।

৪ প্রাচীন অথবা মধ্যযুগের অবধী-হিন্দী কাব্যে রসুলের স্তুতি প্রায় একই রকম। জায়সীর 'পদুমাবতে' আছে 'প্রথম জ্যোতি বিধি তেহি কৈ সাজী। ঔ তেহি প্রীতি সিষ্টি উপরাজী'। বিধাতা আপন জ্যোতিকে তাঁর রূপে প্রথম সজ্জিত করলেন, এবং তাঁরই প্রীতির জন্য সৃষ্টি উৎপন্ন করলেন। মোল্লা দাউদের 'চান্দায়নে' আছে, 'পুরিষু একু সিরজাসি উজিয়ারা। নাউ মহম্মদ্‌ জগত পিয়ারা জিহহি লগ সবে পিরথমী সিরী। ঔ তিহি নাউ মোনদী ফিরী''---তিনি এক উজ্জ্বল পুরুষ সৃজন করলেন যার নাম মুহম্মদ এবং যিনি জগতের প্রিয়। তাঁর জন্য সমগ্র পৃথিবী নির্মিত হল এবং তাঁর নামের দুন্দুভী ঘোষিত হল।

৫ এ-স্তবকে চার খলিফার প্রশংসা করা হয়েছে। আবুবকর 'সিদ্ধ' হিসেবে পরিচিত---'সিদ্ধ করি জানা', উমর 'অদল' বা ন্যায় বিচারক হিসেবে প্রসিদ্ধ, উসমান রসুলের অহী বা প্রত্যাদেশকে লিপিকৃত করেছিলেন, আলী ছিলেন সিংহ-সদৃশ শক্তিশালী। 'চান্দায়নে' আছে : আবুবকর, উমর, উসমান এবং আলী এঁরা হলেন চার সিংহ যাঁরা শত্রুকে নিধন করেছিলেন। জায়সীর 'পদুমাবতের' বর্ণনাটি অবিকল মৃগাবতীর মতো-আবুবকর ছিলেন 'সয়ানে' বা বুদ্ধিমান, উমর 'অদল' বা ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা। উসমাম ছিলেন পণ্ডিত এবং আলী সিংহ-সদৃশ।

৬ এ-স্তবকে কুতবন তাঁর পীরের বন্দনা করেছেন যাঁকে তিনি 'শেখ বুঢ়ন' বলে নামাঙ্কিত করছেন। ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত বলছেন, মখদুম সেখ বঢ়ন বলে একজন সন্তের নাম পাওয়া যায় যিনি কসবা অজোলীতে থাকতেন। মীরাত-উল-অসরাবের লেখক আবদুর রহমান চিস্তী তাঁর আলৌকিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। অন্য এক সূফী আবদুর রহমান গঙ্গোহী তাঁর এক পত্রে শেখ বঢ়নের নাম উল্লেখ করেছেন 'শেখুলমশায়খ আল্লামতুলবরা কুদবতুননুকবা শেখ বঢ়ন' বলে। সম্ভবতঃ ইনিই কুতবনের পীর। (কুতবন-কৃত মিরগাবতী : ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত, বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ভৈরবনাম, বারাণসী ১৯৬৭)।

৭ মধ্যযুগের কাব্যের প্রথাগত পরম্পরাকে মান্য করে কুতবন 'শাহে বক্‌ত' বা সময়-কালীন রাজার প্রশংসা করেছেন। মোল্লা দাউদ তাঁর কাব্যে এ-জন্য একটি স্তবক ব্যয় করেছেন। কুতবন চারটি স্তবকে রাজার প্রশংসা-বাণী তুলে ধরে-ছেন এবং দুটি স্থানে রাজার নাম উল্লেখ করেছেন হুসেন শাহ বলে, কিন্তু উল্লেখ করেননি যে ইনি কোন অঞ্চলের শাহ বা সুলতান ছিলেন। অঞ্চলের নামোল্লেখ না থাকায় নিশ্চয় করে বলা যাচ্ছেনা ইনি কোন হোসেন শাহ। হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার রামচন্দ্র শুক্ল প্রথমে অনুমান করেছিলেন যে ইনি বাংলার বিখ্যাত হোসেন শাহ, পরে সংশোধন করেছেন জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী বলে। জৌনপুরের হোসেন শাহ শর্কী এবং বাংলার হোসেন শাহ পরস্পর সম্বন্ধী ছিলেন। বাংলার হোসেন এক সময় মুজফ্‌ফর শাহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, পরে রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রাজ্য দখল করেন। ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মৃগাবতী রচনাকালের চার বছর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বাংলার বাইরে বিহারের মুঙ্গের পর্যন্ত সীমিত ছিলো। ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে একবার মাত্র তিনি তাঁর সেনাদলকে অবধিতে সিকান্দর লোদীর মোকাবিলা করতে পাঠিয়েছিলেন। যুদ্ধ অবশ্য হয়নি, দু-পক্ষে সন্ধি হয়েছিলো। ১৪৯৯ খ্রীস্টাব্দে হোসেন শাহ কামতা-কামরূপকে লক্ষ্য করে একটি অভিযানে বেরিয়েছিলেন। সেখানে অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হোসেন শাহের চার বছর লেগেছিলো অর্থাৎ মৃগাবতী রচনার এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৫০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি কামরূপ জয় করেন। তাঁর দ্বিতীয় অভিযান উড়ীষ্যার জাজনগরের বিরুদ্ধে ১৫০৮-০৯ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ 'মৃগাবতী' রচনার কয়েক বছর পর। কুতবনের বর্ণনায় যে শান্ত ও স্থির রাজ্য-কালের বর্ণনা আছে তা' বাংলার হোসেন শাহের অস্থির কার্যক্রমের সঙ্গে মেলে-না। তাছাড়া রাজার বিভিন্ন অবস্থানক্ষেত্র থেকেও প্রমাণিত হয় যে কুতবন এর আশ্রিত ছিলেননা।

হোসেন শাহ শর্কীর ইতিহাসও যুদ্ধের ও অভিযানের ইতিহাস। জৌনপুরে রাজত্ব স্থাপন করে তিনি দিল্লীর উপর অধিকার বিস্তারের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। শক্তিতে তিনি দিল্লীর সুলতানের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছিলেন। তাঁর সেনাবাহিনী এবং শাসনের অসম্ভব বিস্তার ছিলো। পূর্বে তিরহুত এবং উড়ীষ্যা তাঁকে কর প্রদান করতো। গোয়ালিয়রের রাজাকে পরাস্ত করে তাঁকে তাঁর অনুগত করেছিলেন। তাঁর রাজত্ব এবং প্রভাব পূর্বে বিহার থেকে আরম্ভ করে দিল্লীর রাজত্বের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলো। কবি এবং সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবেও শর্কীর সুলতানের খ্যাতি ছিলো। সঙ্গীতে জৌনপুর কাঁগড়া (খেয়াল) তাঁরই সৃষ্টি বলে প্রসিদ্ধ। তিনি জ্ঞানী ও গুণীজনের যথেষ্ট সমাদর করতেন। কুতবনের প্রশংসা-প্রকরণ দেখে মনে হয় তিনি হোসেন শাহ শর্কীর কথাই লিখেছেন। হোসেন শাহ শর্কীর নামাঙ্কিত মুদ্রায় ৯০৬, ৯০৭ এবং ৯১০ হিজরীর ছাপ দেখা যায়। এতে প্রমাণ হয় ৯১০ হিজরী পর্যন্ত অবশ্যই হোসেন

শাহ শর্কী জীবিত ছিলেন। 'মৃগাবতী' রচিত হয় ৯০৯ হিজরীতে। সুতরাং হোসেন শাহ শর্কীর আশ্রিত কবি কুতবন রাজার জীবিত কালেই কাব্য সমাপ্ত করেছিলেন।

লোদী বংশের বহলুল লোদী ৯০৯ হিজরী বা ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে হোসেন শাহ শর্কীর রাজ্য দখল করে নেন। রাজ্যহারা সুলতান শর্কী রাজ্য পুনরুদ্ধারের মানসে বিহারের ভাগলপুরের কহলগাঁও অঞ্চলে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের অতিথি হিসেবে বসবাস করতে থাকেন। তিনি রাজ্য-শাসন প্রাপ্তির অধিকার পাবার আশায় নিরন্তর চেষ্টা করেছিলেন। ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত রিজ্‌কউল্লাহ রচিত 'বাকয়াত-এ-মুশতাকী' নামক একটি গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন, যেখানে উল্লেখ আছে যে, বিহার অঞ্চল হস্তচ্যুত হবার অল্প কিছু দিন পরই সুলতান শর্কী বিহার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। সুবেদার দরিয়া খাঁর সঙ্গে তাঁর মোকাবিলা হয় কিন্তু দুমাস চেষ্টার পর সুলতান শর্কী ফিরে যেতে বাধ্য হন। ডক্টর গুপ্ত মুহম্মদ কবীর রচিত 'আফসানে বাদশাহান' নামক অন্য একটি গ্রন্থেরও উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ-ঘটনার সমর্থন আছে।

৮-১০ আশ্রয়দাতা হোসেন শাহের প্রশংসার বিস্তৃতি।

১১ এ-স্তবকে কাব্য রচনার তারিখ এবং কয়েকটি প্রাকৃত ছন্দের উল্লেখ আছে। কুতবনের বর্ণনা অনুসারে রচনা আরম্ভ হয়েছে ৯০৯ হিজরীর ৪ঠা মুহররম অর্থাৎ আষাঢ় মাসের শুক্ল পক্ষে ৬ তারিখে ১৫৬০ বিক্রমসংবতে এবং খ্রীস্টীয় ২১শে জুন, ১৫০৩ তারিখে। শেষ হয়েছে ১৫ই রবীউস্‌সানী ৯০৯ হিজরীতে অর্থাৎ আশ্বিন মাসের কৃষ্ণ পক্ষে ১ তারিখে ১৫৬০ বিক্রমসংবতে এবং খ্রীস্টীয় ৬ই ডিসেম্বর ১৫০৩ তারিখে।

ছন্দগুলো হচ্ছে গাথা, দোহা অরিল্ল, আর্থা, সোরথা এবং চৌপাঈ। ছন্দ-শাস্ত্রমতে শ্লোক হচ্ছে সংস্কৃতের, 'গাহা বা গাথা' হচ্ছে প্রাকৃতের এবং 'দোহা' হচ্ছে অপভ্রংশের মুখ্য ছন্দ। 'দোহা', 'আভীর' এবং 'সোরধা' এক জাতীয় ছন্দ। গাহা বা গাথা, যতির বিবেচনায় দুই স্বভাবের—'মুখবিপুলা' এবং 'জঘনবিপুলা'। এ-ছন্দে স্বরবিন্যাসের কোনও নিয়ম নেই। দোহা হচ্ছে ২৪ মাত্রার দুটি সমান পদের ছন্দ, ১৩ মাত্রার পর যতি আসে। চরণে চরণে অন্তিম অক্ষরের মৈত্রী। এ-ছন্দের বিশিষ্টতা, অড়িল্ল, অরিল্ল বা অড়িল্লা: চারপদী যমকান্ত ছন্দ। প্রত্যেক পংক্তিতে ১৬ মাত্রা থাকে এবং অন্তিম দুটি মাত্রা লঘু হয়। 'আর্যা' ছন্দে ১২, ১৮, ১২ এবং ১৫ মাত্রার ক্রমে চারটি চরণ থাকে। কিন্তু অনেক সময় এ-মাত্রার ব্যতিক্রমও ঘটে। 'সোরথা' হচ্ছে ৪৮ মাত্রার এক ছন্দ যার প্রথম আর তৃতীয় চরণে ১১ করে এবং দ্বিতীয় এবং চতুর্থ চরণে ১৩ করে মাত্রা থাকে। চৌপাঈ হচ্ছে ১৬ মাত্রার ছন্দ। এ-ছন্দে লঘু-গুরুর কোনও নিয়ম নেই।

১২ এ-স্তবকে কবির আশ্রয়দাতার একটি উক্তি আছে যাতে প্রমাণিত হয় কবি তাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র এবং নিকটস্থ ব্যক্তি ছিলেন।

১৩-১৪ পুত্রহীন রাজার পুত্র কামনা এবং বিধাতার কাছে প্রার্থনা করে পুত্রপ্রাপ্তি মধ্য-যুগের কাহিনী কাব্যের একটি রীতি। প্রধানতঃ গ্রামীণ লৌকিক সাহিত্যে এ-স্বভাবের কাহিনীর প্রচলন বেশী দেখা যায়।

১৫ সন্তান জন্মের পর লৌকিক প্রথা হচ্ছে রাশি গণনা করে তার ভবিষ্যতের কথা বলা এবং নামকরণ করা।

১৬ এ-স্তবকের চতুর্থ চরণদ্বৈতের শেষাংশ নেই। অর্থবোধ্যতার জন্য ডক্টর মাতা-প্রসাদ গুপ্ত অংশটি নির্মাণ করেছেন। ডক্টর মাতাপ্রসাদের নির্মিত পাঠটিই আমার অবলম্বন ছিলো।

১৭ এ-স্তবকে 'হেঙ্গুরি' খেলার কথা আছে। এ-শব্দের উৎপত্তি সম্ভবতঃ 'হয়+অর্গল' থেকে অর্থাৎ ঘোড়া নিয়ে খেলা। জায়সীতে এ-খেলা 'চৌগান' বলে পরিচিত। আধুনিক কালে এরই নাম 'পোলো'। 'নাগর' শব্দটির অর্থ প্রেমিক নয়, নগরবাসী সভ্যজন অর্থে এখানে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৮ 'অহেরা' শব্দটির অর্থ মৃগয়া বা শিকার। কোথাও কোথাও এর পরিবর্তে 'আখেট' শব্দটিও পাওয়া যায়। মূলে রয়েছে 'সাউজ', তার অর্থ করেছি বন্যজন্তু (সংস্কৃত: শ্বাপদ>সাউজ্জ>সাউজ)। 'রাউত' শব্দটি চর্যাগীতিকায়ও আছে। এখানে শব্দটির অর্থ সামন্ত বা সরদার (সংস্কৃত: রাজপুত্র>রাঅউও> রাউত)। 'পরোহন' অর্থ প্ররোহণ, ঘোড়া অর্থে। 'পাখর' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ 'রেকাব যা ঘোড়ার পিঠের দু-পাশে ঝুলে থাকে যার মধ্যে অশ্বারোহী পা রাখে।

১৯ 'বেগর বেগর' অর্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে। মূলে আছে 'ফুঁক', কোনও কোনও পাঠে 'ফৌক' পাওয়া যায়। ডক্টর পরমেশ্বরীলাল অর্থ করেছেন 'নুকীলা'। শব্দটি হিন্দী, যার অর্থ হচ্ছে সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। এ-থেকে আমি অর্থ করেছি তীর-ধনুক, বর্শাও হতে পারে।

২০ 'প্রেম জাগলো' আমি লিখেছি। মূলে আছে 'পেম চিত গহা' অর্থাৎ প্রেম চিত্তকে ধারণ করলো। মূলে আছে 'খেল' অর্থাৎ খেলায় নিমগ্ন হয়ে আছে, আমি সুস্পষ্টতার জন্য লিখেছি শিকার খেলায় নিমগ্ন হয়ে আছে।

২১ 'বহুরি ন নিকসা গয়উ হিরাই'—বহুরি অর্থ ফিরে, নিকসা অর্থ বেরিয়ে আসা, হিরাই অর্থ হারিয়ে যাওয়া। আমি অর্থ করেছি, মৃগী সেই জলতলে লুকিয়ে গেল, আর বেরিয়ে এলোনা।

২২ 'বিসরা সবৈ জো মন মহঁ আহা': সব কিছুই ভুলে গেল যা তার মনে জেগেছিল। সুস্পষ্ট করে লিখলে অর্থ দাঁড়ায়, অতঃপর তার মনে অন্য যা কিছু ছিলো সবই সে বিস্মৃত হল। দ্বিতীয় চরণে 'সে সঙ্কল্প করলো' কথাটি আমি যুক্ত করেছি।

'সুধি বিসরী বুধি গঙ্গ হেরানী' : 'সুধি' শব্দে 'চেতনা' এবং 'স্মরণ' দুই-ই হয়, 'হেরানী' হারিয়ে গেল অর্থে।

২৩ 'প্রেম ঝখাই গঙ্গ তেহী জোবৈ' : 'জোবনা' মানে দেখা, 'জোবৈ' অর্থ দেখছিলো। যে প্রেমের মধ্য সে নিজেকে দেখছিলো সে প্রেমের সন্ধান সে করছিলো কথাটি সূফীতত্ত্বের।

২৪ 'স্বর্ণ-পাষাণ' আমি লিখেছি, মূলে আছে 'পরস' যার অর্থ পরশপাথরও হতে পারে। 'জরে রতন বহুলাই' অর্থাৎ বহুবিধ রত্ন এনে সাজানো হয়েছে। কোনও কোনও পাণ্ডুলিপিতে 'ঈঙ্গুর বহুত ক রসাই', কথাটি আছে যার অর্থ হয় 'সিন্দুরের রঙ্গে রঞ্জিত হয়েছে'।

২৫ 'সুঝর পানি দীখত অতি চোখা' : 'সুঝর (সং শুদ্ধ>সুজঝ>সুঝ>সুঝর) অর্থ নির্মল। 'চোখা' অর্থ উত্তম শ্রেষ্ঠ।

২৬ 'কদলি পেড় ডারৈ ছতনারী' : 'ছতনারী' অর্থ ছড়িয়ে আছে। 'সম্ভার যুক্ত' ছিলো অর্থাৎ সজীব ছিলো। 'আদনিকা' অর্থ আয়না। মূলে আছে 'আরসী'। জুহার অর্থ অভিবাদন বা প্রণাম, আমি লিখেছি 'আভূমি নমস্কার করলো'।

২৭ 'মনসা' অর্থ মনোকামনা, 'সবাঁগ' অর্থ সর্বাঙ্গ।

২৮ 'খন্তিসি সিগার সম্পূরণ কিএ'। বহুতই ছোহ রূপ বহু লিএ ।। 'খন্তিসি' অর্থ চলে গেল। 'ছোহ' স্নেহ। নৈন রহে পঁথ জোয়া'—জোয় অর্থ প্রতীক্ষা। আমি অর্থ করেছি নেত্র তার পথের দিকে তাকিয়ে আছে।

২৯ 'কুঁঅর রাত উন্হ সো অসি কহী। সকলহি কে জিয়ঁ চিন্তা গহী।।' কুমার যখন এমত কথা তাদের বললেন, সকলের চিত্তে তখন চিন্তা জাগলো।

৩০ 'কহা তুমহার নঅ হই ভলা। বিনু জিয় কহহুজাই কেউ চলা।।' বললো, তোমাদের কখন ভালো নয়। জীবন ছাড়া কেমন করে চলে যাওয়া যায়।

৩১ 'সঁবরি সঁবরি' : স্মরণ করে করে। এখানে মৃগীর কথা স্মরণ করে।

৩২ 'পন্থ নিহারত' : পথ দেখতে দেখতে। 'সাইর সীপহি মোঁতি : সাগরের ঝিনুকে মুক্তা।

৩৩ 'মাঝ' : মধ্য। 'সৌতুক' : সাক্ষাৎ ঘটনা, প্রত্যক্ষ। 'নাহত': না হলে। 'মরব': মরবো। 'পরবানউ : প্রমাণিত করবো।

৩৪ 'উচাই' : নির্মাণ করে। 'নেগিনহ' : দাস, কর্মচারী। 'আয়সু': আদেশ।

৩৫ এ-স্তবকে স্থাপত্য-কৌশল বর্ণিত হয়েছে। বহুতল বিশিষ্ট অট্টালিকার নির্মাণ পদ্ধতির বিবরণ অত্যন্ত কুশলতার সঙ্গে করা হয়েছে। 'অবই' (সংস্কৃত : স্থপতি) : ভবন নির্মাণকারী। ''চুনহারু': চূনা প্রস্তুতকারক। 'পথেরিয়া': যে পাথরের

কাজ করে। 'চিনেরা' : চিত্রকর। 'করবতিয়া' (সং. করপাত্র) : করাতী। কঁদেরা : কুদ্দকার বা ভিত্তি স্থাপনার জন্য খননকারী।

৩৬ এ-স্তবকটিও অট্টালিকা নির্মাণ সংক্রান্ত। 'খণ্ড' : তল, মঞ্জিল। 'ঝরোখা' : গবাক্ষ, খিড়কী। 'পঁবরি' : প্রবেশ দ্বার। 'অটারী' : অট্টালিকা। 'চৌখণ্ডী : অর্থ আমার কাছে স্পষ্ট নয়। সম্ভবতঃ প্রবেশদ্বারের উপরে প্রহরার জন্য অথবা নহবতের জন্য যে ঘর থাকে তাই। 'কনকপানি' : হস্তলিখিত সুবর্ণাক্ষরের জৈনগ্রন্থ থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে এ-পদ্ধতির প্রচলন পঞ্চদশ শতাব্দীতে হয়েছিলো। 'চীতা' : চিত্রিত করলো।

৩৭ এ-স্তবকে দেয়াল চিত্রের কিছু বিবরণ আছে। ভীর : মহাভারতের ভীম। পঞ্চ-পাণ্ডবদের একজন। 'উরেহা' (সং. উল্লেখন) : চিত্রাঙ্কন করলো। 'ভরথরী': ভর্তৃহরি। উজ্জেন-এর রাজা যিনি তার রানী—পিঙ্গলার জন্য বৈরাগী হয়ে ছিলেন। 'অজুন' : পঞ্চপাণ্ডবদের একজন যিনি লক্ষ্যভেদে পারঙ্গম ছিলেন। 'রিগ' : ঋগ্বেদ। 'জুগ' : যজুর্বেদ, 'সাম' : সামবেদ ; 'অথরবন' : অথর্ববেদ। ''সহদেব' : পঞ্চপাণ্ডবদের একজন যিনি আপন পাণ্ডিত্যের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। 'পেখনা' (সং. প্রেক্ষণ) : নাটক।

৩৮ 'গয়ন্দ' (সং. গজেন্দ্র) : হাতি। 'কৈসেহু'; কোনও প্রকার। অর্থ হচ্ছে, মদমত্ত হাতির পৃষ্ঠদেশ থেকে কেউ যেমন নামতে পারেনা, তেমনি মৃগীর ধ্যানটি একপ্রকার এমন অস্থিরতা যা থেকে মুক্ত হওয়া যায়না।

৩৯ মাতাপ্রসাদ গুপ্তের সম্পাদিত পাঠে 'ভাদৌ মঘা' আছে যার অর্থ হয়, ভাদ্র মাসের মঘা নক্ষত্রের মতো। পরমেশ্বরীলালের পাঠে, ভাঁদো মেঘা আছে যার অর্থ হয় ভাদ্র মাসের মেঘের মতো। এটাই আমি গ্রহণ করেছি। 'জলহর' : জলাশয়।

৪০ 'তুসার' : শীত। 'খেহা' : ভস্ম, অঙ্গার। 'লোয়ন' : লোচন। 'পরজরি' (সং.প্রজ্বল > প্রা. পজ্জল > পর্জর) : জ্বলো। 'পুহুমি' : পৃথিবী।

৪১ বারো মাস এবং ছয় ঋতুর বিস্তারিত বিবরণ স্তবকগুলোতে নেই। তাতে মনে হয় কিছু অংশ হারিয়ে গিয়েছে। আলোচ্য স্তবকটিও অসম্পূর্ণ।

৪২ 'সিসির' : শিশির, মাঘ এবং ফাল্গুন মাস। 'হেউ' : হেমন্ত, অগ্রহায়ণ এবং পৌষ মাস। 'সরদ' : শরৎ, আশ্বিন এবং কার্তিক মাস। 'বসন্তা': বসন্ত, চৈত্র এবং বৈশাখ মাস। 'গ্রিখম' : গ্রীষ্ম, জ্যৈষ্ঠ এবং আষাঢ় মাস। 'উখম': উষ্ণ। 'জোবত' : প্রতীক্ষা করছিলো বা তাকিয়ে ছিলো। 'ববঁড়রা': ঘূর্ণীঝড় বা আঁধি।

৪৩ 'সাত জনী' : সাতজন রমণী অর্থে। 'লোনী' : লাবণ্যময়ী অর্থে। 'সপূনী' : সম্পূর্ণ অর্থে।

৪৪ 'খেলত আহী' : খেলছিলো। 'সয়ানী' : চতুর। 'সঁকাই': শঙ্কিত হয়ে। 'সজতা হোহ ছাড়হু বৌরাঈ' : সজাগ হও এবং পাগলামী ছাড়।

৪৫ 'বিলাই' : বিলীন বা লুপ্ত। 'বিবান' : বিমান।

৪৬ 'পরোঁ লৈ পাই' : পায়ে পড়ি।

৪৭ 'ভোঁ' : ভুরু। 'বিসারী' : বিষযুক্ত। 'চখত' : নয়ন। মূল রচনার শেষে কিঞ্চিত অস্পষ্টতা আছে সে অংশ আমি বাদ দিয়েছি।

৪৮ 'ভূমিশয্যা থেকে উঠিয়ে', মূলে আছে 'উচাই' অর্থাৎ উঠিয়ে। 'সোতুখ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা সম্প্রত্যক্ষ।

৪৯ 'মাঈ' : মাতা। 'ধাঈ' : যে দুধ পান করিয়ে শিশুকে লালন-পালন করে। 'মরোহু' : হিন্দী অর্থ 'ছোই' বা আত্মিক স্নেহ, আমি এখানে করুণা বলেছি। 'সাহস দস কঁা' : দশহাজার কলা বা কিরণ। 'টেক' প্রশ্রয়। 'উদয়াগিরি' : পুরাণ অনুসারে পূর্ব দিকের এক পর্বত যেখান থেকে সূর্যের উদয় হয়। 'পয়োহর' : পয়োধর, স্তন।

৫০ 'কুরিল' : কুটিল বা কুঞ্চিত। 'বারা' : কেশ। 'বাদরা' : বাদল। 'কারে' : কালো।

৫১ মেঘ-বর্ণ, মেঘ বরণ কিন্তু কোনও কোনও পাঠে আছে 'ভঁবর বরণ' অর্থাৎ ভ্রমর-কৃষ্ণ বর্ণ।

৫২ 'দুইজ' : দ্বিতীয়া। 'মযঙ্ক' : চন্দ্রমা। 'উদিনল' : উদিত।

৫৩ 'পঞ্চবান' : কামদেব। 'করণ' : কর্ণ, মহাভারতের এক বীর। 'খর' : তেজ, তীব্রতা। 'পারুবি' : শিকারী। 'পেখী' : দেখি। 'রুহিব' : রুধিব।

৫৪ 'বরুনি' : ভোঁ বা ভুরু। 'খেতা' : যুদ্ধ।

৫৫ 'লোয়ন' : লোচন, নেত্র। 'রতনারী' : লাল।

৫৬ তিলটি বাম দিকে না ডান দিকে বর্ণনায় তা স্পষ্ট নয়। তিলের বর্ণনা দুটি স্তবক জুড়ে করা হয়েছে এবং বর্ণনায় পুনরাবৃত্তি আছে। অনুবাদে বর্ণনা সংক্ষেপ করা হয়েছে।

৫৭ পাঁচটি স্তবকের অতিশয় দীর্ঘ বর্ণনাকে অনুবাদে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

৫৮ মূলের দুটি স্তবক অনুবাদে সংক্ষিপ্ত করে একটি স্তবকে পরিণত করা হয়েছে।

৫৯ এখানেও মূলের বিস্তারিত বর্ণনাকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে।

৬০ 'কুম্ভস্থল' : হস্তীর গণ্ডস্থল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় কাব্যে স্তনের উপমা কুম্ভস্থলের সংগে দেওয়া হত।

৬১ 'কালিন্দী' : যমুনা। পয়াগু : প্রয়াগ। 'বেনী' : ত্রিবেণী। 'করবত' : কর পাত্র, আরা বা করাত।

৬২ 'সেত' : শ্বেত। 'কীসন' : কৃষ্ণ। 'খীন' : ক্ষীণ। কুতবন রমণী শরীরের অবয়বকে বর্গীকরণ করেছেন চার শ্বেত, চার কৃষ্ণ, চার পৃথুল এবং চার ক্ষীণ রূপে। শ্বেত হচ্ছে মাঁগ বা সিঁথি, চখ বা নেত্র, চৌক বা দাঁত, এবং নখ। কৃষ্ণ হচ্ছে কুচ,

দশন বা দাঁত, কেনা এবং নেত্র। দাঁত এবং নেত্র দুটি বর্গেই গণনা করা হয়েছে। জায়সী দীর্ঘরূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন কেশ, অঙ্গুলী, নয়ন এবং গ্রীবাকে। লঘুরূপ হিসেবে বর্ণনা করেছেন দশন, কুচ, ললাট এবং নাভিকে। কুতবনে ক্ষীণরূপে এসেছে নাক, অধর, কটি এবং করপল্লব। জায়সীতে করপল্লবের স্থানে উদর এসেছে। পৃথুল রূপ হিসেবে কুতবনে পাচ্ছি গাল, কলাঈ বা মানবন্ধু, ভুরু এবং কুচ। জায়সী এখানে নিতম্বেরও উল্লেখ করেছেন। জায়সীর পৃথুল রূপগুলো হচ্ছে—কপোল, নিতম্ব, জঙ্ঘা এবং মনিবন্ধ।

৬৩ জায়সীতে বারো আভরণের সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে, এখানে বর্ণনাটি পরিচ্ছন্ন নয়। কুতবন আভরণকে সাত এবং পাঁচ এ-দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। সাত হচ্ছে দাক্ষিণাত্যের চীর বা শাড়ি, স্নানে মার্জিত শরীর, সিঁথিতে সিন্দুর, মুখে তাম্বুল, চোখে কাজল, কুসুম্ভী বস্ত্র এবং চন্দন প্রলেপন, পাঁচ হচ্ছে পাঁচটি অঙ্গের অলঙ্কার—শিরোদেশ, কণ্ঠ, হাত, কটি এবং পা।

৬৪ 'কার' : কার্য। 'বহুতা' : অনেক দীর্ঘ। 'পূতা' : পুত্র। 'কৈসহিঁ' : কোনও প্রকারে।

৬৫ একই বক্তব্যের বিস্তার বলে এখানে মূলের দুটি স্তবককে একত্রিত করা হয়েছে। 'গূঁগ' : বোবা। 'বিহান' : প্রাতঃকাল। 'গোহন' : সঙ্গে। 'নিমিখ' : ক্ষণকাল। 'অন্হাই' : স্নানের নিমিত্ত।

৬৬ মূলে আছে 'উপগারা', অর্থ হচ্ছে উপায়। আমি অর্থ করেছি ব্যবস্থ।।

৬৭ 'দঈ' : ঈশ্বর। আমি অর্থ করেছি 'দেব'। 'সঁমরি' : স্মরণ করে।

৬৮ একই বক্তব্যের বিস্তার হেতু এখানে মূলের দুটি স্তবককে একত্রিত করা হয়েছে। 'সারী' : শাড়ী। 'ধাই' : দৌড়ে গিয়ে। 'বহুরি' : ফিরে এসে। 'মোরি' : আমার। 'হুতৈ' : সে। 'বউরাঈ' : পাগল। 'বিলাঈ' : লুপ্ত। 'উচাই' : নির্মাণ করে।

৬৯ 'পীয়র ভএউ জস পান' : পান পীতবর্ণ হল অর্থাৎ ওষ্ঠে পানের রং পীতবর্ণ হল।

৭০ 'রায়া' : রাজা। 'ছায়া' : ছদ্মরূপ। 'সিস' : বাহানা, ছলনা। 'বেরা' : বিলম্ব। 'আয়সু' : আদেশ।

৭১ 'সিখরাবা' : শিখিয়ে দিয়েছে। 'গিয়ান' : জ্ঞান। 'চৌদস' : চতুর্দশীর চন্দ্রমা। চন্দ্রমাসের চতুর্দশীতে চৌদ্দ কলায় চাঁদের পূর্ণতা ঘটে। ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত লিখেছেন, 'ইস্লামকী ধারণাকে অনুসার চৌদসকো চাঁদ অপনী সমগ্র পূর্ণতাকো প্রাপ্ত হোতা হৈ'। (কুতবন—কৃত মিরগাবতী : বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন, ভৈরবনাথ বারাণসী ১, পৃ: ১৫৯)। নিকসত : প্রকাশ পায়, বের হয়। 'বিগসা' : বিকশিত হয়েছে। 'দিনয়র' : সূর্য।

৭২ 'পাছে' : পিছনে। 'গজমৈমঁত' : মদমত্ত হস্তী। 'উর' : স্তন।

৭৩ 'পতি পারহু' : বিশ্বাস কর, প্রত্যয় কর। কুলবন্তি : কুলবতী।

৭৪ 'কস' : কি করে। 'প্রভুতা' : স্বামী। 'কয়া' : শরীর। 'সেগী' : ভৃত্য, সেবক। 'পারা' : কর্ম করতে সমর্থ হওয়া।

৭৫ 'জীত দসন সেঁউ খাঁডেউ অহা' : লজ্জার প্রকাশ হিসেবে এবং প্রতিবাদ ও অনিচ্ছার প্রকাশ হিসেবে কথাটি বলা হয়েছে। অর্থ 'দাঁত দিয়ে জিহ্বা কাটবো'।

৭৬ 'বাচা অবধি দুহুঁ সেঁউ ভঈ' : যত কথা ছিল, উভয়ের মধ্যে সব কথাই বলা হল। আমি ভাবার্থ করেছি, 'উভয়ের মধ্যে বাচবিক সিদ্ধান্ত হল। যদি শব্দটি 'অবধি' অর্থাৎ 'যতদূর হতে পারে' না হয়ে, 'অবধি হয়' যেমন পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত'র পাঠে আছে 'তা' হলে অর্থ হয় 'আবদ্ধ' বা 'সিদ্ধান্ত'।

৭৭ এ-স্তবকে কুতবন নানাবিধ ঘোড়ার নামোচ্চারণ করেছেন। যেমন, 'তুরঙ্গম'ও : 'হরে' : হরিৎ বর্ণের ঘোড়া, সুবর্ণ : স্বর্ণকান্তি ঘোড়া, হঁসলা : যে ঘোড়া মেহেদী রং-এর এবং যার পা কালো। 'কার' : কালো রং-এর ঘোড়া। 'কয়াহ' : পক্কতালনিভ বাজী, অর্থাৎ পাকা তালের রং-এর ঘোড়া। 'সাবরকরণ' : শ্যামকর্ণ। 'মহোজু' : জায়সীতে নাম পাই 'মহুত' অর্থাৎ মহুয়া রং-এর ঘোড়া। 'গররা' : শ্বেত এবং লাল এ-দুয়ের মিশ্রিত রং-এর ঘোড়া। 'সরবাহা : পীযূষ-কান্তি বা দুগ্ধ-বর্ণের ঘোড়া। 'পঞ্চকল্যাণ' : যে ঘোড়ার চার পায়ের গোড়ালি এবং মুখমণ্ডল সাদা। 'উদ্দির বুলাহ' : ইন্দ্র বলাহক—যে ঘোড়ার ঘাড় এবং লেজ হলুদ। 'কোকাহ', অন্য নাম 'শীরাজী' : সাদা রং-এর ঘোড়া। 'সমুদ' বা সমন্দ : বাদামী রং-এর ঘোড়া।

৭৮ মূলে অসম্ভব অতিশয়োক্তি রয়েছে। আমি ভাব-সংক্ষেপ করে অনুবাদ করেছি।

৭৯ 'তূরা' : তূর্য। 'দরব' : দ্রব্য। 'অস্তমনা' : স্বাগত করবার জন্য এগিয়ে আসা।

৮০ 'নিছাবরি' : উপচার বা অমঙ্গল দূর করবার জন্য অনুষ্ঠান। 'কিহী' : করলো। 'নিহী' : নিল। 'নিয়রাঈ' : নিকট।

৮১ 'মোহ' : ইচ্ছা বা মমতা। 'রাই' : রাজা। 'জোহারি' : অভ্যর্থনা।

৮২ 'অপমঙ্গল' : অশুভ। 'সগুন' : শকুন বা লক্ষণ। যাত্রার পূর্বে দ্রষ্টব্য শুভ বা অশুভ লক্ষণ। মাতাপ্রসাদ গুপ্ত'র গৃহীত পাঠে আছে 'স্রবন লাগি কহ ধাইহি', অন্য একটি পাঠে পাওয়া যায় 'স্রবন লাগি ক ধাইহি হরবৈ'। আমি মাতাপ্রসাদের পাঠ অনুসরণ করেছি। 'হরবৈ' অর্থ সতর্ক করা।

৮৩ 'আহী' : ছিলো। 'অনত' : অন্যত্র। 'জৌলহি : যতক্ষণ পর্যন্ত। 'কিত' : কোন দিকে, কোথায়।

৮৪ 'মিরগাবতি য়হ কীনহু কাহা' : মৃগাবতী এ তুমি কি করেছ।

৮৫ 'মোলা' : মূল্য। 'তাকর' : তার। 'ইহঁহিত' : এখান থেকে।

৮৬ 'অগাহু (ফারসী আগাহ) : চেতাবনী বা মনে অকস্মাৎ আশঙ্কার উদয়। 'দাহু': দাহন। 'হাক' : জোরে ডাকা। 'উকার' : চীৎকার করা।

৮৭ 'সুবন' : শ্রবণ। 'তুরিয়াঁ' : ঘোড়া। 'পাগ' : পাগড়ী। 'ভুই' : পৃথ্বী। 'সারস-জোরী' : সারস-দম্পতি। প্রবাদ আছে যে একের অভাবে অন্যে জীবিত থাকেনা।

৮৮ মূলের তিনটি স্তবক এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'সিয়' : সীতা। 'লাগি' : নিমিত্ত। 'আগী' : অগ্নি। 'হঁনিবঁত' : হনুমান। 'জারসি' : জ্বালিয়ে। 'পলংকা' (সং : পাতাল লঙ্কা > পায়াল লঙ্কা > পায়ালঙ্কা > পালংকা > পলংকা) : লঙ্কা অথবা লঙ্কা থেকে দ্বীপান্তর। জায়সীতে 'লংকা ছাড়ি পলংকা' কথাটি আছে। তাতে 'পলংকা অন্য একটি দ্বীপ বলে মনে হয়। 'নিসিরহ' : নিশাচর, রাক্ষস। 'কবিলাসা' : কৈলাশ। 'বরজা : বর্জন করলো। 'ভেঁট-ঘাঁট' : মেলা-মেশা।

৮৯ 'বারা' : কেশ। 'অঁজুরী' : অঞ্জলি। 'পিসুন' (পিশুণ) : বিরোধ উৎপন্নকারী ব্যক্তি। 'মিসি' : বাহানা, অজুহাত, । 'বউরানা' : পাগল বানানো।

৯০ 'তন্ত' : তন্ত্র। 'সয়সারু' : সংসার। 'গয়ন্দহি' : হস্তী।

৯১ 'পাবরী (সং পাদপট্ট > পায়বহ > পাবড় > পাবড়া > পাঁবরি) : খড়ম। 'মেখলি' : মেখলা। 'কংথা' : কথরী, গুদড়ী। 'চক্র' : ছোট গোলাকার অঙ্গুরীয়ক যাকে 'পবিত্রী'ও বলা হয়। 'মুদ্রা' : কানে পরবার কুণ্ডল। 'খপর' : ভিক্ষাপাত্র। 'জোগৌটা (সং : যোগপট্ট) : যোগীদের ব্যবহৃত বস্ত্র যা কাঁধের উপর থাকে। 'রুদরাখ' : রুদ্রাক্ষের মালা। 'অধারী' : বসবার আসন অথবা ঝোলা—দু'অর্থই হয়। 'সিংগী' : শিঙ্গা।

৯২ 'অহিবর্ণ' : অভিমন্যু।

৯৩ 'সীংঘ সদুর' : এ-শব্দযুগ্মের ব্যবহার 'চান্দায়নে' আছে, জায়সীতেও আছে। সঁদূর, শার্দূল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (সদুর > সাদুর > সারদুল > শার্দূল)। 'অগম' : দুর্গম, অগম্য। 'ভৌ' : ভয়। 'ভোলা' : অজ্ঞান, সরল।

৯৪ 'সুলাখন' : সুলক্ষণ। 'করম' : ভাগ্য।

৯৫ 'তাহী' : তার। 'বাড়া' : উৎপন্ন হওয়া। 'জরি' : জল।

৯৬ 'চেত' : চেতনা, স্মৃতি। 'সিবাতী' : স্বাতী। 'নদান' : মূর্খ।

৯৭ 'মরোহ' : করুণা, দুঃখজনিত মমতা। 'ছোহূ' : স্নেহ। 'পদুমিনী' : পদ্মিনী-জাতীয় নারী। 'অমোলা' : অমূল্য। 'পরসাদ' : প্রসন্নতাপূর্বক প্রদত্ত বস্তু। 'জঙ্গম' : ভ্রমণকারী, লিঙ্গায়ত শৈব-সম্প্রদায়। 'ধাই' : দৌড়ে।

৯৮ 'সমুন্দ' : সমুদ্র। 'ভু অংগম' : ভুজঙ্গম, সর্প। 'দুগম' : দুর্গম।

৯৯ 'ভরমাও' : ভ্রমিত হই। 'মাবক সিধ' : সিদ্ধিমার্গ। 'নীক' : ভালো। 'বস্তী' : নগর। 'দুহেলা' : কঠিনকার্য, কষ্টসাধ্য। (দুঃখ কেলি দুহেল্লি দুহেলা)।

১০০ 'বিসমৌ' : বিস্ময়। 'অঁচয়েউ' : আচমন করে। ভৌ : ভয়।

১০১ 'মন্ত' : মার্গ। 'সঁরত' : স্মরণ করে।

১০২ 'বৈলোচন' : বৈরোচন। এ-কাহিনী 'নন্দ-বত্তীসীতে পাওয়া যায়। নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন, বৈরোচন নামে তাঁর এক অমাত্য ছিলো। বৈরোচনের স্ত্রীর নাম ছিলো পদ্মিনী। পদ্মিনীর প্রতি নন্দ আসক্ত হন এবং এক অভিযানে বৈরোচনকে প্রেরণ করে তিনি পদ্মিনীর গৃহে উপস্থিত হন। পদ্মিনী তাঁর সৎকার করে এবং পিতৃভাবে তাকে সম্বোধন করে, রাজা লজ্জিত হয়ে ফিরে আসেন। অভিযান থেকে ফিরে এসে বৈরোচন সমস্ত ঘটনা অবগত হয় এবং রাজাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। দূরে বনে বন্য শূকরের উৎপাত ছিলো, রাজা শূকর নিধনের জন্য অমাত্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। কিছুদূর গিয়ে রাজা অমাত্যদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। তিনি এক সরোবরের তটপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে বিশ্রামের জন্য ভূমিতে শুয়ে পড়লেন। তখন বৈরোচন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা করে। যে-সময় সে এই দুষ্কর্মে নিযুক্ত ছিলো তখন রাজ্যের এক মালী নিকটের বৃক্ষের উপর থেকে এ-ঘটনা দেখে। বৈরোচন গাছের ডালের শব্দ শুনে পালিয়ে যায় এবং নগরে এসে রটনা করে যে একটি দুর্ঘটনায় রাজার প্রাণান্ত হয়েছে। রাজকুমার সিংহাসন আরোহণ করে। কিন্তু ডালের শব্দের কথা মনে করে বৈরোচন সর্বদাই ভীত থাকে। একদিন রাত্রে স্ত্রীর কাছে সমস্ত ঘটনা যখন সে বলছিলো তখন রাজার একজন গুপ্তচর সব কথা শুনতে পায়। রাজা বৈরোচনকে হত্যা করেন।

১০৩ মূলের দুটি স্তবককে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'ভবই' : ঘোরানো। 'মোখ' : মোক্ষ। 'ময়া' : দয়া। 'বিসহঁর' : বিষধর, সর্প।

১০৪ 'করম' : কর্ম, ভাগ্য। 'হমার' : আমার। 'ভাগা' : ভাগ্য।

১০৫ 'বিনবো' : বিনয় করি। 'মীচু' : মৃত্যু। 'ফেরী' : ফিরে আসা। 'আউ' : আয়ু।

১০৬ 'অকূত' : দিব্য ধ্বনি, কোলাহল। 'রহসা' : হর্ষিত হওয়া। 'ঘট' : শরীর। 'আস' : আশা।

১০৭ 'অঁবরাউ' : (সং আম্রাবরম) : আমের বাগান। 'অমিয়' : অমৃত। 'ফর' : ফল। 'কবিলাস' : কৈলাস (জায়সীতেও আছে)। 'নেক' : পবিত্র।

১০৮ 'পঁবরি' : প্রবেশ দ্বার। 'অচম্ভী' : আশ্চর্য। 'নখত' : নক্ষত্র। 'অমোলক' : অমূল্য।

১০৯ মূলে আছে 'সূর্য' প্রশ্ন করলো। এখানে সূর্য হচ্ছে কুমার। 'শশি' হচ্ছে 'রূপমিনী'। জরী : জ্বত। 'তুর' : তোমার।

১১০ 'তিরি' : স্ত্রী। 'দেবরাই' : দেবরায়। 'পতি নগর' : নগর পতি। 'রাঘোবংশ' : রাঘব বংশ।

১১১ 'ভোকস' (সং পুল্কস>পুক্কস>পোকস>ভোকস) : ভূত। 'পরছাহী' : নিকটে। 'বচা' : বচন। 'পতিপারেঁী' : প্রতিপালন।

১১২ 'ঘটানী' : সমাপ্ত হল। 'বাখিস্তা' : বলবান। হনেউ' : হনন করে। 'সত' : সাত।

১১৩ মূলের দুটি স্তবক এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'দংগবৈ' : এক দ্রংগ বা মহানগরের অধিপতি যার এমন এক ঘোটকী ছিলো যা রাত্রিতে অপ্সরার রূপ ধারণ করতো। নারদ যখন একথা শুনলেন তিনি কৃষ্ণকে পাঠালেন ঘোটকী আনার জন্য কিন্তু কৃষ্ণের কথায় দ্রংগের অধিপতি স্বীকৃত হলেননা। তখন উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হল। একমাত্র ভীম দ্রংগের অধিপতির সহায়তায় নেমেছিলেন। একথাই এখানে বলা হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোটকীকে কেউ পেলনা, সে অপ্সরা হয়ে চিরকালের জন্য ইন্দ্রলোকে চলে গেল।

১১৪ 'কুবরি' : কুমারী। 'তোহী' : তোমাকে। 'জরমাঁসো' : জন্মস্থান। বাঁচা : অনুরক্ত। 'ফুর' : শীঘ্র :

১১৫ 'বড়বারু' : অনেক বড়, মহৎ। উতংগ : উঁচু। 'রাবৈ' : অনুরক্ত হয়। 'সোত' : অতঃপর।

১১৬ এখানে মূলের দুটি স্তবক একত্রিত করা হয়েছে। 'রিখি' : ঋষি। 'পরসেউ' : স্পর্শ করে। ''পরসন': প্রসন্ন। 'অনহাঈ' : স্নান। 'নেহ' : স্নেহ। 'ভিনুসার' : প্রাতঃকাল।

১১৭ 'কাট' : কাঠ, লাকড়ী। 'জারো' : জ্বালিয়ে দিই। 'লইক' : নিয়ে। 'পায়সু' : পেয়ে, প্রাপ্ত হয়ে।

১১৮ 'হনা' : হত্যা করা। 'ফুরহী' : নিকট। 'পরিহরি' : পরিহার করলো। 'জায়ে' : জন্ম দিয়ে। 'উবরহু' : উদ্ধার হল।

১১৯ 'বিধাসসি' : বিধ্বংস করলো। 'পানা' : পান। 'সূর' : বীর।

১২০ 'জোগ তন্ত্র' : যোগ-সাধনা। 'রৈসন্দর' (সং বৈশ্বানর>প্রা বইস্সানয়> বইসানর,>বৈসাঁদর) : অগ্নি। 'বাপুরা' : দীন, অসহায়।

১২১ মূলের দুটি স্তবক এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'ফুসলাবা' : বিভ্রান্ত করলো বা ভুলালো। বাংলাতে 'ফুসলানো' শব্দটি আছে। 'রিস' : ক্রোধ। 'কাহ': কি। 'তর' : নীচে। 'মনসা' : ইচ্ছা, বিচার। 'অবারী' : হাওদা, হস্তীর উপর বসবার ব্যবস্থা। 'অসবার' : সওয়ার।

১২২ 'বারী' : রামায়ণে বর্ণিত সুগ্রীবের ভাই বালী। 'কনহ' : কৃষ্ণ। 'কারী' : কালীয় নাগ। 'দুসাসন' : দুঃশাসন যে দ্রৌপদীর বস্ত্র খুলতে চেয়েছিলো। 'সিংহ' : নৃসিংহ। 'হরনাকুস' : হিরণ্যকশ্যপ। 'জনা' : জন্ম দিল। 'অখত' : অক্ষত।

১২৩ 'পটোর' : পাটোলা নামক বস্ত্র, রেশমী বস্ত্র। 'সোন' : সোনা। 'কূপা' : কুপ্পা, চামড়ার তৈরী।

১২৪ 'ঔখদ' : ঔষধি। 'মূর' : শিকড়। 'ভাবতা' : ভবিতব্য।

১২৫ 'পরিতাউ' : পরীক্ষা করবো। 'পরিতাই' : পরীক্ষা করে। 'মরম' : মর্ম। 'নিহোরা' : উপকার। 'সতুর' : শত্রু। 'উদারী' : কেড়ে। 'তেবরী' : জুয়া। 'চৌপড় :

একপ্রকার জুয়া খেলা। 'দাম' : এক প্রকার জুয়া। 'নকটা' : এও এক প্রকার জুয়া। 'সোরহী' : ষোল কড়ির খেলা। 'চৌপখী' : চৌপড় খেলা। 'দোপখী'' : চৌপড় খেলারই অন্য এক পদ্ধতি। চার রঙের গুটির সাহায্যে চৌপড় খেলা হয়ে থাকে। 'পতিয়াই' : বিশ্বাস জাগে।

১২৬ চৌগান খেলা যাকে এখানে 'হেঙ্গুরি' বলা হয়েছে, তা' বর্তমান যুগে 'পোলো' খেলায় রূপান্তরিত হয়েছে। জায়সীর 'পদমাবতে'এর বিবরণ আছে। 'গোটা' : গোলা বা বল। 'বেধ' : বেধ্য বা লক্ষ্য। 'আঁবিলী' : ইমলী বা তেঁতুল। 'বারক' : বালক।

১২৭ 'ষট ভাষা' : ষড় ভাষা অর্থাৎ ব্রজ, মাগধী, অমর, নাগর, যবন এবং পরসী। অমর হচ্ছে সংস্কৃত, নাগর হচ্ছে অপভ্রংশ এবং যবন হচ্ছে আরবী। পরমেশ্বরী-লাল গুপ্ত এ-ভাবেই ষড় ভাষার বিবরণ দিয়েছেন। 'ভারত' : মহাভারত। 'পিঙ্গম' : ছন্দশাস্ত্র। 'অমরু' : অমরুশতক, সংস্কৃতের এক প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

১২৮ 'মন মঁতরী' : মনে মনে বিচার করলেন। 'বিয়াহ' : বিবাহ। 'অহিনিসি' : রাতদিন।

১২৯ 'পসরা' : ছড়ানো। আমি অর্থ করেছি সুনিশ্চয়। 'নেউতা' : নিমন্ত্রণ। 'জেউ-নার' : জৌনার, দাওয়াত। 'নেত' : সূক্ষ্ম বস্ত্র, জটাংশক। 'পটোর' : এক প্রকারের বস্ত্র। 'পঁচাবিরিত' : পঞ্চামৃত। 'লোন' : লবণ।

১৩০ 'জই ভোজি' : ভোজন শেষ করে। 'খরিকা' : দাঁত পরিষ্কার করবার তৃণ। 'পখারি' : প্রক্ষালন করে। 'জৈমারা' : জয়মাল্য।

১৩১ 'দাইজ' : দহেজ বা উপঢৌকন।

১৩২ এ স্তবকে কুমার ছলনার সাহায্য নিচ্ছে।

১৩৩ 'আঁলী' : ইমলী, তেঁতুল। 'আব' : আম। 'বোরায়সি' : বিভ্রান্ত করলো। 'ভোরয়সি' : বিভ্রান্ত করলো। অবধী অঞ্চলে বাজরার ডাল মিশিয়ে এক রকমের শুকনো পিঠা তৈরী হয় তাকে 'ফরা' বলে। 'সোহারী' হচ্ছে এক প্রকার মিষ্টি যাকে মতিচুরের লাড়ু বলা হয়।

১৩৪ 'অসনান' : স্নান। 'বাগা' : বস্ত্র। 'গে' : গিয়ে।

১৩৫ 'নীক' : ভালো। 'পুন্ন' : পুণ্য। 'গোট' : গোষ্ঠী। 'কনকনগর' : কাঞ্চনপুর। 'চাহি' : জ্ঞাত।

১৩৬ 'গিয়ান' : গান। 'সানা' : অনুরক্ত। 'খটবাটি' : মানিনী খাটের পালঙ্ক ধরে যে-অভিমান প্রকাশ করে। 'বটোরি' : বিস্তৃত করে।

১৩৭ 'বরছেবা' : অর্পণ করা হল। 'খুতচার' : ধূর্তাচার।

১৩৮ মূলের দু'টি স্তবককে একটি স্তবকে পরিণত করা হয়েছে ভাব-সাম্যের দিকে লক্ষ্য করে। 'খর' : খরিকা, তৃণ। 'উচারি' : সরিয়ে দিয়ে। 'জাপ যাপ কর' : তুষ্ট করে। 'আয়সু' : আগন্তুক। 'সংগাট' : সংঘটন। 'গোস্টি' : বার্তালাপ।

'অন্তর' : মধ্যে। 'কজলী বন' : মহাভারতের বনপর্বে ঋষিকেশ থেকে বদ্রিকাশ্রম পর্যন্ত বিস্তৃত বনখণ্ডকে কজ্জলীবন বলা হয়েছে। এখানে বর্ণনায় একটি প্রভূত অন্ধকারের পরিচয় পাই। সেখানে কোন কিছুই লক্ষ্যগোচর হয়না। তাই মনে হয় কালো অর্থে এখানে 'কজলী' বলা হয়েছে।

১৩৯ 'কন্থা' : গুদড়ী বা যোগীর পরিধেয় ছিন্ন বস্ত্র। অথবা ছেঁড়া কাপড় দিয়ে তৈরী করা পরিধেয়, হিন্দীতে যাকে বলে 'চিথড়'। 'সিস' : বাহানা।

১৪০ 'অধারী' : ঝুলি। 'খেবট' : কেবট, মল্লাহ, মাঝিক। 'ফাঁড়' : কোমরে যেখানে টাকা পয়সা গুজে রাখে। 'কোর' : ক্রোড়।

১৪১ 'লোগ কুঁবর কে সাস জৌ হতে' : যে-সব লোক কুমারের সঙ্গে ছিলো। আমি অর্থের সুস্পষ্টতার জন্য লিখেছি 'কুমারের সঙ্গীরা যারা পিছনে পড়েছিলো'। 'সাবজ' : শ্বাপদ বা বন্য জন্তু। 'তুরিয়' : ত্বরিৎগতিতে। 'ঝুরবত' : সন্তাপ।

১৪২ এখানেও মূলের দুটি স্তবককে একত্রিত করা হয়েছে। 'অচক' : স্তম্ভিত। 'তুসার : শীত। পুরইন' : কমল-কলিকা। 'ঘাম' : রৌদ্র। 'কুঈ' : কুমুদিনী। 'অবরাঁই : অন্যত্র। 'মিতাই' : মিত্রতা। 'জোগতস্ত্র' : যোগ-সাধনা। 'বরবস' : জোর করে।

১৪৩ 'রৈনি' : রজনী। 'ফিরাবা' : বদল করলো। 'দিনিয়র' : দিনকর, সূর্য। 'সুবাই' : চেনা যাচ্ছিলোনা।

১৪৪ এখানেও দুটি স্তবক একত্রিত। 'রোঝা' (সং ঋশ্য>প্রা রোজঝ) : নীল গাই। 'নিয়ার' : হৃদয়ের কথা। 'সরেখ' : চতুর।

১৪৫ 'মেষ-চারক' খণ্ডে যে-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার মূল আখ্যান পাওয়া যাবে হোমারের 'ওদিসি' মহাকাব্যের নবম পুস্তকে, যেখানে 'কাইক্লোপিস' দৈত্যের হাতে 'ওদিসিউস' তার সঙ্গীসহ বন্দী হয়। 'কাইক্লোপিস' মেষ পালন করতো। ওদিসিউস কাইক্লোপিসের চোখে লৌহশলাকা প্রবিষ্ট করে আত্মরক্ষা করে। 'গড়রিয়া' : গড্ডারিক, মেষ-চারক। 'পাহুন' : অতিথি। 'মেঢ়া' : মেষ। 'ছাঁগর': ছাগল, বকরী।

১৪৬ 'ভুগুতি' : ভোজন। 'আয়সু' : আগন্তুক। 'অগুবা' : পথ-প্রদর্শক। 'লেজাঈ' : নিয়ে যাবে।

১৪৭ 'হুত' : ধূর্ত। 'কলা' : কুশল। 'নিতরম' : নিম্ন। 'খোহ' : গুম্ফা বা গুহা। 'পিহান' : ঢাকনী বা অবরোধ। 'আচকর' : আশ্চর্য, চকিত। 'চাক' : ঢাকনী। 'বিপরিত' : অসাধারণ। 'মূরী' : জড়ী বা গাছের শিকড়।

১৪৮ মূলের দুটি স্তবক এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'পহনাঈ' : আতিশয্য। 'সাধ' : অভিলাষ। 'অকাস' : স্বর্গ। 'মন্ত্র' : উপায়। 'বিসবাসূ' : ছল, বিশ্বাসঘাতক। 'বেরা' : বেলা। 'আস' : আশা।

১৪৯ মূলের তিনটি স্তবককে সংক্ষিপ্ত করে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। কোনও কোনও পাণ্ডুলিপিতে 'কবীর' এবং কোনও কোনও পাণ্ডুলিপিতে 'কৌরা' আছে। আমি কৌরাকেই শুদ্ধ বলে গ্রহণ করেছি, অর্থ 'কৌরব''। এভাবে 'পণ্ডো হচ্ছে পাণ্ডব। 'নেহা' : স্নেহ। 'পরছেবা' : পরিত্যাগ করলো বা অর্পণ করলো।

১৫০ মূলের আটটি স্তবক অবলম্বনে এ-স্তবকটি নির্মাণ করা হয়েছে। মূলে অতিকথন এবং পুনরুক্তি ছিলো, অনুবাদে সে-গুলি পরিহার করা হয়েছে।

১৫১ 'মগু-অমগু' : মার্গ-অমার্গ। 'ওহট-ওহট' : দূরে দূরে থেকে, আত্মরক্ষা করে। 'আউ' : আয়ু।

১৫২ 'করসায়ল' : মৃগ। একটি পাঠে 'করি সয়ল জনু' আছে যার অর্থ হয় 'হাথী যোলের উপর' ইত্যাদি। পাঠটি কষ্টসাধ্য বলে আমি গ্রহণ করিনি। 'কেসরি' : সিংহ। 'পেখা' : দেখলো। 'কুরংগিন' : হরিণী। 'পারধ' : শিকারী।

১৫৩ 'পরেবা' : পারাবত, কবুতর। 'মনসেরু' : পুরুষ। 'কুরলহি' : মনোবিনোদ করতে লাগলো। 'ধাবন': দূত।

১৫৪ 'ঘাম' : রৌদ্র। 'তরুবর' : বৃক্ষ। 'পয়ানী' : প্রয়াণ।

১৫৫ মূলের দুটি স্তবক এখানে একত্রিত। 'নিরাতা' : সবিস্তার। 'অগুমন': প্রথম। 'ছয়া' : ছদ্মবেশ'। 'সঁচারা' : সঞ্চার করলো। 'বিলাঈ' : লুপ্ত। 'নহাঈ' : স্নানার্থ।

১৫৬ মূলের দুটি স্তবকের সারাংশ এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। 'সঁঘাতা' : সাথ। 'রবন' : রমণ। 'হরকা' : পিছনে সরা।

১৫৭ মূলের তিনটি স্তবক এখানে একত্রিত ও সংক্ষেপিত। 'রাঁধা' : পাহারাদার। 'অন্ত' : অন্যত্র। 'নেম' : সংকল্প। 'লাগে' : নিকট। 'উতংগ' : উত্তুঙ্গ। 'সাধা' : ইচ্ছা।

১৫৮ 'অয়ানী' : অজ্ঞানী।

১৫৯ 'অসাধ' : অসাধ্য। 'দুহেলী': দুঃখী। 'অম্ব' : আম। 'বারা' : বাগান। 'বুঝি': বুঝে।

১৬০ 'ভই' : হোল। 'কীত' : করলো। 'পয়ান' : প্রয়াণ। 'কবিলাসা' : কৈলাশ বা স্বর্গ। 'সুরপতি' : ইন্দ্র। 'মহনে' : শ্রেষ্ঠ, বৃহৎ। মাতাপ্রসাদ গুপ্ত অর্থ করেছেন 'মহামাত্য' বলে। 'নেগী' : সাধারণ কর্মচারী।

১৬১ 'পুন' : পুণ্য। 'ধরমসার' : ধর্মশালা। 'উচায়া' : উঁচু করলো অর্থাৎ নির্মাণ করলো।

১৬২ 'বিরিখ' : বৃক্ষ। 'তর' : নীচে। 'দীঠি' : দৃষ্টি। অলপ : অল্প।

১৬৩ 'খিন খিন রহসই অংগ নস মাঈ' : ক্ষণে ক্ষণে সে হর্ষিত হচ্ছিলো এবং হর্ষ এত ব্যাপ্ত ছিলো যে তার শরীর এ-হর্ষকে ধারণ করতে পারছিলোনা।

১৬৪ 'লখরাউ' : লক্ষারাম বা এমন বাগান যেখানে লক্ষাধিক বৃক্ষ আছে।

১৬৫ 'কুসুভঁ' : কুসুম। 'মালতী' : সাদা রঙের ফুল। 'বেলি' : বেলফুল। হিন্দী সাহিত্যে এর আরও নাম পাওয়া যায়—মোতিয়া, মোগারা, রামবেল। মোতিয়াকে আবার মাধবীও বলা হয়। 'নেবারন' : নেবারী, একপ্রকার শ্বেত ফুল যা চৈত্র মাসে দেখা যায়। সম্ভবতঃ এটাও বেলফুলের রকম ভেদ। 'বুন্দ' : সাদা রঙের ফুল দাঁতের উপমারূপে ব্যবহৃত হয়েছে। 'সেবতী' : (সং সেবন্তী অথবা শতপত্রিকা, সয়রত্তিয়া, সেউত্তিয়া, সেবতী) : সাদা গোলাপ। 'জুহী' : যূথিকা, যূথী। 'চম্পা' : সোনালী রঙের ফুল। কবিতায় শরীরের বর্ণ-বিভাকে চম্পার সঙ্গে তুলনা করেছেন কবি।

১৬৬ 'কেতকী' : সাদা রংয়ের ফুল, আশ্বিনে ফোটে। 'করণা' : করণ ফুল, অনেকটা কেতকীর মতো। 'চঁবেলী' : চামেলী। 'নাগেসর' : নাগকেশর। 'গুলাল' : বসন্তে প্রস্ফুটিত হয়।

১৬৭ এখানেও পুষ্প বর্ণনা। কিন্তু সে-সব পুষ্পের বর্ণনা যাদের পরিমল বা সুগন্ধ নেই।

১৬৮ দুটি স্তবক এখানে একত্রিত করা হয়েছে। 'রহট' : পানি সেচনের যন্ত্র। পারশিয়ান হুইল বলে পরিচিত। অঁবরাঈ' : আম্রারাম বা আমের বাগান। 'পদুমনী' : পদ্মিনী জাতীয় স্ত্রী। 'রাজপতি' : রাজা। 'ভান' : প্রকাশমান।

১৬৯ 'কাম' : কামকন্দলা। 'মাধোনল' : মাধবানল। 'কামকন্দলা-মাধবানল'—একটি প্রসিদ্ধ প্রেম-কথা। পুষ্পাবতী নগরে কামসেনের (গোপীচন্দ্র) রাজ্যকালে মাধব নামক একজন সুন্দর ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর রূপ-সৌন্দর্যে সেখানকার রমণীকুল মুগ্ধ ছিলো। এ-কারণে রাজা তাঁর রাজ্য থেকে তাকে বহিষ্কৃত করলেন। সে ঘুরতে ঘুরতে অমরাবতী (কামাবতী) উপস্থিত হল। নগরের প্রবেশদ্বারে সে বাধা পেল। দ্বারমুখে দণ্ডায়মান থেকে ভিতরে যে মৃদঙ্গ বাজছিলো তার সুরের ত্রুটি সে বের করতে লাগলো। রাজা তার গুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে দরবারে স্থান দিলেন। একদিন সুপ্রসিদ্ধ বেশ্যা কামকন্দলা রাজদরবারে নৃত্য করতে এলো। কামকন্দলার নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে মাধবানল রাজপ্রদত্ত পান তাকে উপহার দিল। এভাবে তারা একে অন্যের প্রতি অনুরক্ত হল। রাজা অপমানিত বোধ করে মাধবকে দরবার থেকে বের করে দিলেন। মাধব সেখান থেকে বেরিয়ে উজ্জেন পৌঁছলো এবং আপন প্রেম-কাহিনী এক মন্দিরের দেয়ালে লিখলো। রাজা বিক্রম দেয়ালের লিখন পড়ে মুগ্ধ হয়ে লেখককে খুঁজে বের করলেন এবং তার প্রেমমুগ্ধতার কাহিনী শুনে কামসেনকে লিখলেন যেন তিনি কামকন্দলাকে মাধবের হাতে অর্পণ করেন। কামসেন রাজী হলেননা, তখন উভয় রাজার মধ্যে যুদ্ধ হল। পশ্চাৎ তিনি উভয়ের প্রেমের পরীক্ষা নিলেন। কামকন্দলাকে বলা হল যে মাধব মরে গেছে এবং মাধবের কাছে কামকন্দলার মৃত্যুর কথা বলা হল। উভয়ে আপন প্রেমীর মৃত্যুসংবাদ শুনে চেতনাহীন হল। বেতাল এসে উভয়কে জীবন্ত করলো এবং বিবাহ দিল। 'নল' : নিষধ দেশের রাজা। 'দমাবতী' : দময়ন্তী : বিদর্ভ নগরের রাজকুমারী। নল-দময়ন্তীর

উপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বে লোপাখ্যান নামে পাওয়া যায়। 'মঝারী' : মধ্য। 'মকুহী' : কদাচিৎ। 'পঁবর' : প্রবেশদ্বার। 'কুরী' : কুল। 'বনজার' : ব্যবসায়ী। সংস্কৃত 'বাণিজ্যকারক' থেকে শব্দটি এসেছে। 'দেউর' : দেবল, মন্দির।

১৭০ 'রাজ দুআরিনহ্' : রাজদ্বারে। 'অথাই' : সমাপ্ত হল। 'প্রতিহারি' : দ্বারপাল। 'জুহার' : অভিবাদন।

১৭১ 'অবোল' : অবাক। 'কেহিকে' : কার। বিয়োগ শব্দটি হিন্দী-অবধীতে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। 'প্রেম', 'আকাঙ্ক্ষা' : 'অনুরাগ', 'বিচ্ছেদ' সকল প্রকার অনুভূতির সম্মেলন এ-শব্দে আছে।

১৭২ 'আয়' : আগন্তুক। 'আগ্যা' : আজ্ঞা।

১৭৩ 'ইঁকারেউ' : আহ্বান করেছে। 'কচপচী' : কৃত্তিকা নক্ষত্র। 'কই' : কুমুদিনী।

১৭৪ 'সঁকাঈ' : সন্দেহ জাগলো অথবা শঙ্কিত হল। 'লাগ' : নিমিত্ত।

১৭৫ 'সনিপাত' : সন্নিপাত। এক প্রকার জ্বর রোগ যাতে শরীরে শৈত্য অনুভূত হয়। 'তিরদোখা' : ত্রিদোষ যথা বাত পিত্ত এবং কফের বিকার। 'দেউ-দানী' : দেব-দানব। 'সয়ান' : জ্ঞানবান অথবা ওঝা।

১৭৬ 'পারোঁ' (ক্রি: পারনা) : সক্ষম হওয়া। 'সর' (শর) : বাণ। 'বিয়াধা' : ব্যাধ। 'হনিবঁত' : হনুমান। 'রাঘো' : রাঘব, রাম। 'দূভর' : কঠিন।

১৭৭ 'গণ গন্ধরপ' : গন্ধর্বগণ। 'বার' : দ্বার। 'করপালোঁ' : করপল্লব। 'হেতু' : উদ্দেশ্য।

১৭৮ 'দাঘা' : দগ্ধ। 'হুতাসন' : অগ্নি। 'অচয়েউ' : আচমন করলো, পান করলো।

১৭৯ 'সুধ' : শুদ্ধ, স্পষ্ট। 'ঠগ লাড়ু' : বিষাক্ত লাড়ু। জায়সীতেও পাওয়া যায়। বাংলাতে আলাওলের পদ্মাবতীতে এর ব্যবহার আছে। 'বানী' : বেশ। 'বেরাস' : বিলাস, ভোগ।

১৮০ 'জামিনি কর ভানা' : যামিনীর ভানু। বাংলাতে 'মৃগাবতী যামিনী ভান' নামে মৃগাবতীর কাহিনী পাওয়া যায়।

১৮১ 'সুরিজন সূর' অথবা 'সরজন সূর' : স্বজন সূর্য। 'পরগাসা' : বিকসিত হল। 'পরসেউ' : স্পষ্ট করলো। 'শিলার' : ললাট। 'অসরো' : আশা।

১৮২ 'নাস ক ডর' : নাশের ভয় অর্থাৎ প্রাণনাশের ভয়। 'আরণ' : অরণ্য। 'মোখ' : মোক্ষ। 'সরি' : চিতা। 'মরোহ' : মমতা।

১৮৩ 'পাঁখিহি' : পতঙ্গ। 'দাঈ' : ভাগীদার বা অংশীদার। 'তিহ' : এ-কারণে।

১৮৪ 'মুত্রহি' : মৃত। 'সাউ' : স্বাদ। 'অঁগুরা' : অঙ্গুলী। 'ভুগুতি' : আহার্য, উপঢৌকন।

১৮৫ 'জরমহুঁ' : আজন্ম। 'ঠা' : স্থান। 'করীল' : এক প্রকার লতাগাছ যাতে তিক্ত ফল হয়, সম্ভবতঃ করলা। 'সরাতী' : স্বাতী নক্ষত্র। 'কেহরি' : সিংহ। 'পতি পারী' : প্রতিপালন করেছিলো।

১৮৬ 'চীঠ' : ঘৃষ্ট। 'অঁবক' : অবাক, মূক। 'গারী' : গালি। 'দোখন' : দোষ।

১৮৭ 'নহাই' : স্নান করিয়ে। 'বাগা' : বস্ত্র।

১৮৮ 'সংকর' : শঙ্কর, শম্ভু বা মহাদেব। শঙ্কর শব্দটির মূল অর্থ হচ্ছে যিনি শুভ করেন বা মঙ্গল করেন। 'পারবতী' : পার্বতী, হিমালয়ের দুহিতা, শিবের পত্নী যিনি দুর্গা, গৌরী ইত্যাদি বহুবিধ নামে পরিচিত। 'বেনা' (সং. বীরণ) : এক প্রকার সুগন্ধি। 'কুংকু' : কুঙ্কুম, কেসর। 'মেদ' : এক প্রকার সুগন্ধি। 'অরগজা' : কেসর, চন্দন, কর্পূর ইত্যাদির সংমিশ্রনে প্রস্তুত সুগন্ধি।

১৮৯ 'জারহি' : জ্বালাচ্ছে। 'বাতী' : প্রদীপ। 'বাসর' : দিন। 'দেবস' : দিবস। 'বড়াঈ' : সম্মান।

১৯০ 'সামী' : স্বামী। 'তহিয়া' : সেই দিন। 'বিরসহু' : বিলাস কর। 'জইঁবা লহি' : যতদূর পর্যন্ত। 'পসরহুঁ' : শয়ন কর।

১৯১ 'দুবউ' : উভয়ে। 'বিরিতং' (বৃত্ত) : সমাচার। 'রিস' : ক্রোধ। 'ভা' : সম্পন্ন হল।

১৯২ মূলের পাঁচটি স্তবককে এখানে একত্রিত করা হয়েছে। এ-সব ঘটনা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এখানে কুমার মৃগাবতীকে সংক্ষেপে সে-সব সংবাদ দিচ্ছে। 'বিশালাছী' : বিশালাক্ষী, বিবৃত নয়না। 'গজকুম্ভ' : হস্তীর গণ্ডস্থল। এখানে স্তনের উপমা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'পয়োহরী' : পয়োধরী, রমণী। বীশোচন : বৈরোচনের কাহিনী পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

১৯৩ এ-স্তবকে যৌনমিলনের রসাবেশ এবং তৃপ্তির বৈভব বর্ণিত হয়েছে। 'গিয়' : গ্রীবা। 'নাহাঁ' : পতি। 'সিরফল' : শ্রীফল, বেল, স্তনের উপমা। 'দারিউ' : দাড়িম্ব, আনার। 'দাখ' : দ্রাক্ষা। 'বিরসাউ' : বিলাস কর, যৌনমিলনে লিপ্ত হও।

১৯৪ 'বিগরহ' : যুদ্ধ। 'বিহরনি' : সমাপ্ত। 'কুংজর' : হস্তী। 'তুখারা' : ঘোড়া। 'তাতর' : তাতারী, তরবারি। 'কুরিল' : কুঞ্চিত।

১৯৫ 'নহ' : নখ। 'সনাহ' : কবচ। 'বিরি' : চুড়ী।

১৯৬ 'দিনকর' : সূর্য। 'চেড়ী' : দাসী। বদন: মুখ। 'পখারহি' (সং: প্রক্ষালন) : ধৌত করে। 'মহতৈ': শ্রেষ্ঠ জন, উচ্চ কর্মচারী। 'নেগী' : সামান্য কর্মচারী। উতঙ্গ': অত্যন্ত উঁচু।

১৯৭ 'দইকে' : দিয়ে বা দান করে। 'চেরে' : দাস। 'আন' : খ্যাতি।

১৯৮ 'পরসাদ' : অনুগ্রহ। 'রাই রাউ' : রাজারা। 'ওরগণ' (মূল আরবী রূকন) : এখানে অর্থ আমীর, উমরা, প্রধান, সামন্ত ইত্যাদি। আমি এককথায় অর্থ করেছি 'রাজসেবক'। 'নীচহি' : নিম্ন বর্গের ব্যক্তি। 'সন' : সমান।

১৯৯ 'বনি বনি' : সাজ-সজ্জা করে। 'খবৈত হি' : পানবাড়ী অর্থাৎ যে পান পরিবেশন করে। 'সাঁনা' : সংকেত। 'সুবা' : সুপারী। 'মোতি ক চুন' : ঝিনুক চূর্ণ করে যে চুনা তৈরী হয়।

২০০ 'গজপতি' : রাজাদের উপাধি। 'হেবরপতি' : অশ্বপতি। মধ্যযুগের হিন্দী-অবধী কাব্যে রাজাদের উপাধি হিসেবে আমরা এ-সব শব্দ পাই। 'তূর' : তূর্য, এক প্রকার বাদ্য।

২০১ 'বঘেরী' : বিসর্জিত করলো। 'জোরী' : সাথী। 'নটসার' : নাট্যশালা। 'সাজু' : সজ্জা। 'নটুবা' : নট। 'পতুরী' : বেশ্যা। 'পখউজি' : যে পাখাওয়াজ বাজায়। 'উপাঙ্গী' : যে উপাঙ্গ বাজায়। উপাঙ্গ এক প্রকার বাদ্যযন্ত্র। এর অন্য নাম নভতরঙ্গ। 'জন্ত্রকার' : জন্ত্র নামক বাদ্য যে বাজায়। আমি এখানে যন্ত্রী অর্থ করেছি। 'ব্রহ্মবীন' : এক প্রকার বীণা। 'সুরবীন' : এক প্রকার বীণা। 'সবদ-সুরা' : এক প্রকার বাদ্য। ''সুরমণ্ডল' : এক প্রকার শততন্ত্রী বীণা। 'উধূতী' : একটি প্রাচীন বাদ্যের নাম। 'পিনাক' : শিবের বাদ্য। 'সারঙ্গী' : একটি লোক-প্রসিদ্ধ বাদ্য। মাদর : মৃদঙ্গ। 'কাহল' : বাদ্যবিশেষ।

২০২ 'সাজ' : বাদ্য। 'সবদ' : সঙ্গীতের নাদ। 'থাপে' : আঘাত করলো। এখানে বাদ্য যন্ত্রে আঘাত করা অর্থে। 'ছবো রাগ' : ছয় রাগ। ভারতীয় সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগের সর্বপ্রথম উল্লেখ মাতঙ্গমুনী-কৃত 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে রাগের তিন প্রকার ভেদ করা হয়েছে—পুংলিঙ্গ রাগ, স্ত্রী রাগ এবং পুংসক রাগ। পুংলিঙ্গ রাগ হচ্ছে বিশ প্রকারের, স্ত্রী রাগ চব্বিশ প্রকারের এবং পুংসক রাগ তেরো প্রকারের। আবার 'সঙ্গীত মকরন্দ' গ্রন্থে শিব এবং শক্তি থেকে 'রাগ-রাগিণীর উদ্ভব' বলা হয়েছে। শিবের পঞ্চমুখ থেকে স্ত্রীরাগ, বসন্ত-রাগ, ভৈরবরাগ এবং পঞ্চমরাগের উদ্ভব হয়েছে। আবার পার্বতীর মুখ থেকে 'নটনারায়ণ' রাগের উৎপত্তি হয়েছে। ভরতমুখীর মতে রাগের নাম হচ্ছে—ভৈরব, কৌশিক, দীপক, শ্রীরাগ, মেঘরাগ এবং হিন্দোল। ভরতমুখী-কৃত সঙ্গীত শাস্ত্রের নাম 'সঙ্গীত দামোদর'। ষোড়শ শতকের প্রারম্ভে মেষকর্ণ-কৃত 'রাগমালা' গ্রন্থে রাগ-রাগিণীর যে বিস্তৃত বিবরণ আছে তার উপর নির্ভর করেই কুতবন রাগ-রাগিণীর বিবরণ দিয়েছেন বলে ধারণা করা হয়। (দেখুন : ডক্টর পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত : কুতবন-কৃত মিরগাবতী, পৃ. ২৭৯)। 'তীস ভারজা' : ত্রিশ ভার্যা। কুতবন প্রত্যেক রাগের পাঁচটি করে রাগিণী বা ভার্যার উল্লেখ করেছেন। অনেক সঙ্গীত গ্রন্থে ছত্রিশ রাগিণীর উল্লেখ আছে। কুতবন যেভাবে রাগিণী পরম্পরার উল্লেখ করেছেন তা কোনও সঙ্গীত শাস্ত্রে পাওয়া যায়না। 'ভৈবো' : ভৈরব রাগ। 'মধুমাধো' : মধুমাধবী। ভৈরবের ভার্যারূপে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মধুরা' : ভৈরবের ভার্যা। 'বঙ্গলা' : ভৈরবের ভার্যারূপিণী একটি রাগিণী। 'বৈরাটিক' : একটি রাগিণী। 'গুণকরী' : একটি রাগিণী। 'মালকোস' : মালবকৌশিক রাগ।

২০৩ 'গৌরী', 'দেবকলী, 'টৌড়ী', 'কঁকুভ' এবং 'খম্ভাবতী' নামে মালকোশের পাঁচ ভার্যা হিসেবে পাঁচটি রাগিণীর নাম কুতবন উল্লেখ করেছেন। তেমনি হিন্দোলের

পাঁচ ভার্যা হিসেবে উল্লেখ পেয়েছে 'ভৈরবী', 'দেসাখ', 'মাটা', 'সহজকথা' এবং 'দৈসী'। 'দীপক' : দীপক রাগের সর্বপ্রথম উল্লেখ পার্শ্ব দেব রচিত 'সঙ্গীত সময়সার' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। কুতবন এ-রাগকে নিষিদ্ধ বলে মান্য করেছেন কেন, তা বলেননি। তানসেন এ-রাগ গাইতেন বলে শোনা যায়।

২০৪ কুতবন দীপকের রাগিণী হিসেবে উল্লেখ করেছেন 'বরসিচন্দ', 'কামোদক' 'দেসী,' 'পটমঞ্জুরী' এবং 'গৌরী'। 'মেঘরাগ' : বর্ষঋতুর রাগ। 'মালসিরী' : মালশ্রী সম্ভবতঃ 'মালবশ্রী'। 'সারঙ্গ' : একটি প্রাচীন রাগিণী। 'বরারী' : হিন্দোলের ভার্যা রূপে এর উল্লেখ আমরা পেয়েছি। 'মল্লারী' : একটি রাগিণী। 'ধনাসিরী' : ধনাস্ত্রী রাগিণী। এর উল্লেখ ধন্যাসিকা রূপে পাওয়া যায়। 'গন্ধারী' : একটি প্রাচীন রাগিণী। 'হেমকন্দী', 'মলার', 'গূজরী' 'ভীমপলাশী' : রাগিণীর নাম।

২০৫ 'পতুরী' : নর্তকী।

২০৬ 'দখিন ক চীরং' : দক্ষিণী বস্ত্র। 'চন্দর চোলি' : চন্দনের রঙে রাঙানো কঞ্চুকী। 'চীকুর' : কেশ। 'সুধাঙ্গ' : শুদ্ধ অঙ্গ। 'মায়া, বৌরা, ভূমরা, পরিবন্দ'—বিভিন্ন নৃত্য-ভঙ্গির নাম।

২০৭ 'সরব নীল', 'জপক', 'চন্দ', 'চালী', 'দেসী', 'শিত পঁবর', 'ইকতালী'—বিভিন্ন নৃত্যভঙ্গির নাম। 'অটতাল, পটতাল' : পাখাওয়াজ এবং মৃদঙ্গ বাজাবার দু'টি মুখ্য তাল। 'দহা' : দশ।

২০৮ 'নীক' : সুন্দর। 'পরসন' : প্রসন্ন। 'মুঁদরী' : অঙ্গুঠী। 'পাট-পটোর' : সূতী-রেশমী বস্ত্র। 'আগ' : অঙ্গ, শরীর।

২০৯ 'রাবই' : রমণ করে। 'সাই' : স্বামী। 'মিলাত' : মিলন বা সঙ্গমের সময়।

২১০ মূলের দুটি স্তবক এখানে একত্রিত হয়েছে। 'ভুখবই' : ভূখা বা ক্ষুধার্ত। 'খারূ' : মূর্খ, অজ্ঞান। 'তাকর' : তার। 'ভোজ কৈ করা' : ভোগের কলানৈপুণ্য বা রমণের কলানৈপুণ্য।

২১১ 'বিচাখন' : বিচক্ষণ। 'অউসা' (অবসান) : সমাপ্ত হল। 'মধুর খজহজা' : মধুময় খাদ্য বা ফল।

২১২-৪৬ কাব্যের এ-অধ্যায়টি মূল কাব্যধারার মধ্যে একটি হেতুহীন সংযোজন। কাহিনীর প্রয়োজনে এ-অংশের কোনও সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়না। তাছাড়া অবাস্তব ঘটনারও নিজস্ব যৌক্তিকতা থাকে, এখানে সে-যৌক্তিকতাও নেই। আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের কাহিনীর মতো একটি ঘটনা এসেছে কিন্তু আরব্য উপন্যাসে দৈত্যের স্বভাব এবং আচরণের মধ্যে যে যুক্তি আছে, এখানে তা নেই। মধ্যযুগের কবিগণ আপন পাণ্ডিত্য এবং জ্ঞান-গরিমা প্রকাশের জন্য কাহিনীতে অহেতুক বিস্তার ঘটাতেন, এখানে সে-ধরনের একটি বিস্তার লক্ষ্য করি। ডক্টর মাতাপ্রসাদ গুপ্ত এ-অংশকে 'কূটকাব্য' বলেছেন (মৃগাবতী :

মাতাপ্রসাদ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৯৬৮, পৃ. ২৫৫)। এ-অংশ সংযোজনের একটি উদ্দেশ্য মনে হয়, রতি বিবরণের পুনরাবৃত্তি।

২৪৭-৫৫ অনুবাদে মূল বক্তব্য সংক্ষেপিত হয়েছে। কাব্যের আবেগ সঞ্চারের জন্য এ-অংশটুকু বিশেষ প্রয়োজন। একটি প্রণয় কাহিনীর প্রেমগত ত্রিভুজ নির্মাণের জন্য একজন পুরুষ ও তার দু'জন প্রেমিকা প্রয়োজন। কুমারের কাম্য হচ্ছে মৃগাবতী কিন্তু রূপমিনীও তাকে অবলম্বন করেছে। এ-অংশে রূপমিনীর চিত্তদাহ বর্ণিত হয়েছে। এখানে কিছু পুরোনো শব্দ আছে যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যেমন: 'বরিসা সৌ' : শত বর্ষ। 'কিমি' : কোন প্রকার। ''উনহারী' : তাঁর। 'নীক' : ভালো। 'বিরিয়া' : চুড়ী। 'দেঁা' : অগ্নি। 'পুছারী' : ময়ূর। 'সাঈ' : স্বামী। 'করব' : করবো। 'রামা' : রমণী।

২৫৬-৮১ হিন্দী-আরবী কাব্যে বারমাস্যা একটি প্রধান স্থান অধিকার করে থাকে। কুতবনের কাব্যে বারমাস্যা প্রেমাকুলতার ব্যঞ্জনায় অসাধারণভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় আত্মীয়তা একটি অসামান্য কাব্য-কুশলতায় পরিব্যক্ত হয়েছে।

২৮২-৩০০ মূলে এ-অংশে রাগবিস্তার অত্যধিক। যতটা সম্ভব কাহিনী-ধারাকে অক্ষুন্ন রেখে অনুবাদ সংক্ষেপ করা হয়েছে।

৩০১-০২ 'সপত্নী কলহ খণ্ড' এমন কোনও উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। প্রথাগতভাবেই এসেছে, কাহিনীর প্রয়োজনে নয়। অনুবাদ এখানে সংক্ষেপিত।

৩০৩ এখানে আমি প্রয়োজনবোধে ভাব-সংক্ষেপ করেছি।

৩০৪-০৫ 'হিন্দুঈ' : ভারতীয়। 'তুরকী' (তূর্কী) : তুর্কী ভাষা, পরমেশ্বরীলাল গুপ্ত বলছেন এখানকার তাৎপর্য আরবী ভাষা। 'খট ভাষা' : ষট ভাষা। ভিখারীদাস এভাবে ষটভাষায় উল্লেখ করেছেন—'ব্রজ মাগধী মিলৈ অমর নাগ, যবন ভাখানি। সহজ পারসীহ মিলে ষট বিধি কহত বখানি।' এ-অনুসারে ষট ভাষা হচ্ছে (১) ব্রজ, (২) মাগধী, (৩) অমর, (৪) নাগর, (৫) যবন এবং (৬) পারসী। 'অমর' সম্ভবতঃ সংস্কৃত, 'নাগর' অপভ্রংশ এবং 'যবন' আরবী। 'বহুল পাখ' : কৃষ্ণ পক্ষ। রচনার তারিখ সম্পর্কিত আলোচনা ১১ সংখ্যক টীকায় আছে।